দীপকাঠি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সত্যব্রত লাইব্রেরী

প্রথম সংস্করণ

দোলযাত্রা, ১৩৬১

প্রকাশক

সত্যব্রত গুহ

সত্যব্রত লাইব্রেরী

১৯৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট

খালেদ চৌধুরী

ছেপেছেন

পরমানন্দ সিংহরায়

শ্রীকালী প্রেস

৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৯

তিন টাকা আট আনা

শ্রীসাগরময় ঘোষ
বন্ধুবরেষু

ধূপকাঠি

মান্যবরেষু

আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। বিনা পরিচয়ে আপনাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি, আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। তবে আমার পক্ষ থেকেও একটি বলবার কথা আছে। আমি আপনার একটি পরিচিতা মেয়ের অনুরোধেই তার বক্তব্য আপনাকে লিখে জানাচ্ছি। প্রথমে তার জবানীতেই লিখতে শুরু করেছিলাম; কিন্তু সে এমন অগোছাল এলোমেলোভাবে বলতে আরম্ভ করল যে, আমার পক্ষে তা গুছিয়ে লেখা অসাধ্য। তাই আমি তার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনাটা জেনে নিয়ে তার বলবার কথা সাধ্যমত বুঝাতে চেষ্টা করে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। জানিনা এতে উদ্দেশ্য কতটুকু সিদ্ধ হবে; তার মনের কথা কতটুকু আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব।

প্রথমে আমি তাকে বলেছিলাম, 'তুমিই দু'চার লাইন যা পারো লিখে দাও। তোমার নিজের হাতের লেখা চিঠি পেলেই বিমলবাবু খুশি হবেন।' কিন্তু রেণু তাতে কিছুতেই রাজী হল না। এ-ও হ'তে পারে, আপনার সঙ্গে ওর যা সম্পর্ক তাতে ঘটনাটা সব খোলাখুলিভাবে লিখতে ওর লজ্জা করছে।

আপনি বোধ হয় রেণুকে এবার চিনতে পেরেছেন। আপনাদের গ্রামের সেই অনাথা মেয়েটি; বাগবাজারে চৌধুরীদের বাড়িতে তিন বছর আগে আপনি যাকে রেখে এসেছিলেন। চৌধুরীরা আপনার আত্মীয়। হিসেব করলে যত দূরেরই হোক ওঁদের সঙ্গে রেণুরও একটু সম্পর্ক বেরোয়। সেই কথা ভেবেই আপনি ওকে অন্য কোথাও না রেখে, কোনো আশ্রমে টাশ্রমে না পাঠিয়ে চৌধুরীদের ওখানে দিয়েছিলেন। এখন মনে হয় মেয়েটার অন্য কোনো ব্যবস্থা করলেই বোধ করি ভালো করতেন। তাহলে ও খানিকটা লেখাপড়া

কি হাতের কাজটাজ কিছু শিখতে পারত। চৌধুরীদের বাড়িতে তেমন কোনো সুযোগই ও পায়নি।

প্রথমে অবশ্য বাড়ির বউঝিদের অল্পস্বল্প ফুটফরমায়েশ খাটা, বাচ্চা ছেলেদের কোলে নেওয়া, খাওয়ানো, ঘুমপাড়ানো এই সব ছোটখাট কাজের ভারই ওর ওপর ছিল। সবাই বলেছিলেন, 'বাড়ির মেয়ের মতো থাকো। তুমি তো আমাদের আত্মীয়, লজ্জাসংকোচের কি আছে?'

এমন অভ্যর্থনা পেয়ে রেণুর খুব আনন্দ হয়েছিল। বড় তেতলা বাড়ি। বাড়িভরা লোকজন। ওর মতো ষোল-সতেরো বছরের মেয়েই আছে বাড়িতে গুটিচারেক। কেউ স্কুলে পড়ে, কেউ কলেজে। সবাই ওকে ভাব জমাবার জন্যে, দলে টানবার জন্যে ব্যস্ত। কেউ নিজের পুরোনো সাড়ি দেয়, কেউ স্নো-সাবান দিয়ে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করে। বাড়ির ছেলেরাও যেন ওর ওপর একটু মনোযোগী। বোনদের বাদ দিয়ে রেণুকেই তারা নানা কাজে ডাকে, নানা সৌখিন কাজে খাটায়। দামী কলমটা রেণুর হাতে ছেড়ে দিয়ে বলে, 'ধুয়ে এনে কালি ভরে দাও তো।'

বিছানা পেতে দেওয়া, ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখা, এসব কাজে রেণু আনাড়ি হলেও তাকে দিয়ে করিয়েই যেন বাড়ির ছেলেদের আনন্দ। বাড়ির মেয়েরা ঠাট্টা করে বলে, 'রেণু একা আমাদের সকলের জায়গা কেড়ে নিয়েছে।'

বউরাও পরিহাস করে, 'তোমাদের জায়গা ঠিকই আছে ঠাকুরঝি, আমাদের নিয়েই ভাবনা।'

এসব ঠাট্টা-পরিহাস বুঝবার বয়স রেণুর হয়েছে। সেখান থেকে লজ্জায় পালিয়ে গিয়ে গিন্নীদের কাছে এসে বসে।

এ-সময় মাঝে মাঝে আপনি খোঁজখবর নিতে আসতেন। রেণুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কেমন আছ?'

রেণু হেসে বলত, 'ভালোই।'

বাড়ির গিন্নীদের কাছে আপনি ওর প্রশংসাই তখন শুনতে পেতেন। এমন শান্তশিষ্ট কর্মঠ ভালো মেয়ে আর হয় না।

কিন্তু অবস্থাটা ক্রমে ক্রমে বদলাতে লাগল। শোভাবাজারে চৌধুরীদের যে কাপড়ের দোকান আছে, তাতে লাভের অংক কমে গেল। অফিসের

ছাঁটাইয়ের ফলে বাড়ির গুটি দুই ছেলে বেকার হল। আর কলেজ থেকে নতুন যারা পাশ করে বেরোল তাদের চাকরি জুটবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। কাপড়ের দোকানের আয় এমন নয় যাতে এতবড় পরিবারের খরচ বেশ ভালোভাবে চলতে পারে।

এসব বাইরের খবর আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু ভিতরের মেয়েদের ব্যাপারটা বোধ হয় তেমন করে জানেন না। কারবারের অবস্থা খারাপ হওয়ায় বড়কর্তা, ছোটকর্তা দুজনের মেজাজই গেল বিগড়ে। সংসারে ঝগড়াঝাঁটি কথা-কাটাকাটি শুরু হল। সবাই ধমক খেতে লাগল। রেণুও বাদ গেল না।

বড়কর্তা বললেন, 'ওসব বাবুগিরি, বিলাসিতা চলবে না, খরচ কমাও।'

দোকানের দু'জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করলেন। বাজারের পয়সা চুরি করে বলে চাকরটাকে বিদায় দিলেন। একটা ঝি-ছিল, খাওয়াপরা ছাড়া দশ টাকা করে মাইনে নিত, তাকেও বাদ দিলেন। বললেন, নিজেরা করে-কর্মে খাও। এত বাবুগিরি চলবে না।'

বাইরের লোকজনের মধ্যে রইল একটা ঠিকে-ঝি, আর রেণু। ওর ভয় হতে লাগল বড়কর্তা তাকেও চলে যেতে না বলেন, তাহলে সে কোথায় দাঁড়াবে। এই চৌধুরীবাড়ি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও যে কোনো জায়গা আছে, সে কথা রেণুর মনে হয়নি। রেণু নিজেই ইচ্ছা করে সংসারের বেশি বেশি কাজ করতে লাগল। গিন্নীদের, বউদের হাতের কাজ কেড়ে নেয়। রাঁধে, জল টানে, কুড়িজন লোকের রেশনের চালের কাঁকর বাছে, পাছে কেউ তাকে অনাবশ্যক মনে করে।

তা অবশ্য কেউ মনে করলেন না। সংসারের অনেক কাজের ভারই গিন্নীমা ওর হাতে ছেড়ে দিলেন। বিশেষ করে রান্নাঘরের ভারটা প্রায় সম্পূর্ণই রেণুর ওপর পড়ল। না পড়ে উপায় কি। বড়গিন্নী, ছোটগিন্নী কারোরই ছেলেপুলে হওয়া বন্ধ হয়নি। আর বউদের তো সবে শুরু হয়েছে। তাছাড়া অসুখবিসুখ আছে। মেয়েদের স্কুলকলেজের পড়া আর পরীক্ষার কড়াকড়ি বেড়েছে। তাদের পক্ষে সংসারের অন্য কাজকর্ম করা পোষায় না। তাই স্বাভাবিকভাবে রেণুকেই সব বুঝে নিতে হল।

আপনি তখন চাকরি-বাকরি আর সভাসমিতি নিয়ে ব্যস্ত। আসবার

অবসর বেশি পান না। তবু দুচার মাস অন্তর মাঝে মাঝে এসে যখন জিগ্‌গেস করতেন, 'কেমন আছ রেণু?' তার কাছ থেকে ওই একই উত্তর পেতেন, 'ভালোই আছি বিমলদা।'

আপনি ব্যস্তভাবে চলে যেতেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন করতেন না। যদি করতেন তাহলে তখনই হয়তো আপনি কিছু কিছু বুঝতে পারতেন। আমার মনে হয়, জিজ্ঞাসা না করেই আপনি বুঝেছিলেন। কিন্তু কিছু করাটা আপনার পক্ষে সহজসাধ্য হয়নি। আপনি অবিবাহিত, মেসে থাকেন। নিজের নানারকম ঝামেলা আছে। এ সব জানত বলেই রেণু আপনাকে কিছু খুলে বলত না। ভাবত অনর্থক বিব্রত করে কি লাভ। আপনি ওর জন্যে যথেষ্ট করেছেন। আরো যদি কিছু করবার থাকে তা আপনি নিজেই করবেন।

গত বছর বড়কর্তার সেজো আর ছোটকর্তার মেজো মেয়ে দীপ্তি, তৃপ্তি দুজনের একসঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। সেই বিয়েতে আপনি নিমন্ত্রণ খেতে এসে বড়গিন্নীর কাছে রেণুর নামে প্রথম নালিশ শুনে যান। রেণু আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিল। বড়গিন্নী আপনার কাছে বলেছিলেন, রেণুর সেই আগের মতো শান্তস্বভাব আর নেই। ভারি মুখ হয়েছে ওর। কথায় কথায় তর্ক করে। মুখে মুখে জবাব দেয়। আরো একটা গুণ বেড়েছে। রাস্তার ফেরিওয়ালা ডেকে হাসিগল্প করে। একথা শুনে আপনি যে ভ্রূ কুঁচকেছিলেন, তা রেণুর চোখ এড়ায়নি। আপনি বলেছিলেন, 'এসব তো ভালো নয় মাসিমা। আপনি ওকে শাসন করে দেবেন।'

আপনার এই কথায় রেণু বড় দুঃখ পেয়েছিল। ওর হাতে ছিল দইয়ের হাঁড়ি, ভেবেছিল সেটা রেখে এসে আপনাকে বুঝিয়ে বলবে।

রেণু মাঝে মাঝে তর্ক করে, কথার পিঠে কথার জবাব দেয় তা ঠিকই। তার একার ঘাড়ে সবাই সব কাজ চাপিয়ে দেন, আর পান থেকে একটু চুণ খসলেই যদি তা নিয়ে বকাবকি করেন, তাহলে একেবারে মুখ বুজে ও কি করে থাকে। সেও রক্তমাংসের মানুষ। কিন্তু কোনো খারাপ কথা সে কাউকে বলেনি। একদিন শুধু ছোটগিন্নীকে বলেছিল, 'এমন বিনে মাইনের ঝি আর পাবেন না।' তিনিও জবাব দিতে ছাড়েননি, বলেছিলেন, 'যেখানে মাইনে পাস গেলেই পারিস। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব। আজকালকার দিনে খেতে পরতে দিলে অমন কত গণ্ডা পাওয়া যায়।'

সব কথাই আপনাকে বলবে ভেবেছিল। কিন্তু গিয়ে দেখে আপনি বিয়েবাড়ির পান মুখে দিয়ে চলে গেছেন। আপনি শুধু একপক্ষের কথাই শুনে গেলেন, আর একপক্ষের কিছুই শুনলেন না, সেজন্যে রেণুর মনে সেদিন ভারি দুঃখ, অভিমান, এমনকি একটু রাগও হয়েছিল আপনার ওপর। সুযোগ পেলে সেদিন অনেক কথাই রেণু আপনাকে বলত। চৌধুরীদের কারবারের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হওয়া সত্ত্বেও বাড়ির কাজকর্মের জন্যে ওরা যে আর নতুন লোকজন রাখেন নি, জল তোলা, বাটনা বাটা, দুবেলা রান্না, সবই রেণুকে করতে হচ্ছে এ খবরটা আপনাকে সে জানাত।

আর ফেরিওয়ালাদের ডেকে গল্প করার কথা। তা-ও রেণুর মুখেই আপনি তখন শুনতে পেতেন। কারণ, ব্যাপারটা তখনও খুব ঘোরালো হয়ে ওঠেনি। ওদের সেই রামকান্ত বোস স্ট্রীটের গলি দিয়ে কত ফেরিওয়ালাই তো যেত। কেউ জিনিস বেচতে চায়, কেউ কিনতে চায়। ছিট-কাপড়, বাসন, শিশিবোতল, শোনপাপড়ি, চিনেবাদাম, ফুল, ধূপকাঠির ফেরিওয়ালারা সকলেই চৌধুরীবাড়ির কাছ দিয়ে যাতায়াত করত। দুপুর বেলায় কি বিকেল বেলায় এসে হাঁক দিত। বাড়ির বউঝিরা দোরের কাছে এসে নেড়েচেড়ে দেখত, দরদাম করত, কোন কোনদিন জিনিস রাখত, বেশির ভাগ দিনই ফেরত দিত।

সেদিন বিকেল বেলা নতুন বউ নীলিমা দোতলা থেকে বলল, 'রেণু, আমি চুল বাঁধছি ভাই। ধূপকাঠিওয়ালা এসেছে। দু আনার ধূপকাঠি রাখো তো ওর কাছে। ওর কাঠিগুলো বেশ ভালো।'

বিকেলের জলখাবারের জন্য রেণু সবে ময়দা মাখতে বসেছিল। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে সদরের কাছে এসে দাঁড়াল, 'দু আনার ধূপকাঠি দিন তো।'

'দাও' কথাটা ঠিক মুখে এলো না রেণুর। বাইশ-তেইশ বছরের যুবক। লম্বা ছিপ্‌ছিপে চেহারা। গায়ে একটা ছিটের হাফ শার্ট। পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডালও আছে। একে চট্‌ করে 'তুমি' বলা কি সহজ। হলই বা ফেরিওয়ালা।

'চার আনা দামের প্যাকেট যদি নেন সেগুলি আরো ভালো হবে।' ফেরিওয়ালা একটু হেসে বলেছিল।

রেণু বলেছিল, 'না, না, আপনি দু আনারটাই দিন।'

ফেরিওয়ালা আর কিছু না বলে দু-আনার ধূপকাঠি দিয়ে চলে গিয়েছিল।

পরদিন দুপুরের একটু পরে ফেরিওয়ালা ফের এসে হাজির—'ধূপকাঠি।'

রেণু দোরের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আজ আর দরকার নেই আমাদের। কাল যা দিয়ে গিয়েছিলেন, তা-ই পড়ে আছে।'

ফেরিওয়ালা বলল, 'অল্প করে কিছু নিন। কাল আপনাদের এখানে বউনি করায় আমার বিক্রি খুব ভালো হয়েছিল।'

রেণু হেসে বলল, 'একথা বোধ হয় সব বাড়িতেই একবার করে বলেন।'

ফেরিওয়ালাও হাসল, 'না, না, সত্যি বলছি। আপনার হাতে প্রথম বউনি হওয়ায় কাল আমার খুব লাভ হয়েছে।'

এমন শুভলক্ষণ যে রেণুর মধ্যে আছে, সে কথা এর আগে কেউ তাকে বলেনি। ভারি ভালো লাগল ওর। বলল, 'দাঁড়ান। আমি পয়সা নিয়ে আসছি।'

সেদিন আর পয়সা চাইতে নতুন বউদির কাছে গেল না রেণু, পুরোনো বউদের কাছেও নয়। ছোট একটা বার্লির কৌটোর মধ্যে দুচার পয়সা করে নিজে যা সঞ্চয় করেছিল, তার থেকে একখানা দু আনি বের করে নিয়ে এল।

ফেরিওয়ালা রঙিন কাগজে মোড়া ধূপকাঠির আর একটি প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে গেল।

কাঠিগুলি সব রেণু নিজে নিল না। বাড়ির বউঝিদেরও দুটি-চারটি করে বিলোতে লাগল।

নতুন বউ বলল, 'খুব যে ফুর্তি! এতক্ষণ ধরে কি গল্প হচ্ছিল ধূপকাঠি-ওয়ালার সঙ্গে।

'বাঃ রে, কি আবার হবে।'

নীলিমা হেসে বলল, 'আমি সব শুনেছি।'

বড়গিন্নী ধূপকাঠিগুলি দেখে রাগ করতে লাগলেন। 'এই তো কালও কতকগুলি কাঠি কিনেছ নতুন বউমা। আজ আবার কেন মিছামিছি পয়সা নষ্ট করলে?'

নীলিমা জবাব দিল, 'আজ আর আমি কিনিনি মা। রেণু তার নিজের পয়সায় কিনেছে।'

বড়গিন্নী জবাব দিলেন, 'নিজের পয়সা পরের পয়সা বুঝিনে বাপু। পয়সা

তো সব একজায়গা থেকেই আসে। বাড়িশুদ্ধ সকলেই যদি এমন বিলাসী হয়ে ওঠে তাহলেই হয়েছে।'

কিন্তু বড়গিন্নীর রাগ আর বকুনিতে রেণুর সেদিন মন খারাপ হল না। তাঁর কথার কোনো জবাব দিল না রেণু। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির কাজকর্ম সেরে গা ধুয়ে, চুল বেঁধে একখানা ধোয়া শাড়ি পরে নিজের ঘরে ধূপকাঠি জ্বালল।

রান্নাঘর আর ভাড়ারঘরের মাঝখানে ছোট্ট একটু খুপরির মতো জায়গা আছে। সেই ওর থাকবার ঘর। আগে অবশ্য দোতলায় একটি ঘরে ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ও থাকত। কিন্তু বাড়ির দুটি ছেলের বিয়ে হওয়ায় ও-বাড়িতে ঘরের খুব অনটন হয়েছে। রেণু নেমে এসেছে এই নিচের ঘরে। সন্ধ্যাবেলায় সে ঘরে এই প্রথম ধূপকাঠি জ্বালল।

খাওয়াদাওয়া চুকতে এগারোটা বাজল। সকলের ঘুমোতে বারোটা; কিন্তু রেণুর চোখে ঘুম নেই। সে একটার পর একটা ধূপকাঠি জ্বেলেই চলেছে।

তারপর রেণু প্রায়ই ধূপকাঠি রাখত। ধূপকাঠিওয়ালার সঙ্গে কিছু কিছু আলাপও চলত এসব ধূপকাঠি কি নিজেরা তৈরি করা যায়, না বাজার থেকে কিনে আনতে হয়; টাকায় কত লাভ থাকে, ধূপকাঠিওয়ালা কখন বেরোয়, কখন ঘরে ফেরে; হলই বা মা আর ছেলের সংসার; চলে কি করে—এই সব সাধারণ কৌতূহল, তুচ্ছ কথাবার্তা।

বড়গিন্নী এইকুটুকেই অতবড় করে সেদিন আপনার কাছে লাগিয়েছিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা গোপন রইল না। ধূপকাঠিওয়ালার সঙ্গে রেণুর এই ঘনিষ্ঠতা শুধু ওদের বাড়ির নয় পাড়ার সকলেরই চোখে পড়ল। ধূপকাঠি এ পাড়ায় বিক্রি হোক আর না হোক ছেলেটি রোজই আসে। রেণুও জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়। রোজ দু জনের কথা হোক আর না হোক যেন দেখা হলেই যথেষ্ট। সারাদিন নানা কাজকর্মের মধ্যে রেণু এই মুহূর্তটির জন্যে প্রতীক্ষা করে। রোজ সেই বিশেষ সময়টিতে জানলার কাছে আসে। এক প্যাকেট করে ধূপকাঠি নেয়। কিন্তু ফেরিওয়ালা আর পয়সা নেয় না। রেণুরও পয়সা দেওয়ার তেমন গরজ নেই। জানলার একটা শিক আপনিই ভেঙে গিয়েছিল (রেণু তাই বলে), কি সে নিজেই তুলে ফেলেছিল (চৌধুরীদের অভিযোগ তাই) জানি না,—সেই বড় ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে নাকি চায়ের কাপও রেণু ফেরিওয়ালার হাতে তুলে দেয়।

ব্যাপারটা নিয়ে যে পাড়ায় নানারকম কানাকানি, হাসাহাসি চলছে, তা আমিও লক্ষ্য করেছিলাম।

তারপর কালকের ঘটনার কথা বলি। শনিবারের অফিস সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেছে। বাড়িতে কাজ আছে বলে আমি আর কোথাও না গিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। কিন্তু আমাদের গলির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে দেখি এগুতে আর পারিনে। ভিড় গোলমাল হৈচৈ। সেই ধূপকাঠিওয়ালাকে ধরে চৌধুরীবাড়ির পালোয়ানের মতো দুটি ছেলে ঘুষির পর ঘুষি চালাচ্ছে। পাড়ার আর সব ছেলেবুড়োরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

ফেরিওয়ালা সেই মার ঠেকাতে ঠেকাতে বলছে, 'আগে আমার কথা শুনুন। আমরা বিয়ে করব ঠিক করেছি।'

পাড়ার সব মেয়ে পুরুষ হো হো করে হাসছে আর নানারকম ব্যঙ্গবিদ্রূপ করছে। একজন তরুণ ছেলে আর একটি তরুণীকে বিয়ে করবে, এর চেয়ে পরিহাসের ব্যাপার সংসারে যেন আর কিছুই নেই। যেহেতু ছেলেটি ফেরিওয়ালা, আর মেয়েটি বাড়ির ঝি।

ছেলেটির পক্ষ নিয়ে আমি দুচার কথা বলতে যাচ্ছিলাম, লোকে এমন সব মন্তব্য শুরু করল যে, ঘরে চলে আসতে বাধ্য হলাম।

শেষ পর্যন্ত ওরা ছেলেটিকে আধমরা করে ঘাড় ধরে গলি থেকে বের করে দিল। বাণ্ডিল থেকে পড়া ধূপকাঠিগুলি রাস্তায় ধুলোয় ছড়িয়ে রইল।

দাদার কাছে ব্যাপারটা বলায় তিনিও আমার ওপর একটু রাগ করলেন, 'তোর এসবের মধ্যে যাওয়ার কি দরকার ছিল।'

আমি আর যাইনি। কিন্তু রেণুই ওবাড়ি থেকে কি করে যেন পালিয়ে আমার কাছে চলে এসেছে। সামনাসামনি বাড়ি। ওর সঙ্গে আমার সামান্য মুখচেনা ছিল। কিন্তু এখন ও আমাকে এমন করে ধরেছে যেন আমি ওর চিরকালের চেনা।

ওকে বলেছিলাম, 'তুমি যাও, ক'টা দিন চুপচাপ থাকো, তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।'

কিন্তু রেণু বলল, 'না দিদি, যারা ওকে অমন করে মেরেছে, আমি তাদের বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকব না।'

দাদা শান্তশিষ্ট নির্বিরোধ মানুষ। তিনি বড় বিব্রত বোধ করছেন।

চৌধুরীরা শাসাচ্ছে পুলিস-কেস্ করবে। তাতে অবশ্য সুবিধা করতে পারবে না। রেণুর বয়স আঠেরো উত্রে গেছে। কিন্তু আইনটাই তো সব সময় বড় কথা নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা প্রবলের হাতের অস্ত্র।

রেণুর অনুরোধে আপনাকে সব কথা খুলে জানালাম। ছেলেটির নাম-ঠিকানাও ওর কাছ থেকে শুনে নিয়েছি। অজিত বিশ্বাস। বেলগাছিয়ার উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকে।

আপনি যদিও চৌধুরীদের আত্মীয়, তবু আপনার ওপর রেণু খুব ভরসা রাখে।

সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন।

অনধিকার-চর্চার জন্য আর একবার মার্জনা চাইছি। ইতি—

বিনীতা
মাধুরী সেনগুপ্ত

পূর্ণ

সকাল বেলায় পারিবারিক চায়ের আসর বসেছিল। শৈলেনের ভগ্নীপতি শীতাংশু থাকে দার্জিলিং-এ। কাজ করে সেখানকার সিক্কা কোম্পানীর ফ্যান্সী স্টোরে। সেই পাঠিয়ে দিয়েছে হ্যাপি ভ্যালির দু'পাউণ্ড চা। তার পাউণ্ডখানেক সুষমা কালই বাবাকে উপহার দিয়েছে। তিনিও চা খেতে ভালবাসেন। সামনের রবিবার শৈলেনের জন দুয়েক বিশিষ্ট বন্ধু আসবার কথা আছে। সুষমা ভেবেছিল, দার্জিলিং-এর এই দুর্লভ চা তখন থেকেই শুরু করবে। শৈলেনের বন্ধু পরেশবাবু আর প্রিয়তোষবাবু দুজনেই সুষমার হাতের চায়ের খুব প্রশংসা করেন; কিন্তু শৈলেনের আর সবুর সইল না, সে বলল, আজই আরম্ভ করে দাও হ্যাপি ভ্যালিকে, রবিবারের তো আরো পুরো দুদিন বাকি। এ দুদিন আনহ্যাপি থেকে লাভ কি।

সাধারণত চা খাওয়া হয় মিল্ক পাউডার দিয়ে। আজ দার্জিলিং চায়ের সম্মান রাখবার জন্যে ন্যাশনাল ডেয়ারীর অধীরবাবুর কাছ থেকে আধ পো দুধ বেশী নিল সুষমা। রোজ রান্না ঘরের সামনে চাটাই পেতে স্বামী বসে চা খায়। কোন প্লেটের কোণা ভাঙা থাকে, কোনো কাপের হাতল থাকে না। প্রাণ ধরে আস্ত কাপডিসগুলিকে উঁচু তাক থেকে নামায় না সুষমা। যা দুরন্ত ছেলেমেয়ে দুটি ভাংতে কতক্ষণ। আজ দার্জিলিং চায়ের সৌরভে, হ্যাপি ভ্যালির গৌরবে সুষমার মনে দাক্ষিণ্য নেমেছে। আজ আর চাটাই নয়, আজ আর রান্না ঘরের দুয়ারে নয়, ছেলেমেয়েদের পড়বার জন্যে যে ছোট টেবিলখানা কিনেছে, সেই খানাই শোয়ার ঘরের মাঝখানে টেনে নিল সুষমা। তার ওপর বিছিয়ে দিল নিজের হাতের তৈরি চার কোণায় সবুজ সুতোর ফুলতোলা সাদা টেবিল ঢাকনি। দুখানা চেয়ার আছে ঘরে। টেবিলের দুই ধারে। তাক থেকে নামাল

নীল রঙের ছজোড়া কাপপ্লেট। সাদা চীনে মাটির কেটলি থেকে তরল তামাটে পানীয়ে তা পূর্ণ হয়ে উঠল।

শৈলেন হেসে বলল, 'ব্যাপার কি, আজ কি আমাদের ম্যারেজ এ্যানিভার্সারি নাকি?'

সুষমা বলল, 'মনে করলে তাই, মনে করলে রোজই তো ম্যারেজ এ্যানিভার্সারি।'

শৈলেন বলল, 'উঁহু, ইংরেজি ভুল হোল। এ্যানিভার্সরিটা বছরে বছরে একবারের বেশি হতে পারে না। রোজ যেটা হয় তার নাম—'

সুষমা মৃদু হেসে চোখ তুলে তাকাল, 'কি তার নাম?'

শৈলেন বলল, 'তার নাম দাম্পত্য-দ্বন্দ্ব।'

সুষমা বলল, 'আহা কেবল দ্বন্দ্বই বুঝি?'

শৈলেন বলল, 'দ্বন্দ্বই তো। দ্বন্দ্বের ছুটি মানে আছে, মনে নেই?'

সুষমা লজ্জিত হয়ে বলে, 'হয়েছে থাম।'

হাবুল আর বুবুল ছুটি ছেলেমেয়ে এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিল, মা-বাবার আলাপের সাড়া পেয়ে ওদের ঘুম ভাংল। বড়টি চার বছর। তক্তপোষ থেকে নেমে সুষমার টেবিলের তলা দিয়ে গিয়ে কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে বলল, 'আমি চা খাব মা।'

ওর চেয়ে ছুবছরের ছোট বুবুলও এসে, দাদার প্রতিধ্বনি ক'রে বলল, 'আমিও খাব।'

সুষমা বলল, 'তোমরা ছুধ খেয়ো একটু বাদে।'

কিন্তু ছেলে ছুটি নাছোড়বান্দা। ওদেরও চা চাই।

শৈলেন বলল, 'দাও না কোয়ার্টার কাপ ক'রে।'

সুষমা ধমক দিয়ে উঠল, 'কি যে বল তুমি। ওইটুকু ছেলেমেয়ের চা ভালো নাকি?'

শৈলেনের পিতৃস্নেহে আজ বান ডেকেছে। বাচ্ছা ছেলেমেয়েকেও সে চা খাওয়াবে। অগত্যা সুষমা ওদের জন্যেও চায়ের ব্যবস্থা করল। ছুজনকে ছুটি কাপ দিয়ে চা ঢালল তাতে।

কিন্তু শুধু চা হলেই চলবে না শ্যামলের। বাবার মত তার একখানা চেয়ারও চাই। বুবুলকে সুষমা কোলে নিয়ে বসল। শৈলেন ছেলেকে বলল, 'তুমি আমার কোলে বস এসে।'

শ্যামল বাপের কোল চায় না, বাপের মত কাঠের চেয়ার চায়।

অগত্যা সুষমা উঠে গেল পাশের ঘরে। সরোজ-বীণা তাদের প্রতিবেশী। সুষমা বীণাকে বলল, 'দাওতো ভাই তোমাদের চেয়ারখানা।' বীণা বলল, 'কেন আবার চেয়ার দিয়ে কি হবে? অতিথ ব্যথিত এসেছে না কি কেউ?' সুষমা হেসে বলল, 'দুজন অতিথ এসেছে। শ্যামল আর বুবুল।'

বীণা মুচকি হেসে বলল, 'ওরা তো এসে পুরোন হয়ে গেছে। তিন নম্বরের অতিথটি কবে আমদানি হচ্ছে তাই বল।'

সুষমা চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সরোজের সামনেই বীণা ওধরণের ঠাট্টা করায় সুষমা ভারি লজ্জিত হোল। চাপা গলায় বলল 'যাঃ।' তারপর চেয়ারখানা উঁচু ক'রে তুলে নিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে। ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবারে বাবা, তোমার জ্বালায় যে সুস্থ হয়ে একদিন বসে একটু চা খাব তারও জো নেই।'

হাঙ্গামা চুকিয়ে ফের নিজের চেয়ারে এসে বলল সুষমা। ফের দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর মৃদু হেসে চায়ের কাপে দুজনেই ঠোঁঠ ছোঁয়াল।

কিন্তু এক চুমুক খেয়েছে কি খায়নি, সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজায় কড়া নেড়ে উঠল আর সেই সঙ্গে চড়া সুরে ভারি গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'শৈলেন আছ নাকি? শৈলেন?'

শৈলেন মৃদু স্বরে বলল, 'নাঃ মাটি করলে। কে এই মূর্তিমান রসভঙ্গ?' স্ত্রীকেই জিজ্ঞেস করল শৈলেন।

সুষমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি জানি, চেনা গলা বলে তো মনে হচ্ছে না। দেখ গিয়ে, আহা চা'টা খেয়েই যাও না হয়।'

কিন্তু সদর থেকে ফের সেই ভারি গলার আহ্বান। 'শৈলেন আছ নাকি?' না থেকে আর উপায় কি, শৈলেন সাড়া দিয়ে বলল, 'আছি।' তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটু বাদেই ফিরে এল। সঙ্গে বুড়ো ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের এক ভদ্রলোক। বলবার সময় বলতে হয় ভদ্র। কিন্তু বেশেবাশে চেহারায় কোনটিতেই ভদ্রত্বের নামগন্ধ নেই। যেমন জীর্ণ দেহ, তেমনি জীর্ণ জামা-কাপড়, গায়ে ঘামে বিবর্ণ ময়লা একটা পাঞ্জাবি। কাঁধের কাছে ছেঁড়া। পায়ে

তালি দেওয়া চটি। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দেহ সামনের দিকে নুয়ে পড়ায় অনেকটা কুঁজো বলে মনে হয়।

সুষমা অপ্রস্তুত হয়ে মাথায় আঁচল টেনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

শৈলেন পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আসুন কাকা; ইনি আমাদের ভাঙ্গার পূর্ণ দে। এক সময় বাবার এ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন।'

সুষমা একটু নীচু হয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করল।

পূর্ণবাবু বললেন, 'বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক, চা খাচ্ছিলে বুঝি? আমি এসে বাধা দিলাম!'

সুষমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না বাধা কিসের।'

হাবুল আর বুবুলের চা খাওয়ার খেয়াল মিটেছে বহুক্ষণ। বাইরের বারান্দাটুকুতে নেমে গাড়ি গাড়ি খেলা শুরু ক'রে দিয়েছে তারা।

পূর্ণবাবু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই বুঝি ছেলেমেয়ে? বেশ বেঁচে থাকুক। বাপদাদার নাম রাখুক। বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক।'

হাবুল যে চেয়ারে বসেছিল সেটা পূর্ণবাবুকে দেখিয়ে দিয়ে শৈলেন বলল, 'বসুন কাকা, তারপর খবর টবর সব ভালো তো?' পূর্ণবাবু বললেন, 'ভালো আর কই বাবাজী। সব ছেড়ে কেটে এলাম এখানে। কিন্তু 'তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।'

তারপর ধীরে ধীরে নিজেদের অবস্থার কথা প্রায় সবই খুলে বললেন পূর্ণবাবু। পাকিস্তানের ভিটেমাটি বিক্রি ক'রে এসেছেন প্রায় বছর খানেক। সঙ্গে টাকাকড়ি যা এনেছিলেন তা সবই শেষ হয়েছে। এখন মানুষগুলি শেষ হবার জোগাড়। ঘরে স্ত্রী আছে। আছে বিয়ের যোগ্য বয়স্থা দুটি মেয়ে। একটির বয়স বছর আঠের আর একটির পনের ষোল। ওদের পরে ছোট ছোট দুটি ছেলে। টালীগঞ্জে খালের কাছাকাছি বাসা নিয়ে আছেন। সে বাসা বাসের যোগ্য নয়। প্রথমে দুখানি ঘরই নিয়েছিলেন। ভাড়া দিতে না পারায় একখানা ছেড়ে দিয়েছেন। যা অবস্থা তাতে আর একখানাও ছেড়ে দিতে পারলেই ভালো হয়। দুঃখের কাহিনী আর শেষ হ'তে চায় না। তবু মিনিট কয়েকের মধ্যে তা শেষ করে পূর্ণবাবু বললেন, 'অনেক খোঁজ খবরের পর তোমার ঠিকানা পেয়ে আমি এখানে এসেছি শৈলেন। একটা চাকরি আমাকে জোগাড় ক'রে দিতে হবে।'

শৈলেন বিস্মিত হয়ে বলল, 'এই বয়সে কি চাকরি করবেন আপনি।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'কেবল বয়সটাই দেখছ বাবা অবস্থা দেখছ না। আমার প্রথম বয়সের ছেলে যদি বেঁচে থাকত তাহলে তার বয়স এই তোমার মত বছর তিরিশেক হোত। কিন্তু তাতো রইল না। এখন যদি কিছু না করি, বাকি যেগুলি আছে তাদেরও যে রাখতে পারবনা।'

শৈলেন সহানুভূতির স্বরে বলল, 'তাতো ঠিকই। কিন্তু কি চাকরি করবেন আপনি তাই ভাবছি।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'ভাবাভাবি নয়, কিছু না কিছু একটা আমাকে জুটিয়ে দিতেই হবে। নিজের মুখে নিজের কথা বলা শোভা পায় না। কিন্তু বাংলা মুসাবিদা যেটুকু জানি তার ওপর কেউ কলম চালাতে পারবে না। বিশ্বাস না হয়, সুরেন দত্ত মশাইর কাছেই চিঠি লিখে জেনে নিয়ো আমি সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি।'

শৈলেন বলল, 'না না বিশ্বাস না করার কি আছে। তবে যা দিনকাল বুঝতেই তো পারছেন। আচ্ছা, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখব।'

শৈলেন উঠে দাঁড়িয়ে জামা গায়ে দিতে লাগল।

পূর্ণবাবু বললেন, 'কোথায় বেরুচ্ছ ?'

শৈলেন বলল, 'আফিসে।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'সে কি এই তো সবে সাতটা।'

সাতটা'র আগেই অফিস বসে শৈলেনের। জেল প্রেসে চাকরি করে শৈলেন। কাজটা কেরাণীর। সময়টা ফ্যাক্টরীর। সকাল থেকে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত। মাঝখানে একঘন্টা ছুটি। তারপর ফের সেই সাড়ে চারটে পর্যন্ত কলম পেষা।

পূর্ণবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'তা হলে চল আমিও বেরোই, যেতে যেতেই সব বলব।'

শৈলেন ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না সে কি হয়। কতকাল পরে দেখা। যাহোক একটু চা'টা মুখে দিয়ে যান। শোন, কাকাকে ওই দার্জিলিং-এর চা একটু করে দাও তো। খুব ভালো চা এসেছে। এখানে পাঁচ ছ' টাকার কমে ও চা বিক্রি হয় না। দেখুন খেয়ে।'

শৈলেনের আর সময় ছিল না। অমনিতেই লেট হয়ে গেছে। স্ত্রীর ওপর

পূর্ণবাবুর আপ্যায়নের ভার দিয়ে সে স্যাণ্ডাল পায়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো।

বুড়োমানুষকে খালি একটু চা তো দেওয়া যায় না। পাশের ঘরের সরোজ-বাবুকে দিয়ে সুষমা মোড়ের দোকান থেকে কিছু খাবারও আনাল। তারপর সেই নীলপদ্মের মত কাপজোড়ার একটা ধুয়ে পূর্ণবাবুকে সে যত্ন করে চা করে দিল। পূর্ণবাবু বললেন, 'আহা হা, আবার ওসব কেন মা। চা খাওয়ার আমার তেমন অভ্যেস নেই। আমরা পাড়াগেঁয়ে বুড়ো মানুষ, চা-টা তেমন ভালোও বাসিনে।'

সুষমা হেসে বলল, 'খান একটু, চা-টা সত্যি ভালো।'

বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই চায়ের কাপ শেষ করলেন পূর্ণবাবু।

হেসে বললেন, 'সত্যিই খুব ভালো খেলাম। কিন্তু কেবল চায়ের গুণ নয়, মালক্ষ্মীর হাতের গুণও আছে। চা সবাই করতে জানে না মা।'

সুষমা লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল।

যাওয়ার সময় পূর্ণবাবু বার বার করে অনুরোধ করে গেলেন সুষমা যেন স্বামীকে তাঁর হয়ে ভালো করে বলে। রোজ যেন একবার ক'রে খোঁচায়। চাকরি একটি না হলে পূর্ণবাবুর আর চলবেই না। ছেলেপুলে শুদ্ধ না খেয়ে মরতে হবে।'

সুষমা বলল, 'আচ্ছা আপনি ভাববেন না। উনি ওঁর সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। আমিও মনে করিয়ে দেব।'

সকাল বেলায় চায়ের আসর সাজাবার সময় যে সুরটা সুষমার মনে বেজেছিল, তা যেন আর রইল না। কিসের একটা বিরক্তি আর অপ্রসন্নতায় মন ভরে উঠল। সুষমাদের অবস্থাও ভাল নয়। স্বামী অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী। যা মাইনে পায় তাতে সংসারের খরচ চলে না। দুটো টুইশনের আয় তার সঙ্গে জুড়ে তবে কষ্টে স্বষ্টে সংসারযাত্রা চলে। সে টুইশন একেবারেই অস্থায়ী। কখনো থাকে, কখনো থাকে না। কারো কাছ থেকে মাইনে আদায় হয় কারো কাছ থেকে হয় না। হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটের এই ঘিঞ্জি গলির মধ্যে একতলা ভাড়াটে বাড়ির একখানা মাত্র ঘর। সঙ্গে একটু রান্নাঘর আছে। এরই ভাড়া গুণতে হয় মাসে মাসে তিরিশ টাকা। ছোট ছেলেটির স্বাস্থ্য ভালো না। অসুখবিসুখ লেগেই আছে। তার জন্যেও পাড়ার ডাক্তারকে মাসে মাসে

টাকা দিতে হয়। ভারি টানাটানির মধ্যেই সংসার চলে। কিন্তু নিজেদের অবস্থার চেয়ে পূর্ণবাবুর পরিবারের কথা ভেবেই মনটা খারাপ হয়ে গেল সুষমার। আহা, কি কষ্টেই না পড়েছেন বুড়ো মানুষটি। অতগুলি ছেলেপুলে নিয়ে একেবারে বেকার অবস্থায় কি ক'রে দিন কাটাচ্ছেন কে জানে। তা ছাড়া ওঁর মুখের মালক্ষ্মী ডাকটুকুও ভারি মিষ্টি লাগল সুষমার কানে। এমন ডাক আজকালকার বুড়োরাও যেন ভুলে গেছেন।

রাত্রে স্বামীর কাছে সুষমা আর একবার কথাটা পাড়ল, 'ভদ্রলোক অনেক ক'রে বলে গেলেন। ওঁর জন্যে একটু চেষ্টা করে দেখ।'

শৈলেন ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আচ্ছা দেখব। ওঁকে চা-টা দিয়েছিলে তো?'

সুষমা হেসে বলল, 'দিয়েছি গো দিয়েছি, চা কাকে না দিই।'

তা ঠিক। শৈলেনের বাসায় এলে চা সবাই খায়। শৈলেন নিজেই শুধু চা খেতে ভালোবাসে তাই নয়, বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে চা খাওয়ানোও ওর একটা বিলাস। শুধু বন্ধু-বান্ধবই বা কেন, আধা পরিচিত কোন লোক যদি অন্য কোন কাজে আসে আর শৈলেন যদি তখন বাসায় থাকে স্ত্রীকে অমনি হুকুম করবে 'চা কর।' সময় নেই, অসময় নেই, সকাল সন্ধ্যায় কতবার যে ভাতের হাঁড়ি আর ডাল-তরকারির কড়া উনুনের ওপর থেকে নামিয়ে রেখে সুষমাকে চা করতে বসতে হয়, তার আর ঠিক নেই। তার বাসা থেকে ফালতু অনেক লোক চা খেয়ে যায়। ঠিকে ঝিটি তো খায়ই, সাইকেলে ক'রে দুধের কেটলি চাপিয়ে আসেন ডেয়ারীর অধীরবাবু, তাঁর জন্যেও রোজ এক কাপ চা বরাদ্দ আছে। সপ্তাহে একবার করে উড়ে ধোপা গোবিন্দ আসে কাপড় নিয়ে শৈলেনের নির্দেশে সেও এক কাপ করে চা পায়। বাড়ির আর সব ভাড়াটেরা শৈলেনের বাসার নাম দিয়েছে 'চা-ভবন'। শৈলেনের বন্ধুরা সুষমাকে বলে 'চা-দাত্রী'।

তার চায়ের খ্যাতিতে শৈলেন আত্মপ্রসাদ বোধ করে, স্ত্রীকে মাঝে মাঝে বলে, 'অমন কর কেন। আজকাল মানুষকে মানুষ কিই বা দিতে পারে। এক কাপ চা দিয়ে যদি একটু খুশি করা যায় মন্দ কি?'

এমনি কম খরচে কম পরিশ্রমে মানুষকে খুশি করে শৈলেন। কিন্তু সপ্তাহে সপ্তাহে চা চিনি আর মিল্ক পাউডার আনবার যখন তাগিদ দেয় সুষমা, তখনই শৈলেনের মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। ঔদার্যটা আর থাকতে চায় না।

দু'দিন বাদে পূর্ণবাবু ফের এলেন সকালবেলা। পকেটে করে বাচ্চা দুটির জন্যে কমলা নিয়ে এসেছেন ; বের করে দিলেন তাদের হাতে।

সুষমা আপত্তি করে বলল, 'আবার ওসব কেন এনেছেন আপনি ?'

শৈলেন আজও বেরুবার তাগিদে ব্যস্ত, পূর্ণবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বসুন, চা খান।'

পূর্ণবাবু হেসে বললেন, 'তাতো খাচ্ছি। তুমি সুবিধে টুবিধে কিছু করতে পারলে নাকি ?'

শৈলেন আশ্বাস দিয়ে বলল, 'দেখছি চেষ্টা করে, বলেছি ক'জনকে দেখা যাক কি হয়। চা না খেয়ে যাবেন না যেন।' বলে শৈলেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

সুষমা আজও তাঁকে চা ক'রে দিল। আজ আর সেই দার্জিলিং চা নয়, আজ আর সেই নীল পদ্মের মত বড় কাপ নয়। সাধারণ কাপে আড়াই টাকা দামের ব্রকেন লিভ। নিত্য যে চা শৈলেনরা ব্যবহার করে তাই। সেই সঙ্গে দু'খানা বিস্কিট। সে দু'খানা অবশ্য পূর্ণবাবু খেলেন না। সুষমার দুই ছেলের হাতেই দিলেন। তারপর চা খেতে খেতে বললেন, 'সত্যি তোমার হাতের চা-টুকু কিন্তু বেশ মালক্ষ্মী।'

চায়ের জাত বদলেছে, কিন্তু তাই বলে হাত তো আর বদলায়নি। তবু বুড়ো ভদ্রলোকের এই প্রশংসায় বেশ একটু লজ্জিত হোল সুষমা। শৈলেনের বন্ধুরা সবাই তার হাতের চায়ের সুখ্যাতি করে। কেউ কেউ এমন ভাষায় করে যে, সুষমার গাল এখনো আরক্ত হয়ে উঠে। কিন্তু পূর্ণবাবুর সুখ্যাতি সে ধরণের নয়। তাই বলে তাঁর প্রশস্তি যে একেবারে ব্যঞ্জনাহীন, তাও বলা চলে না। কারণ, সুষমার চায়ের প্রশংসা করবার পরই পূর্ণবাবু বলেন, 'শৈলেনকে একটু ব'লো মা, বুঝিয়ে বলো। কিছু একটা এখন না জুটলে একেবারে মরে যাব। আর পারিনে। এতগুলি মুখ কি দিয়ে যে ভরব, ভেবে কিছুই আর ঠিক করতে পারিনে মা। তুমি ওকে একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলো।'

সুষমা চোখ নামিয়ে বলে, 'বলব। আমি সেদিনও বলেছি। উনি খুব চেষ্টা করছেন।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'তা করবে। শৈলেনের মত ছেলে আজকাল আর হয় না। গরীবের জন্যে সত্যিই ওর প্রাণ কাঁদে। ওযে কি রকমের মানুষ!

তুমি আর ওকে কতদিন দেখছ মা, আমি দেখছি ওকে একেবারে ছেলেবেলা থেকে। ও যখন স্কুলের ছাত্র, তখনই কত লোকের কত উপকার করেছে। পরের জন্যে সত্যিই ওর প্রাণ কাঁদে। আর তা জানি বলেই তো ওর কাছে এসেছি।'

স্বামীর প্রশংসা শুনে স্মিত, লজ্জিত মুখে চুপ করে থাকে সুষমা। পূর্ণবাবু বলে চলেন। দেশ গাঁয়ের আরো কত পরিচিত লোকের কাছেই তো-তিনি যান। কত জনের সঙ্গেই তো দেখা সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু সুষমাদের কাছ থেকে যে সদয় সহৃদয় ব্যবহার তিনি পাচ্ছেন, তা আর কারো কাছ থেকেই পান নি। কেউ বাড়ির ভিতর পর্যন্ত ডেকে আনে না, সদর দরজা থেকেই তাঁকে বিদায় দেয়। কেউ বা বাড়িতে থেকেও বলে বাসায় নেই। ইচ্ছা ক'রেই দেখা করে না। কিন্তু শৈলেন আর সুষমা আলাদা জাতের মানুষ। এযুগে এমন লোক হয় না।

শৈলেনদের প্রশস্তি শেষ ক'রে আবার দুঃখের কথা পাড়েন পূর্ণবাবু। অভাবে অভাবে তিনি একেবারে সারা হয়ে যাচ্ছেন। ঘরে সরলা আর সুশীলার একখানা আস্ত কাপড় নেই। অথচ দুজনেরই তো বয়স হয়েছে। বাপ হয়ে তাদের দিকে আর তাকাতে পারেন না পূর্ণবাবু। ছেলে দুটি বকাটে হয়ে যাচ্ছে। স্কুলে দিতে পারেন নি। খোরাকই জোটে না, তার আবার লেখাপড়া। বস্তীর খারাপ ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গেই দিনরাত থাকে। তাদের সঙ্গেই আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। না খেয়ে খেয়ে, নানারকম অখাদ্য খেয়ে খেয়ে ঘরে স্ত্রীর রোগ আর সারে না। সেও এখন বুড়ো হয়েছে। তার দেহেই বা আর কত সয়।

সুষমা এক সময় বলে, 'আচ্ছা আপনি আসুন। উনি চেষ্টার ত্রুটি করবেন না।'

পূর্ণবাবু একটু আশ্বস্ত হয়ে বিদায় নিয়ে বলেন, 'ও চেষ্টা করলে পারবে। ও তো অনেক দিন ধরে শহরে আছে। কত বড় বড় লোকের সঙ্গে ওর জানাশোনা।'

একদিন সুষমা স্বামীকে বলল, 'ভদ্রলোক তো রোজ এসে ধন্না দিচ্ছেন, কিছু করতে পারলে নাকি ওঁর জন্যে ?'

শৈলেন বলল, 'করা কি অত সহজ? তাছাড়া এই বুড়ো বয়সে ওঁকে কে কাজ দেবে বল ?'

সুষমা জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি করতেন আগে?'

শৈলেন বলল, 'বাবার জুনিয়ার মহুরী ছিলেন। লেখাপড়ার কাজের চেয়ে বাইরের ফাই-ফরমায়েসই খাটতেন বেশী।'

সুষমা বলল, 'সে কাজ ছাড়লেন কেন।'

শৈলেন বলল, 'বাবার সেরেস্তায় মামলা মকদ্দমার পরিমাণ কমে গেল। তিনিও আর রাখতে পারলেন না, ওঁরও পোষাল না।'

সুষমা বলল, 'তারপর কি করলেন?'

শৈলেন বলল, 'অনেক কিছুই করলেন। দালালী, তশীলদারী। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। কয়েক বছর ধরে বাড়ির বাঁশ আর গাছ গাছড়াগুলি বিক্রি করে খাচ্ছিলেন। শুনেছি বাস্তুবাড়িও বন্ধক দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের অছিলায় সব ছেড়ে চলে এসেছেন।'

সুষমা বলল, 'আহা সেখানে থাকবেনই বা কোন্ সাহসে। বড় বড় দুটি মেয়ে। তুমি একটু ভালো করে চেষ্টা কোরো ওঁর জন্যে। চোখের ওপর এসব আর সওয়া যায় না। যে ভাবে বলেন শোনা যায় না কান পেতে। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ।'

শৈলেন বলল, 'চেষ্টা তো করছি, বলেছি কয়েকজন বন্ধুকে। কিন্তু সবাই বলে এমন লোককে কি চাকরি দেওয়া যায়।' সেই তো সমস্যা। উনি বুঝি রোজই আসেন আজকাল।'

সুষমা বলল, 'হ্যাঁ।'

শৈলেন একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'চা টা দিচ্ছ তো?'

সুষমা বলল, 'তা দিচ্ছি।'

স্বামীর ক্ষমতার কথা সুষমার অজানা নেই। ভারি মুখচোরা মানুষ। অন্যের জন্যে কিছু করবে কি। নিজের চাকরির চেষ্টাই নিজে করতে পারেনি। বিয়ের পরও বছর দুই বেকার ছিল। সুষমার বাবা বহু চেষ্টা চরিত্র করে ওকে ঢুকিয়েছেন ওই জেল প্রেসে। তাও তো যে চেয়ারে গিয়ে বসেছিল, সেই চেয়ারেই বসে আছে। প্রমোশন পায়নি, লিফট পায়নি। দুবছর অন্তর পাঁচ টাকা করে মাইনে বৃদ্ধি। ওইটুকু ভরসা। সুষমার বাবা মাঝে মাঝে দুঃখ করেন একেবারে অকেজো, আজকালকার যুগে একেবারে অচল। ওর পরে যারা ঢুকেছে তারা ওপরে উঠে গেল অথচ ও কিছুই করতে পারল না।

চাকরি বাকরির ব্যাপারে স্বামীর এই অযোগ্যতার জন্যে সুষমার মনে কি দুঃখ কম।

কিন্তু সে কথা তো বাইরে কারো কাছে বলা যায় না। এমন কি পূর্ণবাবুর কাছেও না। নিজেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয় জেনেও যেমন আশায় বুক বেঁধে থাকে সুষমা তেমনি পূর্ণবাবুকেও আশ্বাস দেয়। হবে বৈ-কি একদিন নিশ্চয়ই হবে। শৈলেন তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দু একজন বন্ধুবান্ধব তাকে নাকি কথাও দিয়েছে। তাদের অফিসে এখন কিছু খালি নেই। খালি হলেই পূর্ণবাবুকে তারা ডাকবে। একথা সুষমা একাই বানিয়ে বলে না। তার কাছে বানিয়ে বলে শৈলেন। শৈলেনের কাছে বানায় তার বন্ধুরা; আর প্রত্যেকেই মনে মনে জানে এসব বানানো কথা জেনেশুনেও তবু সংসারে কথা না বানালে চলে না। এমন কি সত্য কথার চেয়েও অনেক সময় এধরনের বানানো কথায় বেশি কাজ হয়। অপ্রিয় নিষ্ঠুর সত্য কথার চেয়ে এমন অল্প স্বল্প মিথ্যে বলতেও ভালো লাগে, ও ভালো শোনায়। যে বলে সেও বোঝে, যে শোনে সেও।

তবু পূর্ণবাবু যেন কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না। তিনি আগে যদি বা দু'একদিন বাদে বাদে আসতেন এখন একেবারে রোজ আসা ধরলেন। কোন দিন শৈলেনের সঙ্গে দেখা হয়, বেশির ভাগ দিনই হয় না। ঘর-সংসারের কাজ করতে করতে সুষমাকেই পূর্ণবাবুর সংসারের কথা সব শুনে যেতে হয়।

শুনতে শুনতে মাসখানেকের মধ্যেই কথাগুলি যেন একঘেয়ে হয়ে এল সুষমার কাছে। পূর্ণবাবুদের দুবেলা খাওয়া জুটছে না শুনে এমন কি একবেলা অর্ধাহারে থাকতে হচ্ছে শুনেও সুষমার আর যেন তেমন দুঃখ লাগে না। প্রথম দিন-দুই যেমন ব্যথা লেগেছিল, চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছিল, এখন আর তেমন হয় না। স্পর্শকাতর অনুভূতির সেই তীব্রতা যেন মরে গেছে। আধপেটা খাওয়া পূর্ণবাবুদেরও যেমন সয়ে যাচ্ছে, ওদের জন্যে কিছু করতে না পারাও তেমনি সয়ে যাচ্ছে সুষমাদের। না সয়ে উপায় কি।

তাছাড়া একেবারে কিছু যে না করছে তাও তো নয়। পূর্ণবাবু যখনই আসুন সুষমা এক কাপ করে চা তাঁকে নিয়মিতই দিয়ে যাচ্ছে। তা সে বেলা ন'টাই হোক, আর দশটাই হোক। উনুনে ডালই থাকুক, আর তরকারিই থাকুক,

মন মেজাজ ভালোই থাকুক আর নাই থাকুক, পূর্ণবাবুর জন্যে এক কাপ চা সুষমা বরাদ্দ করেছে। চায়ের সঙ্গে বিস্কিট কি অন্য কিছু আজকাল আর সুষমা দেয় না, হাতলভাঙা কাপেই ন'সিকে আড়াই টাকা পাউণ্ডের চা পরিবেশন করে। তবু করে তো। এইটুকুই বা আজকাল ক'জনে দিতে পারে, ক'জনে দেয়। পূর্ণবাবু নিজের মুখেইতো বলেছেন কেউ দেয় না। চাকরির

...ত্যাশাতেই আসেন।

যতক্ষণ চায়ের কাপটা তাকে না দেওয়া হয়, ততক্ষণ চাতকপাখীর মত বসে থাকেন। ঠিক যে চুপচাপ বসে থাকেন তা নয়, সংসারের দুঃখ-দুর্দশার সেই আধপেটা খেয়ে থাকার, না খেয়ে থাকার একঘেয়ে বর্ণনা দেন, চায়ের কাপটি শেষ করে তারপর ওঠেন। আজকাল সুষমা তাই আর দেরি করে না। কেটলিতে চা ওঁর জন্যে রোজ রেখে দেয়। খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ফের গরম করে। কোন দিন বা তাও করে না।

আজকাল আর মুখে সুষমার চায়ের বেশি প্রশংসা করেন না পূর্ণবাবু। কিন্তু তা না করলেও সুষমা ওঁর মুখ চোখের ভাব দেখে বুঝতে পারে বুড়োকে মৌতাতে ধরেছে। এই চাটুকু ওঁর কাছে অমৃতের তুল্য। এখানকার এই চায়ের কাপটি ছাড়া ওঁর আর চলবে না। সে কথা টের পেয়ে গেছে সুষমা। যত ঠাণ্ডা, যত খারাপ চাই দিক পূর্ণবাবু তাকে একেবারে নিঃশেষ ক'রে ওঠেন। পারেন তো কাপটিকে শুদ্ধু গিলে ফল...

মাঝে মাঝে এখনো পূর্ণবাবুর ওপ... । কিন্তু মাঝে মাঝে আবার বিরক্তিই আসে। ...রাতে চায় না। দুরন্ত ...এসেছে সেটিও সুস্থ থাকতে ...। ...চলে। আর তাই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ...। টিমিটি হয়। তাই এক কাপ চায়ের জন্যে যে সামান্য একটু দাক্ষিণ্যের দরকার তাও যেন মনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুষমা এক একদিন বিরক্ত হয়ে ভাবে বুড়োকে কতকাল আর চা দিতে হবে। মনের এই অপ্রসন্নতা সব সময় যে চিন্তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তা নয়, সুষমার

চোখে পড়ে না। সুষমা বুঝতে পারে পূর্ণবাবু ইচ্ছা করেই চোখে পড়তে দেন না।

মাস তিনেক বাদে এক রবিবার পূর্ণবাবু ধরে বসলেন শৈলেনকে। পরণে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, হাতে বড় একটি থলি। ছুটির দিনের বাজারে বেরুচ্ছে শৈলেন, পূর্ণবাবু এসে পথ আটকে ধরলেন, কাতরভাবে বললেন, 'বাবা, এবার একেবারেই ...

চাকরি বাকরিতে ক...

কর। তিরিশ চল্লিশ ... ছোট ... একটা বেয়ারাতেও পায়, তোমাদের বড় অফিসে আরো বোধ হয় বেশি পাব। তাই ঠিক ক'রে দাও আমাকে।'

শৈলেন জানে বেয়ারাগিরি জোটানোও আজকাল শক্ত। সে-চাকরির জন্যেও অসংখ্য উমেদার। ষোল সতের বছরের মাইনর পাশ একটি ছেলের জন্যে বেয়ারার চাকরির চেষ্টা করেছিল শৈলেন। তিনমাস চেষ্টার পর হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। সেই শ্রীপদর মত চালাক চতুর চটপটে ছোকরারই বেয়ারাগিরি জুটল না। আর এই বুড়ো অকর্মণ্য লোকটিকে চাকরি দেবে কোন্ বে-আক্কেল। এর জন্যে সুপারিশ করতে গিয়ে সে কার কাছে মুখ হারাবে।

সংসারের খরচ বাড়িয়ে ফেলেছে বলে খানিকক্ষণ আগে ঝগড়া হয়ে গেছে সুষমার সঙ্গে। মেজাজটা ভালো নেই, কিন্তু অসহায় বৃদ্ধের করুণ মুখের দিকে চেয়ে ... অসহিষ্ণুতাকে সংযত করল শৈলেন। খুব ভদ্রভাবে পূর্ণবাবু... ...য় আগের মতই বলল, 'ছিঃ কাকা, ওসব কি বলছেন। ...

আমি যোগ্য কাজের চেষ্টাই করা ...

পূর্ণবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কাজের চেষ্টা করছ?'

শৈলেন বলল, 'মুহুরীগিরির। আপনি যে কাজ পারেন, যে কাজ ভালোবাসেন, জীবন ভরে যা করেছেন সেই কাজের চেষ্টাই করছি আপনার জন্যে। আমার এক বন্ধু আছে বিমল গুহ। স্মলকজ্ কোর্টে ভালো প্র্যাকটিস কালীঘাট ...

‘দিয়েছে ?’ খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন পূর্ণবাবু।

শৈলেন বলল, ‘হ্যাঁ, আর দু’চার দিন সবুর করুন। হয়ত ওখানেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।’

শৈলেন ব্যস্ত হয়ে বাজারের পথে পা বাড়াল, বলল, ‘যান একটু চা’টা খেয়ে যান।’

এক[illegible]লেন, ‘সে তো খাবই বাবা, চা তো রোজই আছে ?’

সুষমা [illegible] আধকাপ চা সশব্দে পূর্ণবাবুর সামনে নামিয়ে রেখে রান্নার কাজে গিয়ে বসল।

পূর্ণবাবুর মন আজ বড় খুশি। ‘তোমার শরীর খারাপ নাকি মা ?’

দু’বার জিজ্ঞেস করবার পর সুষমা বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, ‘না।’

পূর্ণবাবু বললেন, ‘তবে বুঝি মন খারাপ ? ঝগড়া করেছ স্বামী-স্ত্রীতে ? ঝগড়ার কথা আর বোলোনা মা। আমাদের তো ঝগড়ায় ঝগড়ায় জীবনটা কাটল। এখনও তাই।’

কিন্তু পূর্ণবাবুর দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে সুষমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, নিজেদের দ্বৈতজীবন নিয়েই সে অস্থির। সুষমা নিঃশব্দে রেশনের চাল থেকে কাঁকর বেছে ফেলতে লাগল।

পূর্ণবাবু বুঝতে পারলেন আজ আর আলাপ জমবে না, চায়ের কাপটি শেষ করে তিনি এবার উঠে পড়লেন।

পরদিন পূর্ণবাবু আর এলেন না। কেটলির তলায় যে আধকাপ চা সুষমা তাঁর জন্যে তুলে রেখেছিল তা ফেলে দিতে হোল। পরদিনও তাঁর জন্যে রাখা চা নষ্ট হ[illegible] তৃতীয়দিনে কেন [illegible] খারাপ লাগতে [illegible] অস্বস্তি লাগল। বুড়ো কি [illegible]াক ? সেদিনকার অনাদরে দুঃখ পেল ? কিন্তু অমন অনাদর তো সুষমা তাকে অনেকদিন ধরেই করছে। নিজের দোষের বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়ে সুষমা স্বামীকে জিজ্ঞেস করল।

‘পূর্ণবাবু, আজ কদিন ধরে আসছেন না। ব্যাপার কি বলতো, বুড়ো মানুষ, অসুখ বিসুখ কর[illegible]

সুষমা বলল, 'একবার খোঁজ নিতে পারলে ভালো হোত।'

নিতে পারলে তো ভালো হোত। কিন্তু নিতে পারে কই শৈলেন। সময়ের অভাবে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরই খোঁজ নিতে পারে না। চাকরি আর টুইশনে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ঠাসা। এক মুহূর্তও তার অন্য কথা ভাববার, অন্যের কথা ভাববার সময় নেই।

সপ্তাহ কাটল
না আসাটাও স
চায়ের নিমন্ত্রণ করার প্রসঙ্গে মাস
যাওয়ায় স্বামীকে সুষমা জিজ্ঞেস করল, 'ভালো কথা পূর্ণবাবুর খবর কি বলতো। ভদ্রলোক মরে টরে গেলেন নাকি?'

শৈলেন বললে, 'না, মরবেন কেন। ট্রাম থেকে একদিন দেখলুম রসা রোড দিয়ে হেঁটে চলেছেন।'

সুষমা বলল, 'তাহলে বোধ হয় চাকরি বাকরি জুটেছে কিছু একটা।'

শৈলেন বলল, 'এক কাপ চায়ের ব্যবস্থাও হয়ত হয়ে গেছে কোথাও।'

সুষমা একটু হেসে বলল, 'তুমি ভারি দুষ্টু। ভেবেছ সবাই বুঝি তোমার মত চা-পাগল?'

শৈলেন বলল, 'দেখ চা তো সবাই খায়, কিন্তু চা-পাগল হ'তে পারে ক'জনে? তুমি তো একেবারেই পার না। বুঝতে পার প্রহরে প্রহরে চায়ের কাপের স্বাদ বদল হয়, দিনে রাতে কতবার ক'রে তার রঙ বদলায়?'

আজ শৈলেনের মেজাজটি ভাল আছে। অফিস ছুটি, ছাত্র পড়াতেও যেতে হয়নি। তাই এই কবিতা। সুষমা মৃদু হেসে সায় দিল। না হ'লে ছন্দ ভঙ্গ হবে [illegible] যান সেদিন
এই চা নিয়েই ঝগড়া করে ছিল দু
ছ'পাউণ্ড চা কি ক'রে লাগে? সুষমা জব
লাগবে। পাতাগুলি আমি চিবিয়ে চিবিয়ে খাই। রাজ্যের লোক ডেকে ডেকে চা খাওয়াও তখন মনে থাকে না?'

চায়ের কাপের রঙ বদলায় বই কি। অফিসের ডিপার্টমেন্টাল ইন্‌চার্জকে যখন কোন কোন [illegible] করে, ভালো শাড়ীখানা পরে

শুধু কাপের দাম, কাপের রঙই বদল হয় না, চা'য়ের স্বাদ, চায়ের রঙেরও বদল হয়। শুধু যে খায়, তার কাছে নয়। যে খাওয়ায়, তার কাছেও। মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়লে পাড়ায় বাড়িওয়ালা যখন নিজে তাগিদ দিতে আসেন আর টাকার বদলে যখন চায়ের কাপ নিয়ে সুষমা হাসিমুখে হাজির হয় তাঁর সামনে কিংবা অধীরবাবুর দুধের বিল বাকি চাইবার সময় তাঁকে চায়ের কাপ এগিয়ে

নক দেরি

..তে হোল

বাবুর হাসি হাসি মুখখানা ভারি গম্ভীর দেখায়। আর সেই কালো মুখের ছায়া পড়ে চায়ের রঙও পলকের মধ্যে বদলে যায়। ঋতুতে ঋতুতে স্বাদবৈচিত্র্য হয় বইকি চায়ের।

মাস দুয়েক পরে হাসপাতালে যেতে হোল সুষমাকে। তার মা এসে কয়েকদিনের জন্যে সংসারের ভার নিলেন। সপ্তাহ খানেক বাদেই মাতৃসদন থেকে ছাড়া পেল সুষমা। ছেলে হয়েছে। তিনটি সন্তানের মধ্যে এই নবজাত-টিই সব চেয়ে সুন্দর। যেমন নাক, চোখ তেমনি রঙ। হাসপাতালের দাই আর দারোয়ানকে যথাসাধ্য দরাজ হাতে বিদায় করল শৈলেন, ট্যাক্সী করল একখানা। হাবুল আর বুবুলও সঙ্গে এসেছে মা আর নতুন ভাইকে নিয়ে যেতে। সবাই মিলে উঠে বসল গাড়িতে। শৈলেন বলল, 'জলদি চালাও।'

জোরে চালাতে গিয়ে হাজরা রোডের মোড়ে ঘটল এক কাণ্ড। এক বুড়ো কুঁজো চানাচুরওয়ালা প্রায় চাপা পড়ে পড়ে আর কি। অতি কষ্টে ব্রেক কষে ড্রাইভার গাল দিয়ে উঠল, 'চোখে দেখতে পাওনা বুড়ো; রাস্তা পার হতে গিয়ে যে ভবপার হতে যাচ্ছিলে।'

বুড়ো চানাচুরওয়ালা এবার চোখ [illegible]। গাড়ির হুড ফেলা ছিল।

পূর্ণবাবু একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ মা, আমিই।'

শৈলেন বলল, 'আসুন, গাড়িতে উঠে আসুন।'

পূর্ণবাবু একটু হাসলেন, 'কি করে উঠে আসি শৈলেন. আমার যে এগুলি বিক্রি করে আসতে

নিশ্চয়ই

আসতে হবে। নতুন নাতিকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি কাকাবাবু। আপনি তাকে আশীর্বাদ করে আসবেন না!'

পূর্ণবাবু বললেন, 'তুমি যখন বলছ মা যাব। কাল সকালে যাব। তবে খুব সকালে পেরে উঠব না। কাজকর্ম আছে। একটু দেরি হবে।'

সুষমা বলল, 'আচ্ছা আপনার যখন সুবিধে হয় আসবেন। কাল কিন্তু আসা চাই-ই

পূর্ণবাবু

তারপর চানাচুর আর চীনে বাদামের টিন কাঁধে পূর্ণবাবু হাজরা ... ভিতরে ঢুকলেন।

পরদিন শৈলেন তাঁর জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর অফিসে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলল, 'পূর্ণবাবু বোধ হয় আর আসবেন না। ভারি লজ্জা পেয়েছেন। তুমিও যেমন। লোককে ওইভাবে লজ্জা দেয়! দেখলে ওই রকম অবস্থা।

সুষমা অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে বসল।

পূর্ণবাবু কিন্তু এলেন। গোটা সাড়ে নয়ের সময় ধীরে ধীরে এসে কড়া নাড়লেন দরজায়।

সুষমা তাঁকে বাড়ির ভিতরে এগিয়ে নিয়ে এল। ঘরে এসে বসবার জন্যে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল 'আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন তাই আসেন নি এতদিন।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'না মা তা নয়। সময় পেয়ে উঠি না। তাছাড়া বেঁচে থাকবার জন্যে কি করতে হচ্ছে তাতো দেখলে?'

সুষমা চুপ করে

পূর্ণবাবু বললেন, 'ব

সুষমা ছেলে এনে সামনে ধরলে ...

একটি রুপার টাকা বের করে দিলেন পকেট থেকে

সুষমা বাধা দিয়ে বলল, 'না না এসব আবার কি, এ আপনার ভ অন্যায়।'

পূ... ...

দেখতে

ছেলেকে দোলনায় শুইয়ে রেখে সুষমা চা' করতে বসল।

বাধা দিয়ে বললেন, 'ওসব কোরোনা মা। আমা— ...আমাকে এবার উঠতে হবে।'

সুষমা তবু নাছোড়বান্দা। ... ই নীল রঙের বড় কাপটি ... চা। যে চা শুধু শৈলেনের ...।। সুজির তৈরি একটু খাবার আগেই ...খেছিল ...টেবলটা পূর্ণবাবুর সামনে টেনে নিল সুষমা। তার ওপর রাখল সেই খাবারের প্লেট আর ধূমায়িত, সুগন্ধি চায়ের কাপ।

কিন্তু পূর্ণবাবু মাথা নাড়লেন, 'না মা, আমাকে মাপ করতে হবে। চা আমি ছেড়ে দিয়েছি। চা আমি কোথাও আর খাইনে।'

সুষমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি, কেন ছাড়লেন। চা আপনি এত ভালোবাসতেন খেতে।'

পূর্ণবাবু একটু হাসলেন, 'না মা আমি চা খেতাম না, তোমাদের চা-ই আমাকে খেত, রোজ চুমুকে চুমুকে শেষ করত। অনেক কষ্টে তার হাত ছাড়িয়েছি, আর না।'

সুষমা বলল, 'আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে কাকাবাবু।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'এসব কথা বলবার আমার ...

আমার মেয়ের মত তোমা... মনে দুঃখ পাবে ... খুলে বললেন। প্রথম প্রথম চাটা ... তাঁর, তারপর লাগতে শুরু করল। অল্প খরচে ...মাত করবার মত এমন ঔষধ আর নেই। বাসায় তাঁদের চায়ের পাট ছিল না ... পয়সা কোথায় যে থাকবে। দুপয়সার মুড়ি এনে ছোট ছেলে দুটি, কাড়াকাড়ি করে খেত। দেখে দেখে অভুক্ত পূর্ণবাবুর মনে হোত ওদের সরিয়ে ... এক থাবা বসান। স্ত্রী আর মেয়েদের ভয়ে পারতেন না ... কিন্তু পেটের ক্ষিদে নিয়ে আর একজনকে খেতে দেখতে কতক্ষণই বা ... যায়। ক্ষিদেয় নাড়ী যখন ছিঁড়ে পড়ে নাড়ীর টান মানুষের কতক্ষণ ... কে, অস্থির হয়ে পূর্ণবাবু বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। দুটি একটি পয়সা ... যখন থাকত তাই দিয়ে বিড়ি খেতেন, লুকিয়ে ... বাঁচতে ... বাঁচিয়ে রাখতে

দুনিয়ায় যেন আর তাঁর কেউ নেই, স্ত্রী পুত্র কন্যা সব

মায়া কিন্তু পয়সাতে

না

পয়সাও কেড়ে বাচ্চাদের

কেড়ে খাচ্ছ লজ্জা করে না

আছে, কথা না শুনলে স্ত্রী ঝাঁটা

দেবে না।

এই সময় খোঁজ পেয়ে গেলেন তিনি শৈলেনের। সে ভবিষ্যতের ভরসা দিল আর নগদ দিল চায়ের কাপ। চা তো নয়, ক্ষুধাহারী অমৃত। এই এক কাপ চায়ের জন্যে তিনি টালীগঞ্জ থেকে হেঁটে আসতে লাগলেন কালীঘাট। এক কাপ চায়ে দুনো গুণ। আসবার সময় আশায় আশায় আসেন আবার যাওয়ার সময় মনকে সান্ত্বনা দিতে দিতে যান। তাঁর আর ক্ষিদে কিসের। তিনি তো চা-ই খেয়েছেন। ক্রমে ক্রমে ভাগ্যে ভাঙা কাপ আর তেতো চা জুটতে লাগল। সবই বুঝতে পারলেন পূর্ণবাবু। কিন্তু কিছুতেই পারলেন না। হোক তেতো তবু তো চা। আর চা যত তেতো হয়, মাৎ হয় বেশী।

পূর্ণবাবু দেখতে পেলেন আট দশ বছরের দুটি ছেলে হাউ হাউ ক... লেন দুদিন ধ'রে তাদের সকালের মুড়ি উঠে গেছে। শুধু তা পড়েনি। বড় মেয়েটি গোপনে গোপনে পাশের বা বাড়ির প্রৌঢ় কর্তা তিনজনের মধ্যে কাজের উপযুক্ত বলে তাকেই নিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তার সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করতে দেখায় গিন্নী সরলাকে বাকি মাইনে না দিয়েই বরখাস্ত করেছেন, সেই থেকে সরলা হাঁড়িমুখ ক'রে বসে আছে, রান্নাঘরে আর হাঁড়ি চড়েনি।

পূর্ণবাবু ছুটতে ছুটতে এলেন শৈলেনের কাছে। আজ আর তাঁর চা চাইনে। আজ চাই শুধু চাকরি। শৈলেন বলল চাকরি তাঁর জুটবে বেয়ারাগিরি নয়, ভদ্রলোকের মুহুরিগিরিই। উকিলবাবুর নাম ধাম জানিয়ে শৈলেন বলল অপেক্ষা করতে। উকিলের কাছে যথোচিত সুপারিশ সে আগেই করেছে। শুধু দু'চার দিন তাঁকে [illegible] করতে হবে। কিন্তু দু'চার দিন [illegible]

দু' চার মিনিটও যে পূর্ণবাবু আর সবুর করতে পারেন না। ভাবলেন: বোধ হয় তাঁর সেই উকিল বন্ধুকে তেমন ক'রে বুঝিয়ে বলতে [illegible] তিনি নিজে বলবেন। তিনি তার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বলবেন, 'আমাকে তোমার সেরেস্তায় আজ থেকেই নিয়ে নাও বাবা।'

বিমল গুহ নাম করা উকিল। কালীঘাট পার্কের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই তার সন্ধান মিলল। দামী স্যুট পরে, চুরুট মুখে বিমল গাড়িতে ক'রে কোর্টে বেরোচ্ছিল, পূর্ণবাবু গিয়ে পথ আটকে ধরলেন, 'বিমলবাবু আমার নাম পূর্ণচন্দ্র দে। আমি এর আগে বিশ বছর মুহুরিগিরি করেছি। আপনার বন্ধু শৈলেন আমার ছেলের মতো। বড় ভালো ছেলে। তার কাছে আমার দুর্দশার কথা বোধ হয় সবই শুনেছেন।'

বিমল গাড়ির ভিতর থেকে বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি আশ্চর্য লোকটা পাগল নাকি।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'না বিমলবাবু, আমি পাগল নই, আমার নাম পূর্ণ। আমি আপনার মুহুরি হতে চাই। শৈলেনের কাছে তো আমার কথা আপনি সবই শুনেছেন। কিন্তু সব বোধ হয় সে বলতে পারেনি। সে সব জানেও না।'

বিমল বলল, 'কি আশ্চর্য, তার সঙ্গে তো মাঝে মাঝে প্রায়ই আমার দেখা হয়। পূর্ণ দে'ই হোক, আর পূর্ণচন্দ্র দে'ই হোক কারো কথা সে আমার কাছে বলেনি।'

পূর্ণবাবু একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'বলেনি!'

বিমল বিরক্ত হয়ে বলল, 'না। কি চান আপনি নিজেই বলুন না। কোর্টের বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'আমি সপরিবারে দু'দিন ধ'রে না খেয়ে আছি। আমি আপনার মুহুরি হ'তে চাই।'

বিমল বলল, 'ভারি দুঃখিত। কিন্তু আমার যে জলজ্যান্ত তিন তিনটে মুহুরি আগেই রয়েছে। শৈলেনের তো আর মাথা খারাপ হয়নি যে এরপর চতুর্থটির জন্যে সুপারিশ করতে যাবে।'

বিমল গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

ক'মাস আগের অতীত কাহিনী শেষ ক'রে পূর্ণবাবু একটু দম নিলেন, তারপর সুষমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'তখন আমি টের পেলাম

এতদিন ধ'রে চা খাইনি, আমি বিষ খেয়েছি, আমি ঘুষ খেয়েছি। মা হয়ে কি সেই বিষ তুমি আমার গলায় ফের ঢেলে দিতে চাও?'

সুষমা এবার কোন জবাব দিল না।

পূর্ণবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চাও ছুঁলেন না, খাবারও না। সুষমা আর তাঁকে দ্বিতীয়বার কোন অনুরোধ করল না, নিঃশব্দে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। যাওয়ার সময় পূর্ণবাবু বললেন, 'কিছু মনে করো না মা। আজ আর আমার কারো ওপর কোন রাগ নেই।'

পূর্ণবাবুকে বিদায় দিয়ে সুষমা ঘরে এসে দেখে ছোট ছেলে দোলনায় ঘুমুচ্ছে। হাবুল আর বুবুল পূর্ণবাবুর সেই আশীর্বাদী টাকাটা নিয়ে দুজনে মিলে লাফালাফি করছে।

হাবুল বলল, টাকাটা কত বড়। তাই না মা!

সুষমা আস্তে আস্তে বলল, 'হাঁ, খুব বড়। হারিও না। দাও আমার কাছে।'

অমনোনীতা

ভিড় দেখে আগের বাসটি ছেড়ে দিয়েছি। দ্বিতীয়টিতে দেখি ভিড় আরো বেশি। ভিতরে বহু যাত্রী দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। একবার ভাবলাম এটাও ছাড়ি। কিন্তু ঘড়ির দিকে চেয়ে মত বদলাতে হোল। বারটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি। রবিবার হলেও বাসায় ফিরতে আরো বেশি দেরি করা সঙ্গত হবে না।

সরকারী বাস ষ্টার্ট দিয়েছিল, ড্রাইভারকে হাতের ইসারায় গতি মন্থর করতে বলে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়লাম। টাক-পড়া একজন প্রৌঢ় সহযাত্রীর সঙ্গে একটু ধাক্কা লাগল, তিনি একটু বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলেন, 'অনেকক্ষণ তো দাঁড়িয়ে ছিলেন মশাই, কিন্তু গাড়ি চলতে শুরু করলে তবে উঠলেন কেন একটু আগে উঠতে কি হয়েছিল আপনার!

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে আমি সামনের দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম। কোথাও বসবার জায়গা নেই। সমস্ত বেঞ্চগুলি যাত্রীতে ঠাসা। বাকি যারা বসতে পারেনি তারা উর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাথার উপরকার রড্ থেকে ঝুলন্ত চামড়ার একটা হাতল আমিও ধরলাম। সামনের লেডিস সীটে একটি মেয়ে একেবারে জানালার ধার ঘেঁষে বসে রয়েছে। বেঞ্চের যতটুকু স্থান দখল করে রয়েছে তার চেয়ে অনধিকৃত স্থান রয়েছে বেশি। দেখলাম জায়গাটুকুর দিকে আরো কয়েকজনের লুব্ধ চোখ বার বার পড়ে ফিরে যাচ্ছে। মনে মনে একটু হাসলাম। পাশের স্থানটুকুই শুধু দর্শনীয় নয়। দেখবার বস্তু আরো আছে। পিছন থেকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে পিঠের ওপর লুয়ে পড়া এলো খোঁপাটি। সাদা ব্লাউজের নিচে ঈষৎ পুষ্ট বাহুমূলের ডৌলটি বেশ চমৎকার। ব্লাউজের হাতায় সবুজ রঙের সূক্ষ্ম দুটি রেখার চারু শিল্প, কানে অধ চন্দ্রাকৃত আধুনিক রুচির ইয়ার-রিং দুটিও বেশ

মানিয়েছে। পরনে চওড়া খয়েরী পেড়ে মিহি সাদা খোলের শান্তিপুরী, গায়ের রঙটা একটু ফর্সা হলে বেশ মানাত। কিন্তু রঙ ফর্সা নয়, এমন কি শ্যাম-বর্ণও নয়, দিব্যি কালো। তবু সমস্ত মিলিয়ে বেশ লাগছিল। রূপের বিচারে রঙ তো সব নয়, রুচিই অনেকখানি।

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ প্রবল এক ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোন রকমে সামলে নিলাম। উল্টো দিক থেকে একখানা বেসরকারী বাস বাঁ থেকে ডাইনে সরে এসে একটু বোধ হয় পথের রীতি লঙ্ঘন করেছিল আমাদের ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক কষে সংঘর্ষ বাঁচিয়েছে। কিন্তু আমি ঠিক মান বাঁচাতে পারলাম না, পুরোবর্তিনীর কাঁধের সঙ্গে বেশ একটু লেগে গেল। মেয়েটি ভ্রূ কুঁচকে এবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, আমিও একটু কাল তাকিয়ে থেকে বললাম, 'সরি। খুব লাগল?'

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে মেয়েটি বলল, 'আপনি? বসুন।'

আমি একটু ইতস্তত করছি দেখে মেয়েটি আবার একটু হাসল, 'সঙ্কোচ করবেন না, আপনি আমাকে চেনেন কিন্তু আপনার বোধহয় মনে নেই।'

আমি বললাম 'আছে।'

মেয়েটি আরো একটু জায়গা করে দিয়ে বলল, 'আসুন।'

এবার আর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করলাম না। পাশে গিয়ে বসলাম মেয়েটির। মেয়েটি আর কেন, চিনে যখন ফেলেছি, আসল নামটাই বলি। ফুল্লরার সঙ্গে এমন ভাবে দেখা হবে কোন দিন ভাবিনি। পিছন থেকে ওকে কেন যেন কুমারী মনে হয়েছিল। পাশে বসে দেখলাম তা নয়, মাথায় আঁচল না থাকলেও সিঁদুর আছে। কপালে আছে সুগোল সুন্দর একটি ফোঁটা। আশ্চর্য, সিঁদুরে ফুল্লরাকে এমন সুন্দর মানাবে সেদিন ভাবতে পারিনি। মানিয়েছে বটে, কিন্তু এ সৌন্দর্যের মধ্যে কোথাও যেন একটু নিষ্ঠুরতা আছে। একজনের সিঁথির সিঁদুরের সঙ্গে কি আর একজনের হৃদয়ের একটি রক্তাক্ত আঁচড়ের তুলনা চলে?

উপমাটুকু মনে আসায় নিজেই ভারি লজ্জিত হলাম। ছিঃ, মনের একি কাঙালপনা? ফুল্লরার সঙ্গে কোন দিন কি আমার হৃদয়ের সম্পর্ক হয়েছে যে তাতে আঁচড় পড়বে? মাত্র একদিনই তো দেখা হয়েছিল ফুল্লরার সঙ্গে। মানে দেখতে যেতে হয়েছিল।

আড় চোখে তাকিয়ে দেখলাম, ফুল্লরা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে ছুটে চলেছে আটের বি স্টেট বাস। আমিও একটু বাইরের দিকে তাকালাম। খোলা জানালা দিয়ে একটি সাদা দ্বিতল বাড়ি চোখে পড়ল। দোর বন্ধ, জানালায় নীল রঙের পর্দা।

মনে হোল ফুল্লরাদের জানালার পর্দার রঙও এমনি নীল ছিল। কিন্তু রঙপুরের সেই বাড়িটির দোর-জানালা আজকের মত এমন বন্ধ ছিল না। বরং রাত এগারটা পর্যন্ত বাড়ির অন্দর সব খুলে আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে ছিলেন রাজেনবাবু। তাঁকে অত রাত অবধি বাইরে বসিয়ে রাখবার দায়িত্ব অবশ্য মোটেই আমার নয়। কি একটা গোলমালে গাড়ি পুরো দুটি ঘন্টা লেট। চলন্ত গাড়িতে উঠে হঠাৎ যদি অচল হয়ে পড়তে হয়, আমার ধারণা কেউ ধৈর্য রাখতে পারে না। চঞ্চল হয়ে ওঠে সকলের মনই। অত রাত্রে অপরিচিত জায়গায় গাড়ি থেকে নেমেছি বলেই যে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল তা নয়, ধৈর্য হারিয়েছিলাম তার অনেক আগে। এ সব দুর্ভোগ ভুগবার কথা দাদার, আমার নয়। মেয়ে দেখতে তাঁরই প্রথমে আসবার কথা। প্রাথমিক নির্বাচনের কাজ তিনি সারবেন। তারপর তাঁর পছন্দ হলে রাজেনবাবু মেয়ে নিয়ে আসবেন কলকাতায় তাঁর আত্মীয়ের বাসায়। সেখানে সবান্ধবে আমি গিয়ে দেখব এবং মনোনয়ন সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত জানাব। এই ছিল গোড়ার দিকে বন্দোবস্ত। কিন্তু অফিস থেকে দাদার ছুটি মঞ্জুর না হওয়ায়, অফিস কামাই করে ছুটতে হয়েছে আমাকে।

বলেছিলাম, 'এবারও তারিখ বদলাও, টেলিগ্রাম করে দাও ছুটি পেলাম না।'

দাদা বললেন, 'তাই কি হয়, এই ছ' মাস ধরে চিঠিতে টেলিগ্রামে কেবল তারিখ পাল্টাচ্ছি। ভদ্রলোকেরা কি মনে করছেন বল্ তো। এত আগ্রহ তাঁদের।'

সত্যিই রাজেনবাবুদের আগ্রহের মাত্রাধিক্যটা আমি নিজেও লক্ষ্য না করে পারিনি। নিজেদের অসুবিধার কথা জানিয়ে যতবার আমরা তারিখ স্থগিত রেখেছি, ততবার তাঁরা জোর তাগিদ দিয়েছেন, 'দয়া করে ছুটি নিন, ছুটি নিয়ে একবার কেউ আসুন আপনারা। আরো দু একটা সম্বন্ধের আলোচনা চলছে। কিন্তু আপনাদের কথা না পেলে আমরা কোন দিকেই এগুতে পারছি না।'

দাদাকে বলেছিলাম, 'বেশ তো ওদের এগুতে দাও না, আমরাই না হয় একটু পিছিয়ে থাকি।'

কিন্তু দাদা তাতে রাজী হন না, 'ছিঃ, সে বড় অভদ্রতা হবে। এতদিন ধরে যখন আলোচনা চলছে, ওঁরাও এত আশা করেছেন, পছন্দ হোক না হোক, একবার গিয়ে দেখে আসা দরকার।'

বললাম, 'বেশ, তুমি তাহলে ভদ্রতা রক্ষা করে এস।'

দাদা বললেন, 'তাই যাব।'

কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি ছুটি পাননি শুনে আমি ধৈর্য রাখতে পারলাম না, বললাম, 'বেশ যা করবার কর, আমি কিছু জানিনে।'

দাদা একটু হেসে বললেন, 'যা করবার তাই কবছি। রাজেনবাবুকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি ধীরঞ্জন আজই রওনা হচ্ছে।'

দাদার সঙ্গে খুব একচোট কথান্তর হোল। আর সেই কড়া কথার প্রায়শ্চিত্ত করতে স্যুটকেশ গুছিয়ে শেষ পর্যন্ত রওনাও হতে হোল আমাকে। সঙ্গে নেওয়ার জন্য দু একজন বন্ধুর খোঁজ করলাম। কিন্তু এত সর্ট নোটিশে কেউ অত দূরে যেতে রাজী হোল না।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু নারান পর্যন্ত হেসে বলল, 'রঙপুরের রঙ তুমিই দেহে মনে মেখে এস ভাই, আমরা এই কলকাতা সহরে বসেই দিব্যি তা দু'চোখ ভরে দেখব।'

স্টেশনে নেমে একবার এদিক ওদিক তাকালাম। যদিও খবর দেওয়া আছে, তবু এত রাত্রে কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের আতিথ্য নেওয়া ঠিক হবে কিনা ইতস্ততঃ করলাম একটু।

সতের আঠের বছরের সুদর্শন একটি ছেলে কেবলই আমার দিকে তাকাচ্ছিল, তাকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'সব চেয়ে ভালো হোটেল কোন্‌টা এখানে?'

ছেলেটি পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি কি কলকাতা থেকে আস্‌ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম কি ধীরঞ্জন মিত্র?'

'কি ক'রে চিন্‌লে?'

ছেলেটি বলল, 'বাঃ, অর্জুনদা আপনার দু'তিন রকমের স্ন্যাপ সট পাঠিয়েছেন। আপনাকে চিন্‌ব না?'

এবার ছেলেটিকেও চিনলাম। অর্জুন আমার স্কুলের সহপাঠী। তারই দূর সম্পর্কের আত্মীয় রাজেনবাবুরা। লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ফটো সে এদের পাঠিয়েছে, অথচ মেয়ের ফটো সে একবারও ত আমাদের দেয় নি। ভারি রাগ হোল। ছেলেটি আবার একটু আত্মপরিচয় দিল, 'আমার নাম জীবন, আমার দিদির সঙ্গেই—'

তারপর একটু হেসে বলল, 'বুঝেছেন !'

বললাম, 'বুঝেছি।'

জীবন বলিল, 'আপনি লোক ভারি খারাপ। আমাদের এখানে এসেছেন, কিন্তু হোটেল খুঁজছিলেন কেন, আমরা কি হোটেলে থাকি ? ভজন, গাড়ি নিয়ে এসো এদিকে। ধীরঞ্জনবাবুকে খুঁজে পেয়েছি।'

ফতুয়া গায়ে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের একটি লোক এগিয়ে এল। তার আত্মপ্রত্যয় দেখে বুঝতে বাকী রইল না, ভজন বাড়ির প্রিয় ও পুরোন চাকর।

ভজন বলল, 'আসুন জামাইবাবু, গাড়ি আমি অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছি। গাড়োয়ান বেটা ঢুলছে বসে বসে।'

লজ্জিত ভঙ্গীতে জীবন ধমক দিয়ে উঠল, 'ধ্যেৎ, এখনি জামাইবাবু কি রে ! কেবল তো দেখতে এলেন—'

ভজন ততক্ষণে অপ্রস্তুত হয়ে নিজেই জিভ কেটেছে, 'কিছু মনে করবেন না বাবু, এবাড়ির অনেক জামাইবাবু কিনা, ডাকতে ডাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে। স্টেশনে প্রায়ই তাঁদের নিতে আসি, তুলে দিয়ে যাই, তাই—।'

জীবনের সঙ্গে গাড়িতে উঠে ভিতরে বসলাম। ভজন সামনের বেঞ্চে বসে বলল, 'তা দু দিন আগে আর পরে। ফুলু দিদিমণিকে দেখে আপনার পছন্দ হবে। আর আপনাকে তো সবাই পছন্দ করেই বসে আছেন। এমন সুন্দর জামাই এবাড়িতে আর আসে নি।'

জীবন আর একবার ধমক দিল, 'ধ্যেৎ।'

গলার স্বরটুকু বেশ মিষ্টি জীবনের। দেখতেও সুন্দর, ফর্সা, রঙ্, নাক চোখও বেশ চোখা। কেন জানি না, মনের অপ্রসন্নতা অনেকখানি এরই মধ্যে দূর হয়ে গেল।

আধো আলো অন্ধকারে মন্থরে চলল গাড়ি। বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তায় পড়লাম। দেখলাম সহরটা বেশ ছড়ানো। কেবল ছড়ানোই নয়,

ছিটানোও। এখানে এক টুকরো, ওখানে এক টুকরো। মাঝখানে ছোট ছোট মাঠ আর আমবাগান।

তারপর দোতলা একটি বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামল। বাড়ির কর্তা ছুটে এসে দাঁড়ালেন—'এই যে, আসুন। কি দুর্ভোগই না হোল। দু' দু বার লোক পাঠিয়েছি স্টেশনে। গাড়ির দেখা নেই, আজকে গাড়ির আশা আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

গাড়ি থেকে নেমে রাজেনবাবুকে হাত তুলে নমস্কার ক'রে সৌজন্য জানিয়ে বললাম, 'খুব কষ্ট দিলাম আপনাদের।'

রাজেনবাবু বললেন, 'কি যে বলেন। যারা নিজেদের বাড়িতে থাকে তাদের কষ্ট, না, দূর থেকে গাড়িতে যাদের ছুটে আসতে হয় তাদের কষ্ট? আর আজকাল যা হাল হয়েছে রেলওয়ের। কেতা দুরস্ত টাইম টেবিলটাই আছে। সময় টময় কিচ্ছু ঠিক নেই।'

আমার অসুবিধা ঘটেছে বলে ভদ্রলোক যেন রেলকর্তৃপক্ষের কাউকে সামনে পেলে ঝগড়া করতে পারেন তাঁর ভাব দেখে এমনি মনে হোল। সম্ভাব্য শ্বশুরের দিকে আমিও একটু চোখ বুলিয়ে নিলাম। সুদর্শন না হলেও সাধারণ দর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মাথায় কাঁচা পাকা চুল, দাড়ি গোঁফ কামানো।

রাজেনবাবুর সঙ্গে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। চেয়ার টেবিলে সাজানো। অনতিপ্রশস্ত একখানা ঘর, দুটো আলমারী ভরা আইনের বই। সোনার জলে লেখা আর, এন, বসু। রঙপুরে অনেক দিনের প্র্যাক্‌টিস রাজেনবাবুর, সে কথা আগেই শুনে এসেছি।

রাজেনবাবু বললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম নিরঞ্জনবাবুই আসবেন। কিন্তু এই বেশ হয়েছে, একালের রীতিনীতিই ভালো। নিজেরা দেখে শুনে পছন্দ করে—। হ্যাঁ, এই ভালো।'

কথার ধরণ দেখে মনে হোল রাজেনবাবু নিজের মনকে বোঝাচ্ছেন, নিজের সেকালের মনকে একালের রীতিনীতি মেনে নিতে বলছেন।

দোরের পাশে ভজন এসে দাঁড়াল, 'বড়বাবু আপনি যেন আবার গল্পে বসবেন না। মা বলছেন অনেক রাত হয়ে গেছে।'

রাজেনবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ঠিক ঠিক সারা দিন গাড়ীতে কেটেছে।

আর যাতায়াতে আজকাল যা হাঙ্গামা, উঠুন আলাপ-টালাপ পরে হবে। ভজন, বাবুকে কুয়োর ধারে নিয়ে যাও, জল গামছা—'

হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসবার পর রাজেনবাবু বললেন 'আর দেরি নয়, ভজন, এবার আমাদের জায়গা করে দিতে বলো।'

জায়গা করাই আছে। ভিতরের দিকের একখানা ঘরের মধ্যে পাশাপাশি দু'খানা আসন পাতা হয়েছে। একজন প্রৌঢ়া বিধবা পরিবেশন করতে এল। রাজেনবাবু ভাতে হাত দিয়ে বললেন, 'আঃ তুমি কেন, তোমার মা আসতে পারলেন না?'

রাঁধুনী বলল, 'মার বোধ হয় লজ্জা করছে।'

রাজেনবাবু বললেন, 'লজ্জা আবার কিসের—, ছেলের বয়স, দুদিন পরে হয়ত—আসতে বল তাকে।'

একটু বাদে ঘিয়ের বাটি হাতে রাজেনবাবুর স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন। চামচ করে ঘি দিতে লাগলেন পাতে। রাজেনবাবুর তুলনায় তাঁর স্ত্রীর বয়স অনেক কম বলে মনে হোল। দেখতেও বেশ সুন্দরী। দেখলাম আহার্যের প্রচুর আয়োজন করা হয়েছে। তিন রকমের ডাল, চার রকমের মাছ। টক মিষ্টি। খেতে খেতে রাজেনবাবু জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'এই আড়-মাছের ঝোলটা বুঝি ফুলুর নিজের?'

রাজেনবাবুর স্ত্রী জবাব দিলেন, 'কই মাছের তরকারিটাও ফুলু করেছে।'

রাজেনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাছ রাঁধ্‌তে ভারি ভালবাসে।'

—কেমন হয়েছে রান্না?'

মৃদু হেসে বললাম 'ভালো।'

খাওয়াটা বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে হোল। কলকাতার মীর্জাপুরের বোর্ডিং হাউসে বহুদিন এমন চর্ব্য-চোষ্যের স্বাদ মেলেনি।

খাওয়ার পরে শোয়ার ব্যবস্থাটিও বেশ পরিপাটি, পাশের আর একখানা ঘরের তক্তপোষে পুরু দুগ্ধ-ফেন বিছানা। বালিশ, পাশ-বালিশ, একটু দূরে উঁচু টিপয়ের উপর ফুলদানীতে কয়েকটি রজনীগন্ধা, ভালো লাগল।

বাটিতে করে পান নিয়ে এল জীবন। আমি বাটি থেকে গোটা দুই লবঙ্গ তুলে নিলাম।

জীবন বলল, 'পান খান না বুঝি? আমি দিদিকে তখনই বলছিলাম।

খুব তো সাজছিস। কিন্তু পান হয়তো উনি খানই না। অর্জুনদা একবার লিখেছিলেন পান নয়, ধূমপানের ভক্ত। এমন চমৎকার 'পান' করেন অর্জুনদা।'

পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের একটি বাক্স বার করল জীবন। তারপর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'দেশলাই আনতে ভুলে গেছি। দিদি দেশলাইটা দাও তো।'

মৃদুকণ্ঠে জবাব এল, 'আমি পারব না ফাজিল কোথাকার, তখন বললাম নিলিনা কেন।'

বললাম, 'দেশলাই আমার আছে জীবন।'

কিন্তু একটু বাদে জানলার ভিতর দিয়ে জীবনের হাতে নতুন একটি দেশলাই এসে পৌঁছল।

সিগারেটটা সবে ধরিয়েছি রাজেনবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন, ঢুকেই আবার তাড়াতাড়ি সরে আড়াল থেকে বললেন 'আচ্ছা, কালই কথাবার্তা হবে।'

ভজনের গলা শোনা গেল, আপনি যান বড়কর্তা, মা বলছেন অনেক রাত হয়ে গেছে।'

রাজেনবাবু এবার বিরক্তির স্বরে বললেন, 'আঃ যাচ্ছিই তো, রাত হয়েছে সে কথা বার বার তোর মার বলতে হবে কেন, নিজে দেখতে পাচ্ছি না?'

রাজেনবাবু চলে গেলেন। মনে মনে একটু অপ্রতিভ হলাম। সিগা-রেটটা একটু পরে ধরালেও হোত। জীবন চলে গেলে কি ভেবে একটা পানও তুলে নিলাম। সেই সঙ্গে ভাবলাম পানটা জীবন থাকতে খেলেই যেন আরো ভালো হোত।

কাঁচের গ্লাসে জল ছিল। মুখ-টুক ধুয়ে শুতে যাচ্ছি বালিশের ঢাকনির দিকে চোখ গেল। চারদিক নীল রঙের লতানো বর্ডার। মাঝখানটা সাদা সাদা। কিন্তু নীল রঙটুকু আমার চোখে যেন লেগে রইল। ঢাকনিতে কারো নাম ছিল না। কিন্তু হাতের কাজটুকু যে কার, তা আমার বুঝতে বাকী রইল না। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু পাশের বড় ঘরটির আলো তখনো নেভেনি।

ভাই-বোনের কথাবার্তা কানে গেল।

'দিদি এবার শো গিয়ে, তোকে আর কিছু দেখতে হবে না। আদর আপ্যায়নের কোন ক্রুটী হয়নি।'

'তুই বড্ড ফাজিল হয়েছিস জীবন।'

ঘুমাবার আগে একবার মনে হোল দাদার যে ছুটি মেলেনি সেটা ভালই হয়েছে।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। হাত মুখ ধুয়ে আসবার পরে প্রথমে চা বিস্কুট তারপর লুচি হালুয়ার প্রাতরাশটাও বেশ ভালোই জমল, সকালে কাগজ পাওয়ার জো নেই। আগের দিনেব কাগজটা দেখছি, দুখানা পোস্ট কার্ড হাতে নিয়ে জীবন এসে দাড়ায়, 'আচ্ছা ধীরঞ্জনবাবু, দেখুন দেখি এই চিঠি দু'খানা।'

দেখলাম রাজেনবাবুর নামে মাস খানেক আগের লেখা দু'খানা চিঠি। জরুরী কারণে দেখতে আসবার নির্দিষ্ট তারিখ পাল্টাতে হয়েছে বলে আমরা দুঃখ জানিয়েছি। দুখানা চিঠিই দাদার জবানী। কিন্তু দুখানা হাতের লেখা বিভিন্ন।

জীবন চিঠি দুটি আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা ধীরঞ্জনবাবু, এই চিঠি দু'খানার মধ্যে কোন্‌খানা আপনার দাদার ?'

হেসে বললাম, 'তুমিই বল।'

জীবন বলল, 'আমরা নিজেদের ভিতরে আগেই বলেছি। পাঁচ টাকা বাজী রেখেছি দিদির সঙ্গে। বলুন কোন্ চিঠিখানা আপনার হাতের।'

বললাম, 'কোন্‌খানা আমার হাতের হলে তোমার সুবিধা হয়।'

জীবন অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, 'না না আপনি আগে বলুন।'

নিজের লেখা চিঠিটা এগিয়ে দিলাম।

জীবন বলল 'না, দিদিরই জিত হোল। পাঁচটা টাকা মার কাছ থেকে চেয়ে দিতে হবে আমাকে। আচ্ছা এখন দিচ্ছি, এ টাকা পরে আমি ঠিক জায়গা থেকে আদায় করে নেব।' জীবন একটু হাসল।

আমিও হাসলাম, তারপর জীবনকে বললাম, 'এবার তোমার বাবাকে খবর দাও, আমি ন'টার গাড়াতেই যাব ভাবছি।'

জীবন বলল, 'আপনি ভাবলেই হোল আর কি।'

একটু বাদে পঞ্জিকা হাতে রাজেনবাবু এসে হাজির হলেন, বললেন,

'চশমাটা আবার ফেলে এলাম। ইয়ে দেখ তো; আজকের তিথিটা অবশ্য অমাবস্যা, কিন্তু আটটা দশ মিনিট তের সেকেণ্ড গতে ঠিক মাহেন্দ্রক্ষণ আরম্ভ কিনা। রাত্রেই অবশ্য আমি একবার দেখে রেখেছি তবু, তোমাদের নতুন চোখ—।' একটু থেমে অপ্রতিভ ভঙ্গীতে বললেন, 'এই দেখুন আবার 'তুমি' বলে ফেললাম, বুড়ো হওয়ার এই হোল বিপদ। সব সময় ভদ্রতা রাখা যায় না। বললাম, 'তাতে কি হয়েছে। কিন্তু এর জন্য দিনক্ষণ আবার বাছতে যাচ্ছেন কেন।'

রাজেনবাবু মৃদু একটু হাসলেন, 'দিনক্ষণ না মানলে চলে।'

অগত্যা তাঁর হাত থেকে পঞ্জিকাটা নিয়ে চিহ্নিত পাতাটায় একটু চোখ বুলিয়ে বললাম, 'আপনি ঠিকই দেখেছেন। মাহেন্দ্রক্ষণ আটটা দশ মিনিট তের সেকেণ্ড থেকেই সুরু। কিন্তু আমি যে ভেবেছি ন'টার গাড়ীতে—' রাজেনবাবু একটু হাসলেন, 'অত তাড়াতাড়ি করলে কি আর চলে।'

সুতরাং মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হোল। তারপর যে ঘরটায় রাত্রে আমার শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানেই ছোট্ট একটু টেবিল পেতে মুখোমুখি দু'দিকে দু'খানা চেয়ার এনে রাখল ভজন।

জীবন আমাকে সেই ঘরে নিয়ে মুচকি হেসে বলল 'এবার দিদিকে দেখবার পালা আপনার। বাবা মা বলছেন, ছেলের পক্ষের কোন অভিভাবক যখন আসেন নি, ছেলে নিজেই দেখতে এসেছে, তখন মেয়ের পক্ষেরও অভিভাবক গোছের কারো না থাকাটাই ভালো। আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো?'

বললাম, 'না।'

মনে মনে একটু খুসিই হলাম। রাজেনবাবুর পঞ্জিকা সবখানিই তা হলে একেবারে পুরাতন পঞ্জিকা নয়।

একটু বাদে বছর উনিশেকের একটি মেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গীতে নতমুখে সামনে এসে দাঁড়াল। সদ্য স্নান ক'রে এসেছে। ভিজে চুল পিঠ ভরে ছড়ানো। ফিকে চাঁপা রঙের একটি শাড়ী পরনে। কিন্তু প্রথমেই যেন একটা ধাক্কা খেলাম, 'এত কালো?' এত কালো রঙের সঙ্গে কি কোন রঙ মানায়? মনে হোল চাঁপা রঙের শাড়িটিও ঠিক মানায় নি। মেয়েটি রঙিন শাড়ি কেন পরতে গেল মিছামিছি?

বললাম, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।'

মেয়েটি আমার সামনের চেয়ারে বসল। জীবন কি একটা অজুহাতে সরে গেল। মাঝখানে ছোট একটু টেবিলের ব্যবধানে নির্জন ঘরে মুখোমুখি বসে একটি অপরিচিতা মেয়ে আর আমি। কিন্তু আশ্চর্য কিছুমাত্র রোমাঞ্চ বোধ করলাম না। একটি মেয়ের সঙ্গে এতো কেবল মাহেন্দ্রক্ষণের ক্ষণিক আলাপ নয়—চিরজীবনের জন্য সঙ্গিনী নির্বাচন। দেখে শুনে যাচাই বাছাই ক'রে নিতে হবে। শুধু ভাবপ্রবণ হলে চলবে না। আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা নই, পরীক্ষক পরীক্ষার্থিনী। রঙের পরীক্ষায় প্রথমেই মেয়েটি ফেল করল। পাশের নম্বর না দিতে পেরে আমিই কি কম আঘাত পেয়েছি? আরও একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। নাক চোখের গড়ন নিতান্তই চলনসই ধরণের তাতে রঙের ক্ষতিপূরণ হয় না। ঠোঁট দুটিকেও তেমন পাতলা বলা চলে না। একটু কাল চুপ করে ছিলাম। কিছু একটা বলা উচিত। কিন্তু কি বলব যেন ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মেয়েটি মৃদুস্বরে বলল, 'আমি কি এবার যাব?'

আমি একটু নড়ে চড়ে বসলাম। বড় অভদ্রতা হচ্ছে। মেয়েটি কি ভাবছে মনে মনে। মনে যাই থাক ওকে তা বুঝতে দেওয়ার মত নিষ্ঠুর কিছুতেই হওয়া চলবে না। আমাদের মতামত একদিন ও জানবেই, কিন্তু আজ এই মুহূর্তেই যদি না জানে তাতে ক্ষতি কি। এ মুহূর্তটি না হয় মাহেন্দ্রমুহূর্ত হয়েই থাক।

মেয়েটির কথার জবাবে আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'বাঃ যাবেন কেন, আলাপ টালাপ কিছু হোল না, এক্ষুনি যাবেন?'

মেয়েটি সরল প্রশান্ত দুটি চোখ আমার দিকে একবার মেলে ধরে, আবার নামিয়ে নিল তারপর অবনত মুখে মৃদুস্বরে বলল, 'আমি ভাবলাম আপনার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই।'

একবার যেন মায়া হোল, মনে হোল, আর কেন ছেড়ে দিই এই নিরীহ আশ্রমমৃগীকে। কথার মায়াজালে ওকে মিছামিছি জড়িয়ে আমার লাভ কি, কি দরকার এই নিষ্ঠুর খেলায়। কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না। ভাগ্য কি আমার সঙ্গেই কম খেলা খেলেছে? কি দরকার ছিল এর জন্য আমাকে এত দূরে এই রঙপুর পর্যন্ত টেনে এনে সমস্ত রাত ভরে সকাল ভয়ে বিচিত্র বর্ণের পটভূমি তৈরী করে শেষে তার ওপর আকস্মিক এই কালো তুলি বুলিয়ে দেওয়া? আমি কেন তার শোধ নেব না?

একটু হেসে বললাম, 'আমার ধারণা ছিল আপনি সত্যিই গুণতে জানেন। হাতের লেখা সম্বন্ধে যখন আপনার এমন নির্ভুল আন্দাজ তেমনি স্পষ্ট জিজ্ঞেস না করলেও কার কি জানবার ইচ্ছে তা আপনি বেশ অনুমান করতে পারবেন।'

মেয়েটি মৃদু হাসল তারপর বলল, 'তা কি করে পারব? সব জিনিষই কি আর আন্দাজ করা যায়?'

বললাম, 'মাঝে মাঝে আন্দাজ করে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? এই ধরুন আপনার নাম। জিজ্ঞেস করাটা অভদ্রতা অথচ বিলাতী কায়দা অনুযায়ী মাঝখান থেকে কেউ আমাদের আলাপ পরিচয়ও করিয়ে দিয়ে যান নি। বাড়ীর কাউকে ফুলু ফুলু ডাকতে শুনেছি। আন্দাজ করেছি আপনার নাম হয় ফুলমালা না হয় ফুলদেবী।'

মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকিয়েই হাসল, 'আপনার আন্দাজ কোনটাই ঠিক নয়, আমার নাম ফুল্লরা—ফুল্লরা বসু।'

আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হোল। আসলে নাম জানবার স্পৃহাটা আবার তেমন প্রবল ছিলো না, ওকে হাসিয়ে দাঁতের গঠন বিন্যাসটা কৌশলে দেখে নেওয়ারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু না হাসালেও পারতাম। ফুল্লরার সামনের দুটি দাঁত অসমান আর বেশ একটু ফাঁক ফাঁক।

কিন্তু সুরু যখন করেছি মাঝখানে থেমে গিয়ে লাভ কি। শেষ পর্যন্ত যাওয়া যাক। বললাম, 'আন্দাজে আমার তুলনায় আপনি অনেক ওস্তাদ। আচ্ছা আন্দাজ করুন তো এবার জিজ্ঞেস কি করব আপনাকে।'

ফুল্লরা বলল, 'তা কি করে বলব। কারো সব জিজ্ঞাসার জবাবই তো দিয়ে ওঠা যায় না। এরপর যদি কে কি জিজ্ঞেস করবেন না করবেন, তাও বলে দিতে হয়—'

ফুল্লরার জবাবে এবার আমি খুসি হলাম। এতক্ষণে ও পাশ মার্ক পেয়েছে।

বললাম, 'আমি ভেবেছিলাম এসব ব্যাপারে জবাবের মত প্রশ্নগুলিও আপনার সব জানা। অন্ততঃ আরো কয়েকবার তো শুনেছেন। এই ধরুন এখন আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত আপনি কোন্ পর্যন্ত পড়াশুনো করেছেন। আধুনিক গান ভালোবাসেন না ক্লাসিক, মাংসের কাবাবে কি কি মসলা লাগে—'

ফুল্লরা বলল, 'সব প্রশ্নের জবাব এক সঙ্গে কি করে দেব।'

বললাম, 'বেশ আলাদা আলাদা করে দিন। খবরদার গুলিয়ে ফেলবেন না যেন। এক নম্বর, দু নম্বর, তিন নম্বর, পৃথক পৃথক করে— ।'

ফুল্লরা একটু হাসল, 'আচ্ছা তাই বলব। গত বছর ম্যাট্রিক পাশ করেছি।'

'কোন্ ডিভিশনে।'

'ডিভিশন তত ভালো হয়নি।'

বললাম, 'তা নাইবা হোল, শ্রেণী বিভাগে ইউনিভার্সিটিকে সেরা ওস্তাদ মনে করবার কোন কারণ নেই। এবার গান।'

ফুল্লরা বলল, 'গান আমি জানিনে।'

বললাম, 'আপনি নিশ্চয়ই বিনয় করছেন। যিনি যত গান জানেন, তিনি তত বেশী বিনয় করতে জানেন। এই নিয়ম।'

ফুল্লরা বলল, 'গান আমি সত্যিই জানিনে।'

বললাম, 'আচ্ছা আপনি কতখানি মিথ্যা কথা বলছেন তা জানবার সুযোগ আশা করি পরে পাওয়া যাবে। মাংসের কাবাব সম্বন্ধে তৃতীয় প্রশ্নটা আমি উইথড্র করে নিচ্ছি। তার বদলে বলুন তো ন'টার পরে আর কখন গাড়ি আছে কলকাতার। এ গাড়ি তো ধরা গেল না'।

ফুল্লরা বলল, 'এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। গাড়ি আরো আছে।'

'কখন?'

'রাত আটটায়।'

'কি সর্বনাশ। সারা দিনে আর গাড়ি নেই।'

ফুল্লরা বলল, 'সারাদিন আর কই। দিনের তো অনেকখানিই কেটে গেল।'

ফুল্লরার কথার ভঙ্গীতে মনে হোল দিনের এতখানি যেন না কেটে গেলেই ভালো হোত।

বললাম, 'তা হলে আজকের দিনটাও আপনাদের জ্বালাতন করতে হবে।'

ফুল্লরা এবার কোন জবাব দিল না।

বললাম, 'আচ্ছা এবার তাহলে ওঠা যাক। ইতি ইন্টারভিউর প্রথম পর্ব। কিন্তু এই বলে মনে করবেন না এই সুরু। গাড়ি যখন ধরতে

দিলেন না, সারা দিন ধরে রাখলেন, তখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাকব আর এমনি একেক পসলা প্রশ্নবৃষ্টি করব।'

ফুল্লরা কোন জবাব না দিয়ে শুধু একটু হাসল।

ফুল্লরা উঠে পাশের ঘরে ঢুকল। সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে করতে কানে গেল মৃদু গঞ্জনা দিচ্ছেন মেয়েকে ফুল্লরার মা।

'গান একেবারে জানিস্‌নে কেন বলতে গেলি। একটু একটু তো জানিস তাই না হয় বলতি।'

ফুল্লরা কি জবাব দিল শুনতে পেলাম না। হয়ত কিছুই জবাব দেয়নি।

তারপর সারাদিনের মধ্যে অনেকবার দেখা হোল ফুল্লরার সঙ্গে। রাজেনবাবু আর তাঁর স্ত্রীকেও বেশ প্রফুল্ল দেখলাম। খেয়ে দেয়ে কোর্টে বেরিয়ে গেলেন রাজেনবাবু। বাড়ীর সবাইকে বলে গেলেন, আমার যেন আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি না হয়। খানিক বাদে ফুল্লরার আড়ষ্টতা অনেকখানি কেটে গেছে দেখলাম। মনে হোল আগের চেয়ে অনেক সহজভাবে সে চলাফেরা করছে, কথাবার্তা বলছে। ছদ্ম কলহে মেতেছে জীবনের সঙ্গে। আমার মনটা থেকে থেকে কেমন করে উঠতে লাগল। অনেকবার মনে হোল ছুটে গিয়ে ন'টার গাড়ি তখন যদি ধরতাম সেই ভালো হোত। চান করে এসে দেখি ফুল্লরাই সকলের অলক্ষ্যে আয়না চিরুণী টিপয়টার ওপর রেখে দিয়ে গেল। আমি আর জীবন পাশাপাশি খেতে বসলে ফুল্লরাকে দিয়েই সমস্ত পরিবেশন করালেন তাঁর মা। দেখলাম এবেলা মাংসের কাবাবের ব্যবস্থা হয়েছে।

সারা দিনটা আমাকে স্থির থাকতে দিল না জীবন। বলল, 'কনে দেখা তো হয়েই গেছে, চলুন এবার সহর দেখে আসবেন।'

বললাম, 'তোমাদের সহরের আবার দেখবার আছে নাকি কিছু।'

জীবন বলল, 'নেই মানে? দেবী চৌধুরাণীর রঙপুরের কথা ভুলে গেলেন নাকি?'

ঘুরে ঘুরে দিনটা কোন রকমে কাটল। তারপর এক সময় সত্যিই রাত্রের গাড়ির সময় এল।

রাজেনবাবু বললেন 'আজকের রাতটা থেকে গেলে হয় না?'

বললাম, 'তা কি করে হয়।'

রাজেনবাবু বললেন, নিরঞ্জনবাবু এলে অন্যান্য কথাবার্তাও এই সঙ্গে হয়ে যেত।'

বললাম, 'সে তো এক রকম হয়েই আছে। তার জন্য আটকাবে না।'

ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়িতে জীবনকে নিয়ে রাজেনবাবু স্টেশনে নিজেই তুলে দিতে এলেন। ভজনকে দিয়ে ইন্টার ক্লাশের একখানা টিকেটও কাটালেন তিনিই। কিছুতেই নিষেধ শুনলেন না।

বললেন, 'নিরঞ্জনবাবুর চিঠি কবে পাব ?'

বললাম, 'চিঠি পেতে দেরি হবে না।'

কলকাতা পৌঁছে দাদাকে দিয়ে তার পরদিনই চিঠি দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। মিনিট খানেক মনটা অবশ্য একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রইল। কিন্তু দৌর্বল্যকে আর বেশি প্রশ্রয় দিলাম না।

দাদা সব শুনে বললেন, 'এখনও ভেবে দেখ ভালো করে। সংসারে রূপটাই তো সব নয়।'

হেসে বললাম, 'দাদা, কথাটা ঠাকুরদাদাদের মুখে মানায়, তোমার মুখে শোভা পায় না। রূপ তো কেবল রূপই নয়। মেয়েদের রূপও দুর্লভতম গুণ।'

দাদা আর কিছু বললেন না। রাজেনবাবুকে খুব ভদ্র ভাষায় অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে আমাদের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দিলেন।

তারপর চার বছর কেটেছে। বিয়েও করতে হয়েছে। ভার্যা ফুল্লরার তুলনায় মনোরমা হলেও মনোবৃত্তানুসারিণী যে হয়েছে, একথা বলতে পারিনে।

আর একবার তাকিয়ে দেখলাম ফুল্লরার দিকে। জানলা দিয়ে কি এত দেখছে ফুল্লরা ? দুপাশের বাড়িঘর, না চার বছর আগের সেই স্মৃতিচিত্র ?

একটু দূরে দুজন সহযাত্রীর কথাবার্তা কানে এল। 'কি ভিড় দেখছ। কিন্তু—'

'রবিবার যদি ট্রামে বাসে উঠতেই হয় স্ত্রীকে সঙ্গে আনা ভাল। বসবার জায়গার অভাব হয় না।'

সহাস্য সমর্থন শোনা গেল, 'যা বলেছ।'

ফুল্লরা এবার মুখ ফিরিয়ে এদিকে একটু তাকাল। মুখের রঙটা

বদলালো কিনা ঠিক যেন বুঝতে পারলাম না। কালো রঙের পরিবর্তন বোঝা অত সহজ নয়।

বাস সমস্ত লোয়ার সার্কুলার রোডটা পার হয়ে বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে এসে থামল। ফুল্লরা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার আমাকে নামতে হবে।'

একবার ভাবলাম বলি, 'আমাকেও।'

কিন্তু তা আর বললাম না, ওকে নিঃশব্দে পথ ছেড়ে দিলাম।

ফুল্লরা মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে স্মিতমুখে জোড়হাত ছুঁইয়ে বলল, 'আচ্ছা, যাই এবার। ভালো আছেন তো?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, 'আপনি?'

ফুল্লরাও জবাব না দিয়ে মৃদু একটু হাসল, তারপর এগিয়ে গেল দোরের দিকে।

ফুল্লরা কি সত্যিই সুখী হয়েছে? সে দিনের সেই নিষ্ঠুর ছলনার কোন রকম প্রতিশোধ না নিয়ে ফুল্লরা যে পূর্ব পরিচয় স্বীকার করল, তার পাশে বসবার আমন্ত্রণ জানাল এ দাক্ষিণ্য কি তার সেই অপরিমিত সুখ-সমৃদ্ধিরই প্রকাশ? না কি বর্তমান বিড়ম্বিত জীবনের পটভূমিকায় আমার মতই সেই ছদ্ম মাধুর্যের রঙটুকু ফুল্লরা আজও ধরে রাখতে চায়, আজও মনে রাখতে চায় সেই কাঁচা রঙ লাগানো মাহেন্দ্রমুহূর্তটিকে?

কথাটা কোনদিনই কি আর ফুল্লরাকে জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হবে?

অভিনেত্রী

চিৎপুর অঞ্চলে মালতী মল্লিকের সঙ্গে কনট্রাক্ট করতে এসেছিল পরিচালক অনিমেষ চৌধুরী। বহুকাল সহকারী থেকে থেকে এবার সে নিজেই একখানা ছবি ডাইরেক্ট করবার ভার পেয়েছে। কিন্তু প্রযোজক বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের মত ব্যয়কুণ্ঠ লোক বোধ হয় দুনিয়ায় দুটি নেই। আশি পঁচাশি হাজার টাকার মধ্যে খুব ভালো বই তুলে দিতে হবে এই সর্তে অনিমেষকে তিনি কাজ দিয়েছেন। টাকার অঙ্কটা শেষ পর্যন্ত লাখে গিয়ে পৌঁছবে তা অবশ্য অনিমেষ জানে। তবু গোড়া থেকেই বেশ একটু সতর্ক হয়ে অনিমেষকে কাজ করতে হচ্ছিল। তার জন্য ছুটোছুটি, পরিশ্রমও করছিল প্রচুর; যেখানে অন্য লোক পাঠালে চলে সেখানেও অনিমেষ নিজে না গিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিল না।

অভিনয়ে অবশ্য মালতীর তেমন খ্যাতি নেই। যা হোক করে কাজ মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তার জন্য নির্বাচিত ভূমিকাটিও বইয়ের মধ্যে অপ্রধান। বেকার স্বামীর স্ত্রী, রুগ্ন সন্তানের মা, পরিবারের ছোট বউয়ের ছোট অংশ। সব দিয়ে দু'তিন দিনের স্যুটিং। এর জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেত্রীরাও অনেক টাকা দাবী করবেন। তাঁদের তুলনায় মালতীকে খুব অল্পেই পাওয়া যাবে। বন্ধুরা তাই বলেছিল। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে সন্ধ্যার পর মালতীকে পাওয়াই গেল না। ঝি ক্ষান্তমণি হেসে বলল, 'দিদিমণি বাবুর সঙ্গে গাড়িতে বেরিয়েছেন, কখন ফিরবেন, কিছু ঠিক নেই। এলে কি বলব বলে দিন।'

স্টুডিওর নাম আর দেখা করবার সময় এক টুকরো কাগজ লিখে দিয়ে অনিমেষ বিরক্তমুখে বেরিয়ে এল। মনে মনে ভাবল সন্ধ্যাটাই মাটি হয়ে গেল একেবারে।

জয়মিত্র স্ট্রীটে একজন পুরোন বন্ধু আছে বিনয় চক্রবর্তী। গেলে তার স্ত্রী লাবণ্য চা-টা দেয়, আদর-যত্ন করে। বিনিময়ে অনিমেষও দু'একখানা

সিনেমার পাশ সংগ্রহ করে দেয় তাদের। বহুদিন ওদের কোন খোঁজ-খবর নেওয়া হয়নি। অনিমেষ ভাবল একবার ঢু'মেরে যায় বন্ধুর বাসায়।

গলির ভিতরে তস্য গলি। পুরোন বাড়ির একতলা ঘর। খুব কষ্টেই আছে বিনয়। ভালো চাকরি-বাকরি কিছু পায়নি। তবু মাঝে মাঝে এই দরিদ্র বন্ধুটির বাসায় এসে খানিকক্ষণ কাটিয়ে যেতে খুবই ভালো লাগে অনিমেষের। বেশ একটা সরল আন্তরিকতার স্বাদ পাওয়া যায় এখানে এলে। এক কাপ চা, একটু রুটি তরকারি, মাসের প্রথমদিকে হলে কোন দিন বা একটু সুজি ছাড়া লাবণ্য তার সামনে আর কিছু ধরে দিতে পারে না। কিন্তু গেলে এমন আদর-যত্ন করে, এত আনন্দ পায় যেন পরম অপ্রত্যাশিত কোন মহামান্য অতিথি তাদের ঘরে এসেছে।

ভিতরে কি যেন কথা কাটাকাটি চলছিল, বার-তুই কড়া নাড়তে তা থেমে গেল। বিনয় এসে দোর খুলে বলল 'কে'।

তারপর অনিমেষকে দেখে বলল, 'এসো।' কিন্তু আমন্ত্রণের মধ্যে যেন তেমন উত্তাপ নেই—বড় শুকনো গলা, বড়ই যেন বিরস বিনয়ের মুখ।

লাবণ্যের মুখও ভার ভার। ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো। বিনয়ের জামাটা মেঝেয় লুটাচ্ছে। তু'পাটি জুতো ঘরের তুই প্রান্তে। তার একপাটি কোলের উপর তুলে নিয়েছে বিনয়ের কালো মাথা নেড়া রোগা বছর তিনেকের ছেলেটি। মেঝের ওপর ছোট ছোট আরো গোটা তুই কাগজের মোড়ক। একটা ফেটে গিয়ে মেঝেয় খানিকটা মসুরীর ডাল ছড়িয়ে পড়েছে।

অনিমেষের বুঝতে বাকি রইল না, বেশ একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেছে খানিকক্ষণ আগে।

লাবণ্য একবার অনিমেষের দিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে দ্রুতহাতে ঘর গুছাতে সুরু করল।

অনিমেষ বলল, 'এসে বুঝি রসভঙ্গ করে ফেললাম। দাম্পত্য কলহটা খুবই জমে উঠেছিল দেখা যাচ্ছে। ঝগড়া করাটা তোমার কি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে বিনয়?'

তক্তপোষে বন্ধুকে বসতে দিয়ে বিনয় পকেট হাতড়ে একটা পাসিংশো বার করে তার হাতে দিতে গেল।

অনিমেষ বলল, 'সিগারেট আমার কাছে আছে' বলে নিজেই গোল্ডফ্লেকের প্যাকেটটা খুলে ধরল।

বিনয় সিগারেট ধরিয়ে দু-একটা টান দিয়ে বলতে লাগল, 'রোজ রোজ এই অশান্তি এই ঝগড়া-ঝাটি আমারই কি ভালো লাগে ভাই। কিন্তু যাকে নিয়ে ঘর-সংসার, সে যদি এমন অবুঝ হয় তো পারি কি করে। আচ্ছা ছেলে কি কারো হয় না? না কি, ছেলেপুলে থাকলে তার কোন রোগ-ব্যাধি হতে নেই? কিন্তু তার ওষুধ-পথ্য নিয়ে কার বউ এমন ঝগড়া করে শুনি? যার যেটুকু সাধ্য, সে সেইটুকুই করতে পারে। তার বেশি চাপ দিলে'—

লাবণ্য ফোঁস করে উঠল, 'কে কাকে চাপ দিতে গেছে ঠাকুরপো, ছেলেটা টাইফয়েডে এবার তো শেষই হয়ে গিয়েছিল, যে দেখেছে সেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, কেউ ভাবেনি ওকে ফের তুলতে পারব।'

ছেলেকে হাত ধরে হঠাৎ একটা হ্যাচকা টানে নিয়ে এসে অনিমেষের সামনে দাড় করিয়ে দিয়ে লাবণ্য বলল, 'দেখন তো কি হাল হয়েছে, বলুন তো মানুষের কোন ছিরি আছে চেহারায়? একটা পা এখনো টেনে টেনে হাঁটে। কাল নিয়ে গিয়েছিলাম ডাক্তারের কাছে। বললেন ভালো করে খাওয়াতে টাওয়াতে না পারলে সারবে না। সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো হলে পায়ের দোষটুকু আপনিই সেরে যাবে। তাই বলছিলাম এক কৌটো ওভালটিনের কথা। তাতে যে কোন মানুষ এমন রাগ করতে পারে, এমন মুখ খারাপ করতে পারে—।'

বলতে বলতে থেমে গেল লাবণ্য। পায়ে আচমকা টান লাগায় ছেলেটি বোধ হয় ব্যথা পেয়েছিল। সে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদবার উপক্রম করতেই লাবণ্য তাকে কোলে তুলে নিয়ে সস্নেহে মধুরস্বরে বলল, 'ছি ছি ছি, কাকাবাবুর সামনে বুঝি কাঁদে? কাকাবাবু কি বলবেন বলতো? দেশ-বিদেশে নিন্দে করে বেড়াবেন যে? জানো, কত ভালো ভালো ছবি তোলেন তোমার কাকাবাবু। আমাদের বিল্টুর কিন্তু চমৎকার একখানা ছবি তুলে দিতে হবে ঠাকুরপো।'

লাবণ্য একটু হাসল।

অনিমেষের চোখে এই অপ্রত্যাশিত হাসিটুকু ভারি সুন্দর লাগল। বিনয়ের ছেলের তুলনায় তার স্ত্রীকে সুশ্রীই বলা যায়। রং ফর্সা, টানা নাক চোখ। মুখের গড়নের মধ্যে বেশ একটু মিষ্টত্ব আছে। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। দীর্ঘ দোহারা চেহারা, স্বাস্থ্য এত অভাব অনটনেও ভেঙে পড়েনি।

এমন রোগা আকৃতি ছেলে লাবণ্যের কোলে মানায় না। কিন্তু মাতৃত্ব ওর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে মধুরতর করেছে।

অনিমেষকে অমন করে তাকাতে দেখে লজ্জিত হয়ে লাবণ্য চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনি তো আজকাল আসেনই না, শুনেছি ডিরেক্টর হয়েছেন—'

অনিমেষ হেসে বলল, 'তা হয়েছি।'

তারপর বন্ধুর দিকে ফিরে তাকাল অনিমেষ, 'সত্যি এ তোমার ভারি অন্যায় বিনয়—ছেলেটার একটু যত্নটত্ন নেওয়াই তো উচিত এখন। সবে অসুখ থেকে উঠেছে। বৌদি ওভালটিন আনতে বলেছিলেন আনলে না কেন?'

বিনয় উত্যক্ত হয়ে বলল, 'আনলে না কেন। ফরমায়েস কি এক ওভালটিনেরই ছিল নাকি? ছেলের জন্যে বিস্কুট, সংসারের জন্যে একপো ডাল, চা, এদিকে মাসের শেষ; কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা আনি শুনি। যা না আনব, তাই নিয়েই তো কুরুক্ষেত্র, আর ছেলের আদর-যত্নের কথা যদি বল, সত্তর টাকা মাইনের কেরাণীর ঘরে ছেলের আদরটা কিছু কম হচ্ছে নাকি?'

মেঝেয় সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বিনয় অদ্ভুত একটু হাসল, 'ছেলে নিয়ে এর চেয়ে বেশি আদর-আহ্লাদ করবার সখই যদি ছিল, কেরাণীর সন্তান পেটে না ধরে কোন বড়লোকের ঘরে গিয়ে ছেলে বিয়োলেই হত।'

লাবণ্য বলল, 'শুনুন, কথা শুনুন একবার।'

অনিমেষ বন্ধুকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'ছিঃ কি যা তা বলছ বিনয়, এত মুখ খারাপ করতে শিখলে কবে থেকে। ছি ছি ছি।'

অপ্রস্তুত হয়ে বিনয় এবার একটু কাল চুপ করে রইল।

অনিমেষ আন্তরিক সহানুভূতিতে বন্ধুর দিকে তাকাল, কেবল মুখের কথাই তো খারাপ হয়নি, বিনয়ের মুখের গড়নও বড় বিশ্রীভাবে বদলে গেছে। ত্রিশ-একত্রিশের বেশি বয়স হবে না ওর। কিন্তু গাল ভেঙে চোয়াল জেগে এমন হয়েছে চেহারা যেন মনে হয় অনেকদিন চল্লিশ পার হয়ে গেছে।

অনিমেষ বলল 'পার্ট-টাইম কিছু একটা জোগাড় করতে পারলে নাকি বিনয়?'

বিনয় মাথা নাড়ল, 'না তোমাকে এত করে বললাম—'

অনিমেষ বলল, 'চেষ্টা তো করে দেখলাম ভাই, কিন্তু আমাদের যা লাইন তাতে—'

লাবণ্য তাক থেকে চা চিনি, আর দুটি কাপ পেড়ে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ছেলে তার সঙ্গে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল।

'আবার তুমি আসছ?'

একটু পিছন ফিরে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে লাবণ্য ফের একটু হাসল, 'এক নিমেষও চোখের আড়াল করবার জো নেই এমন জ্বালা।'

দোরের বাইরে গিয়েই ছেলেকে যে লাবণ্য কোলে তুলে নিল, তা অনিমেষের চোখ এড়াল না।

বিনয় বলল, 'তুমি তো এবার ডিরেক্টার হয়েছ অনিমেষ। দু'এক নম্বর পার্ট-টার্ট দাও না আমাকে। দু'দশ টাকা যদি আসে মন্দ কি?'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'তোমাকে পার্ট দেব? লোকের সামনে কথাই বলতে পারো না ভালো করে তো তুমি আবার অভিনয় করবে। তোমাকে পার্ট দিলে তো মৃতসৈনিকের পার্ট দিতে হয় বিনয়।'

বিদ্রূপ শুনে বন্ধুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল বিনয়, তারপর একটু হাসল, মৃত সৈনিকের পার্ট তুমি আর নতুন করে দেবে কি ভাই, মৃত সৈনিক হয়েই তো আছি। তুমি বড়জোর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়েছ। তার চেয়ে বেশি তো কিছু করোনি।'

চায়ের কাপ হাতে লাবণ্য ঘরে ঢুকে একটু হেসে বলল, 'এবার বুঝি আপনার সঙ্গে ঝগড়া সুরু করেছে। এমন খিটমিটে মেজাজও হয়ে গেছে জানেন। ঝগড়া ছাড়া আজকাল এক মুহূর্তও থাকতে পারে না।'

চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে স্মিতমুখী লাবণ্যের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, 'ঝগড়া নয়, বিনয় আমার কাছে পার্ট চাইছিল, আমি বলি কি বউদি, বিনয়ের দ্বারা তো হবে না, কিন্তু আপনি পারলেও পারতে পারেন। আপনি নিশ্চয় পারবেন। করবেন?'

শুনে লাবণ্যও হাসল, 'সত্যি নাকি? বেশ তো নামিয়ে দিন না। আপনি যেখানে ডিরেক্টর, আমার সেখানে এ্যাক্ট না করলে চলবে কেন?'

অনিমেষ বলল, 'না ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই বলছি।' তারপর বিনয়ের দিকে ফিরে তাকাল অনিমেষ, 'আমি seriously বলছি বিনু। তোমরা যদি রাজী হও তাহলে বউদিকে সত্যিই একটা ছোটমত রোল দেওয়া যায়।'

বিনয় হাসল, 'তাই নাকি?'

পরিকল্পনাটা এবার খুলেই বলল অনিমেষ। বিনয় হাসছে কেন। এতে দোষের কি আছে। আজকাল কত ভদ্রঘরের মেয়েরাও তো আসছেন এ লাইনে। খুব ছোট পার্ট, ফষ্টি-নষ্টি কিছু নেই। লাবণ্যের উপযুক্ত ভূমিকাই তাকে দেবে অনিমেষ। রুগ্ন সন্তানের জননীর রোলেই সে নামাবে লাবণ্যকে। সবশুদ্ধ তিন চারটি সটের বেশি হবে না। কথাও খুব সামান্য। স্বামীর সঙ্গে মাত্র একবার সাক্ষাৎ হবে। বাকি সব দৃশ্যই ছেলের সঙ্গে আর বুড়ো ডাক্তারের সঙ্গে। ষ্টুডিওতে বিনয় থাকবে, অনিমেষ থাকবে, কোন অসুবিধা হবে না। বিনয়ের ছেলে বিন্তুকে শুদ্ধ নামাবে অনিমেষ। নিজের ছেলেকে ঘরে যেমন আদর-যত্ন সেবা-শুশ্রূষা করছে লাবণ্য, ষ্টুডিওতে ক্যামেরার সামনে তার চেয়ে বেশি কিছু করতে হবে না। সব দিয়ে দিন-তিনেক বেরুতে হবে বড়-জোর। প্রযোজককে বলে-টলে শ'তিনেক টাকার ব্যবস্থা অনিমেষ করতে পারবে।

তিনশ টাকা! রুদ্ধশ্বাসে চুপ করে রইল লাবণ্য। সে যে অনেক। বিন্তুর চিকিৎসার জন্যে আগে যা কিছু ধার আছে তা শোধ দেওয়া যাবে। দিয়ে থুয়ে যা বাকি থাকবে তাতে ভালো ফুড হবে বিন্তুর ওব নতুন জামা-জুতো প্যান্ট আসবে। ওর নামে পঁচিশ টাকার একটা সেভিংস এ্যাকাউন্টও খুলে রাখবে লাবণ্য। বড়লোকের ছেলেদের নামে ব্যাঙ্কে টাকা থাকে বলে সে শুনেছে। সে টাকায় হাত দিতে দেবে না বিনয়কে। কিন্তু তিনশ টাকাই যদি এক সঙ্গে আসে বিনয়ের জন্যেও কিছু কিনে দিতে হবে বইকি, যে হিংসুটে মানুষ। বেরুবার মত ভালো জামা-কাপড় নেই, তা করতে হবে। একটা সিগারেট কেসের ভারি সখ বিনয়ের, তাও একটা কিনবে লাবণ্য ওর জন্যে। নিজের একখানা ভালো শাড়ি নেই বাক্সে। অবশ্য সে মুখ ফুটে চাইবে না, বিনয় যদি কেনে কিনবে। হাতে অত টাকা এলে বিনয় অবশ্য শাড়ির কথাই আগে বলবে, তা লাবণ্য জানে।

'আপনি ঠাট্টা করছেন।' লাবণ্য অস্ফুট স্বরে বলল।

অনিমেষ বলল, 'না বউদি আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না। আপনারা যদি রাজী হন, আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলি।'

লাবণ্য বলল, কিন্তু লোকে যে নিন্দে করবে।'

অনিমেষ বলল, 'কেন নিন্দে করবে? এতে নিন্দের কি আছে? তা ছাড়া,

আপনি যদি নিজের নাম না দিতে চান না দেবেন। লাবণ্যের বদলে অন্য নাম রাখলেই হবে।'

বিদায় নেওয়ার সময় বন্ধুকে আরো একবার অনুরোধ করে গেল অনিমেষ। তারা সারা রাত ভালো করে ভেবে দেখুক। কাল বেলা দশটার মধ্যে কিন্তু পাকা কথা দিয়ে আসতে হবে অনিমেষকে, বিনয় যদি রাজী না হয় তাহলে অন্য লোকের সঙ্গে কনট্রাক্ট করে ফেলবে অনিমেষ। তার দেরি করবার সময় নেই। বইয়ের স্যুটিং প্রায় আধাআধি হয়ে গেছে। বাকি অধেক মাস-খানেকের মধ্যে শেষ করা চাই।

সদর দরজা পর্যন্ত লাবণ্য আর বিনয় এগিয়ে দিয়ে এল অনিমেষকে।

লাবণ্য বলল, 'কিন্তু ঠাকুরপো আমি কি পারব? আপনি কি শিখিয়ে নিতে পারবেন আমাকে?'

অনিমেষ বলল, 'নিশ্চয়ই। মা কি করে ছেলের পরিচর্যা করে, ছেলের শক্ত অসুখে তার মনের অবস্থা কি রকম হয় না হয় তাতো আর আপনাকে শিখিয়ে দেওয়ার বেশি দরকার হবে না।'

পরদিন সকালেই বিনয় গিয়ে অনিমেষকে খবর দিল লাবণ্য রাজী হয়েছে। বিনয় বলল, 'কিন্তু নামটা ভাই বদলে দেওয়াই ভালো।'

অনিমেষ হেসে বলল 'এটা কি তোমার ইচ্ছে না তাঁর ইচ্ছে। শেষে বউদি যখন নামকরা লোক হয়ে পড়বেন, তখন নাম বদলাবার জন্যেই হয়তো অনুতাপ হবে। আচ্ছা, নামের ব্যাপার তো সব চেয়ে পরে। সে তখন দেখা যাবে।'

দুপুরের পর মালতী গিয়ে ষ্টুডিওতে হাজির। ত্রিশ পেরিয়ে গেছে বয়স। চোখেমুখে অমিতাচারের ছাপ। পুরু পাউডারের প্রলেপে তাকে প্রাণপণে ঢাকবার চেষ্টা করেছে। ঠোঁটে লিপষ্টিক, চড়া রংয়ের শাড়ি গয়নায় চুল বাঁধবার ঢং-এ নিজেকে অষ্টাদশী বলে প্রমাণ করবার প্রয়াস সুস্পষ্ট।

অনিমেষ ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল 'বড় দেরি করে এলেন মিস মল্লিক। আমি আর একজনের সঙ্গে কনট্রাক্ট করে ফেলেছি।'

মালতী বলল, 'সে কি, আপনি তো আজ বারোটার সময় ষ্টুডিওতে দেখা করতে বলেছিলেন। এখনো তো পাঁচ মিনিট বাকি আছে বারোটার।'

নিজের হাত-ঘড়িটা মালতী অনিমেষের চোখের সামনে তুলে ধরল।

অনিমেষ বলল 'আমাকে আজ সকালেই কনট্রাক্ট ক'রে ফেলতে হয়েছে। বড় তাড়াতাড়ি ছিল। কাল থেকেই ফের স্যুটিং আরম্ভ কিনা। তাছাড়া ভেবে দেখলাম মায়ের ভূমিকা আপনাকে ঠিক মানাতও না। আপনার উপযুক্ত কোন রোল থাকলে নিশ্চয়ই—'

মালতী চটে উঠে বিকৃতমুখে বলল, 'আপনার মত অমন পুচ'কে ডিরেক্টর ঢের ঢের দেখেছি অনিমেষবাবু। ছিলেন ফটোগ্রাফার, হয়েছেন ডিরেক্টর। বলে কিনা 'যত ছিল নলবুলে সব হল কীর্তনে।' ধরাকে সরাজ্ঞান করছেন। মানাত না! না মানাবার কি আছে শুনি, কেবল মা কেন, জেঠীমা, খুড়ীমা, মাসীমা, পিসীমা ইচ্ছা করলে না পারি কি? এতদিন ওসব রোলে কেউ আমাকে নামাতে পারে নি। আপনার বইতে নিজের ইচ্ছেই নামতে চেয়েছিলাম। বেশ কনট্রাক্ট্ আপনি না করতে চান না করলেন, কিন্তু এক মাঘে শীত যায় না, তাও বলে দিচ্ছি।'

খানিকক্ষণ চেঁচামেচির পর গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল মালতী।

স্টুডিও সম্বন্ধে যাতে একটা মোটামুটি ধারণা হয় তার জন্য সপুত্রক লাবণ্যকে আগেই একবার বিনয় ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। সাজসজ্জা, যন্ত্রপাতি দেখে লাবণ্য তো অবাক, নির্জীব, দুর্বল বিন্তুরও উৎসাহের অবধি নেই। মার কোলে থেকে সে দুর্বোধ্য ভাষায় হাত-পা নেড়ে কিসব বলতে লাগল।

মাত্র একদিন আছে মাঝখানে। রিহার্সেলের সময় নেই। চলচ্চিত্রে এইরকমই দস্তুর। উদ্যোগের আয়োজনের ব্যাপারে অতি দ্রুত চলায় সে অভ্যস্ত। তবু বিনয়ের বাসায় গিয়ে লাবণ্যকে প্রথমদিনের স্যুটিং-এর খানিকক্ষণ মহড়া দেওয়াল অনিমেষ। ছেলের মুখে সামান্য দু'একটি কথা ছিল। কিন্তু বিন্তু মা বাবা ছাড়া এখনো কোন ডাক শেখেনি বলে অনিমেষ তা কেটে দিল। বিন্তুর বিকলাঙ্গ কদাকৃতি চেহারাটাই ছবির পক্ষে এক বড় সম্পদ। ওর মুখে কথার আর দরকার হবে না।

পরদিন গাড়িতে করে নিজেই বন্ধু আর তার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে এল অনিমেষ। ষ্টুডিওর দরজায় দেখা হোল মালতীর সঙ্গে।

অনিমেষ একটু সৌজন্য আর সহানুভূতির স্বরে বলল, এই যে মিস মল্লিক, আপনিও এসেছেন দেখছি। কাজ আছে বুঝি।

মালতী বলল, 'আপনার নতুন স্টার দেখতে এলাম। সেও তো এক কাজ।' বলে গাড়ির ভিতরে উঁকি দিয়ে লাবণ্যের দিকে ঈর্ষাকুটিল চোখে একটু তাকাল মালতী। লাবণ্য চোখ ফিরিয়ে নিল।

মালতী চলে গেলে লাবণ্য বলল, 'মেয়েটা কে ঠাকুরপো? কি রকম অসভ্যের মত বার বার তাকাচ্ছিল। আর কি রঙই না মেখেছে মুখে। ছি ছি ছি! কে ও?'

অনিমেষ মৃদু হাসল, 'বড় সহজ পাত্রী নয় বউদি। আর একটু হ'লেই ও আপনার জায়গা কেড়ে নিত। আপনি তো লক্ষ্য করেন নি, বিনয় এতক্ষণ তো ওকেই দেখছিল চেয়ে চেয়ে।'

বিনয় লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি যে বল।'

প্রডিউসারকে আগেই বলে রেখেছিল অনিমেষ। লাবণ্যকে দিয়ে অভিনয় করালে টাকা কম লাগবে। তাছাড়া বিজ্ঞাপনের সময়েও সুবিধা হবে খুব। নিজের ছেলে নিয়ে ভদ্রঘরের সুন্দরী কুলবধূ অভিনয়ে নেমেছেন বইয়ের পক্ষে এর চেয়ে চমৎকার বিজ্ঞাপন আর কি হ'তে পারে।

লাবণ্যকে বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল অনিমেষ। মুখখানা বেশ মিষ্টি মিষ্টি। দেখেশুনে প্রসন্নই হলেন বৈকুণ্ঠ। বললেন, 'বেশ, বেশ। আমার কুঁড়ে ঘড়ে লক্ষ্মীর আগমন হয়েছে অনিমেষবাবু। আহাহা, মুখখানা কি রকম শুকিয়ে গেছে। ওঁকে রিফ্রেসমেণ্ট রুমে নিয়ে যান এক্ষুনি।'

সেট সাজানো গেল। আড়ম্বর আয়োজনের কিছু নেই। দরিদ্র নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘর। ঠিক যেমন ঘর লাবণ্য দেখে এসেছে অনিমেষ সেটে প্রায় তারই অনুকরণ করল। মেঝেয় ছেঁড়া বিছানায় রোগজীর্ণ ছেলে। দায়িত্বহীন ভীরু বেকার স্বামী কোথায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে ভিজিট না পেলে ডাক্তার আসবে না। ডাক্তার ডাকবার লোক নেই, টাকা নেই। একবার ছেলের গায়ে হাত দেয় মা আর একবার হাত তুলে আনে। নিজের হাতে শাঁখা আর এঁয়োতির লোহা ছাড়া আর কিছু নেই। এক চিলতে হার এখনো আছে ছেলের গলায়। খানিক আগে হার হার বলে কেঁদেছিল, তাই পরিয়ে দিতে হয়েছে। এখন ঘুমন্ত ছেলের গলা থেকে মা সে হার কি ক'রে তুলে নেবে। সোনার অঙ্গ থেকে কি সোনা ছিঁড়ে নেওয়া

যায়। তবু নিতেই হোল। ছেলের হার চুরি ক'রে নিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে মা চলল ডাক্তার ডাকতে।

প্রথম দিনের সেট এই পর্যন্ত। বিষয়টা বার বার লাবণ্যকে বুঝিয়ে দিল অনিমেষ। সেটের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বার বার তাকে মহড়া দেওয়াল। কিন্তু লাবণ্যর কিছুতেই যেন হ'তে চায় না। নিতান্ত নিরুদ্বেগ মুখ লাবণ্যের, দুঃখ নৈরাশ্য, ক্ষোভ কোন ভাব ফুটে উঠছে না। একান্ত অভাবব্যঞ্জক মুখ। বাইরের অনেকগুলি পুরুষ যে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তার জন্যে মাঝে মাঝে লজ্জা আর সংকোচ প্রকাশ পাচ্ছে তার। বার বার মাথায় আঁচল টেনে দিতে চাইছে লাবণ্য। বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত অনিমেষ ধমক দিল, 'আপনার লজ্জার অত সময় কই। আপনার ছেলের ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। টাইফায়ডের চেয়েও শক্ত অসুখ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যেতে পারে আপনার ছেলে। আপনি যান ছেলের কাছে গিয়ে বসুন, তার গায়ে হাত বুলান।'

কিন্তু সেটের মধ্যে লাবণ্যর হাত কাঁপে, পা কাঁপে, ঠোঁট কাঁপে থর থর করে। অদ্ভুত একটা ভয় তাকে পেয়ে বসেছে। সে ভয় ছেলের মৃত্যুভয় নয়। অনেক কষ্টে যদি বা ছেলের কাছে তাকে বসানো গেল, তার আড়ষ্ট ভঙ্গি কিছুতেই যেতে চায় না। ছেলের মাথার কাছে বসে হাতে পাখা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য তা রেখে দিল। অনিমেষ ধমক দিয়ে উঠল, 'অমন ক'রে বাতাস করে নাকি? আপনার নিজের ছেলে ম'রে যাচ্ছে।—'

লাবণ্য মাথা নেড়ে বলল, 'না না না।'

পুরো ঘণ্টাখানেক চেষ্টা ক'রে শেষে সেট থেকে লাবণ্যকে নামিয়ে আনল অনিমেষ, তারপর অসহায়ের মত বলল, 'হোল না।'

লজ্জায় অনুশোচনায় লাবণ্য মুখ নীচু করল।

বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের পাশের চেয়ারেই বসেছিল মালতী মল্লিক। অনিমেষ আর লাবণ্যের কাণ্ড দেখে মুখে রুমাল চেপে ধরেছিল। তবু তার হাসির শব্দ অস্পষ্ট ছিল না।'

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, 'মিস মল্লিক, আপনি এ যাত্রা উদ্ধার ক'রে স্যুটিং ডিটেইনড হোক, আমি চাই না।

মালতী বলল, 'উদ্ধার আমি করতে পারি, কিন্তু হাজার টাকার এক পয়সাও কম হবে না।'

বৈকুণ্ঠ বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, সেজন্যে আটকাবে না। কাজ সারতে সারতে যদি রাত হয়ে যায়, আমি নিজের গাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব, আপনি ভাববেন না।'

পলিতকেশ প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে মালতী ঠোঁট টিপে হাসল, 'বেশ তো দেবেন, আপাততঃ ভ্যানিটি ব্যাগটি রাখুন আমার, আর কনট্রাক্ট ফরমটা দিন।'

মেক-আপ রুম থেকে মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে এল মালতী, আটপৌরে ময়লা শাড়ি পরণে। শাঁখা-সম্বল দরিদ্র গৃহস্থবধূ। অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কই ডিরেক্টর মশাই, ছেলে কই আপনার।'

আজকের মত বিনয়ের ছেলে দিয়েই কাজ চালাতে হবে। ষ্টুডিওতে আর কোন ছেলে নেই, সৌজন্যের খাতিরে বিনয় তাতে রাজী হোল।

ছেলে দেখে নাক সিটকাল মালতী, 'ও ডিরেক্টর মশাই এই নাকি ছেলের নমুনা আপনার? এতকাল বাদে শেষ পর্যন্ত এই রকম ছেলে একখানা বানালেন বুঝি? আনাড়ী ডিরেক্টরের ছেলে এর চেয়ে আর বেশি কি হবে? কিন্তু ওর মা হব কি করে, ওকে ছুঁতেই যে ঘেন্না ঘেন্না লাগছে আমার।'

কিন্তু সেটে গিয়ে মালতীর চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেল। কিন্তু একটু কাঁদতে সুরু করেছিল, তাকে টাকা আর খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখল মালতী। তারপর সুরু হোল রুগ্ন ছেলের পরিচর্যা। উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে জননীর শঙ্কিত বিহ্বল মুখ দেখে দর্শকেরা সবাই মুগ্ধ হোল। অনিমেষের ডিরেক্‌শনের চাইতে মালতী নিজের Suggestionগুলি উৎকৃষ্ট বলে মনে হোল সকলের।

মালতী এক ফাঁকে হেসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না ডিরেক্টর মশাই, আপনি শত হইলেও ওর পালক বাপ, আমি ওর সাক্ষাৎ মা। কি করতে হবে না হবে, আমার চেয়ে বেশি জানেন নাকি আপনি?'

হাত তুলে নেওয়ার দৃশ্যটিও চমৎকার অভিনয় করল মালতী, 'ওরে এই বিষ্যুৎবার দিন কি করে আমি সোনামণির গলা থেকে সোনা কেড়ে নেবরে।' বলে রুদ্ধ কান্না চাপবার এমন ভঙ্গি করল মালতী যে বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের চোখ দুটি পর্যন্ত সজল হয়ে উঠল।

ক্যামেরাম্যান খুসিমনে সট্ নিল। সবাই স্বীকার করল, এ দৃশ্যটি বইয়ের সেরা সম্পদ হবে।

জলভরা চোখে সেট থেকে নেমে এসেই মালতী কিন্তু হাত পাতল বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের কাছে, 'কই চেকটা দিন।'

অনিমেষ প্রসন্ন মনে বলল, 'খুব খুসি হলাম। মার ভূমিকায় আপনি এত ভালো অভিনয় করলেন কি করে বলুন তো?'

মালতী হেসে বলল, 'হিংসেয় ডিরেক্টর মশাই, হিংসয়ে। স্বভাব হলো অভিনয় মদ আর মাৎসর্য ছাড়া হবার নয়। এবার টের পেলেন তো বিন্তুর কে মা আর কে সৎমা, 'ব'লে আড়চোখে নতমুখী লাবণ্যের দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে মালতী বৈকুণ্ঠকে বলল, 'আপনি গাড়ির বন্দোবস্ত করুন বৈকুণ্ঠবাবু। আমি মেকআপ রুম থেকে এলাম বলে।'

গাড়িতে করে অনিমেষও লাবণ্যদের পৌঁছে দিয়ে আসতে চাইল; কিন্তু বিনয় আর লাবণ্য দুজনেই মাথা নাড়ল। গাড়ির দরকার নেই, তারা ট্রামেই বেশ যেতে পারবে। বিন্তুর হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিল অনিমেষ, কিন্তু লাবণ্য তাও নিল না, বলল, 'ও টাকা দিয়ে কাকাবাবুকে প্রণাম কর বিন্তু, ও নিয়ে তোমার কাজ নেই, কাকাবাবু পরে তোমাকে লজেন্স-বিস্কুট কিনে দেবেন তাই নিয়ো।'

অনিমেষ বলল, 'আমি খুবই লজ্জিত বউদি।'

লাবণ্য বলল, 'আপনার লজ্জার কি আছে।'

রিলিজের পর সপ্তাহ চারেক বেশ ভালোই চলল বই। মোটামুটি উৎরে গেছে অনিমেষের প্রথম ছবি। পাশ পেয়ে পরিচিত বন্ধুরা দেখে এসে সুখ্যাতি করল। কেবল এল না বিনয়। অনিমেষ ভাবল ওরা লজ্জা পাচ্ছে। দু'খানা পাশ নিয়ে একদিন হাজির হোল বন্ধুর বাসায়।

চেহারা আরো খারাপ হয়েছে বিনয়ের। জামাকাপড় আরও জীর্ণ। ঘরটা যেন একটু ফাঁকা ফাঁকা। আসবাবপত্র সব নেই, তবু বিনয় খুসি হবার ভঙ্গিতে বলল, 'এসো এসো। আমি ভাবলাম তুমি বুঝি সম্পর্ক তুলেই দিলে।'

লাবণ্য বলল, 'আপনার ছবির নাকি খুব নাম হয়েছে।'

অনিমেষ বলল, 'পরের মুখে ঝাল খেয়ে লাভ কি। নিজেরা গিয়ে আগে দেখে আসুন। তারপর ভালো বলতে হয় বলুন, নিন্দে করতে হয় করুন। কিন্তু মহারাজ এসো তো এদিকে। এই নাও তোমাদের পাশ। তোমার অভিনয়

কেমন হয়েছে দেখে এসো গিয়ে। আপনারা ত ছেলে দিলেন না বউদি, অতিকষ্টে শেষে আর একটাকে জোগাড় করে নিলাম।'

রুগ্ন উলঙ্গ ছেলের দিকে একবার তাকাল অনিমেষ। পা'টা ওর আরো শুকিয়েছে।

অনিমেষ বলল, 'ওর শরীরটা বুঝি এখনো তেমন সারেনি বউদি? ফের কি অসুখ বিসুখ—'

কথা শেষ হ'তে পারল না, দরজায় কড়া নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ভারি গলাও শোনা গেল, 'বিনয়বাবু আছেন? বিনয়বাবু?'

বিনয় স্ত্রীর দিকে তাকাল, তারপর ফিস ফিস করে বলল, 'সেরেছে। অনিমেষ এসেই যত গোল বাধাল। না হ'লে আমি এতক্ষণে বেরিয়ে যেতাম, নাগাল পেত না।'

অনিমেষ বলল, 'কে?'

বিনয় তেমনি ফিস ফিস ক'রে বলল, 'বাড়িওয়ালা গোবিন্দ প্রামাণিক। ভাড়ার তাগিদে এসেছে। অস্থির করে ফেললে ভাই। এদিকে হাতে পয়সা নেই একটি। পুরো মাইনে পাইনি অফিস থেকে। কিছু আগাম নেওয়া ছিল। কেটে রেখেছে।' তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাও বলে এসো বাসায় নেই।'

লাবণ্য একবার অনিমেষের দিকে তাকাল।

বিনয় বলল, 'আহা, ওর কাছে আর তোমার লজ্জা করতে হবে না। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বলে এসো নেই, বেরিয়ে গেছে। পাওনাদার ভাগাতে লাবণ্যের জুড়ি নেই অনিমেষ।'

লাবণ্য স্থিরদৃষ্টিতে একটুকাল স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'নেই বললে বিশ্বাস করবে কেন। তোমার গলা শুনতে পেয়েছে।'

বিনয় কাঁথাটা মুড়ি দিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ল, 'তাহ'লে বল গিয়ে বড্ড অসুখ।'

সদর দরজায় লাবণ্যের সঙ্গে আগন্তুকের মৃদু কণ্ঠে কি একটু কথা হোল। তারপর একজন প্রৌঢ় মত লোককে সঙ্গে নিয়ে লাবণ্য ফিরে এল, 'আসুন কাকাবাবু। এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, উঠে যাবার পর্যন্ত সাধ্য নেই।'

বাড়িওয়ালা গোবিন্দ প্রামাণিক ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন।

বছর পঞ্চান্ন হবে বয়স। লম্বাচওড়া স্বাস্থ্যবান পুরুষ। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। ভুড়ির কাছে ফতুয়ার বোতাম দুটি খোলা।

কাঁথা মুড়ি দিয়ে বিনয় ততক্ষণে পাশ ফিরে শুয়েছে। লাবণ্যের দিকে তাকিয়ে গোবিন্দবাবু বললেন, 'হয়েছে কি বিনয়বাবুর? জ্বর টর নাকি?'

তিনি একটু এগিয়ে কপালে হাত দিতে গেলেন বিনয়ের।

লাবণ্য বলল, 'না কাকাবাবু, জ্বর নয়। সামান্য জ্বরজারি উনি গ্রাহ্যই করেন না। কাল দিনেরাত্রে অন্তত বার পঁচিশেক দাস্ত হয়েছে।'

গোবিন্দবাবু একটু পিছিয়ে এলেন, 'বলেন কি?'

লাবণ্য বলল, 'হাঁ, পঁচিশবার তো হবেই। বেশিও হতে পারে।' শেষের দিকে বিছানা থেকে আর উঠবার ক্ষমতা ছিল না। ভয়ে আর বাঁচিনে কাকাবাবু। দিনকাল তো ভাল নয়।'

অনিমেষ লক্ষ্য করল লাবণ্যের চোখে মুখে সত্যিই যেন স্বামীর অসুখের জন্য শঙ্কা আর উদ্বেগের ছাপ এসে পড়েছে। কালকের ভয় যেন তার আজও কাটেনি।

গোবিন্দবাবু বললেন, 'ভয়েরই ত কথা। চারিদিকে যা অসুখ বিসুখ হচ্ছে। শুধু দাস্ত না কি বমি টমিও ছিল?'

লাবণ্য বলল, 'হুঁ, শেষের দিকে সবই সুরু হয়েছিল। মানুষ নেই, জন নেই, টাকা-পয়সার টানাটানি এমন বিপদেই পড়লাম। শেষে দিশে টিশে না পেয়ে মামাকে খবর দিলাম। শ্যামবাজারের মধু ডাক্তারের নাম শুনেছেন তো? তিনি আমার মামা। তিনি দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গেলেন। তারপর ভগবানের দয়ায়—। দুদিনে কি চেহারা হয়ে গেছে দেখুন কাকাবাবু।'

লাবণ্য বিনয়ের গা থেকে কাঁথাটা তুলে ধরল।

গোবিন্দবাবু বললেন, 'খাওয়া দাওয়ার কিছু গোলমাল হয়েছিল নাকি? আর না হলেই বা কি। মানুষের শরীরের কখন যে কি হয়, তা কেউ বলতে পারে না।'

লাবণ্য সস্নেহে স্বামীর কপালে হাত বুলাল, 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি। কাকাবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

গোবিন্দবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক থাক। ওঁকে আর ডেকে কাজ নেই। আমি ভাড়াটার কথা বলব ভেবেছিলাম মা। যাক আজ আর না

বললাম। কিন্তু এদিকে দু' মাস হয়ে গেল। বিনোদ দু'তিন দিন এসে ঘুরে গেছে, বিনয়বাবুর দেখা পায়নি।

লাবণ্য বলল, 'একটু সুস্থ হ'লে উনি নিজেই গিয়ে ভাড়া দিয়ে আসবেন কাকাবাবু। বিনোদকে পাঠাতে হবে না। স্কুলের ছেলে পড়াশুনোর ক্ষতি হয়তো ওর।'

তারপর অনিমেষের দিকে তাকিয়ে লাবণ্য বলল, 'চমৎকার ছেলে। এত ছেলে মেয়ে আসে যায়, কিন্তু বিনোদের মত এমন শান্তশিষ্ট স্বভাব আমি আর কারো দেখিনি। কাকাবাবু দুঃখ করেন পড়াশুনোটা তেমন হোল না। দু দু বার ফেল করেছে ফাষ্ট ক্লাসে। তা করলই বা। লেখাপড়াটাই কি মানুষের সব? পড়াশুনো করে কি যে হয়, তাও ত চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। মানুষের স্বভাবটাই আসল, কি বলুন ঠাকুরপো। মানুষ যদি সৎ হয়, সত্যি কথা বলে—'

অনিমেষ একটু ঢোক গিলে বলল, 'তা তো ঠিকই।'

এক ফাঁকে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে অনিমেষের পরিচয় করিয়ে দিল লাবণ্য। বলল, 'মস্ত বড় ডিরেক্টর। আপনি তো সিনেমা টিনেমা কিছু দেখেন না। কিন্তু সিনেমাওয়ালারা সবাই ওঁর নাম জানে। ওঁর ছেলেবেলার বন্ধু। অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছেন।'

একটু বাদে গোবিন্দবাবু বললেন, 'আমি তাহ'লে আজ চলি। আমার কথাটা কিন্তু—'

লাবণ্য বলল, 'নিশ্চয়ই, উনি সুস্থ হয়ে উঠেই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু ওকি কাকাবাবু, উঠলে চলবে না। একটু বসুন, এক কাপ চা করে আনি। চা তো খুব ভালোবাসেন আপনি।'

গোবিন্দবাবু একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'না না, চা আজ থাক, চা আজ-কাল আর আমি তেমন খাইনে।'

লাবণ্য বলল, 'তাহ'লে থাক। আজ আমিও বেশি খেতে বলব না কাকা-বাবু। যা দিনকাল। একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সাবধান সতর্কমত থাকাই ভালো। আর একদিন এসে কিন্তু চা খেয়ে যেতে হবে। কথা দিয়ে যান কাকাবাবু।'

লাবণ্যের মুখে হাসি, গলায় আবদারের সুর।

'আচ্ছা মা, আচ্ছা। আসব আর একদিন।' বলে গোবিন্দবাবু সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বিনয় কাঁথা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসল। বন্ধুকে বলল, 'দেখলে তো? তোমার চেয়ে আমি নেহাৎ খারাপ ডিরেক্টর নই।'

অনিমেষ এতক্ষণ বিস্ময়ে নির্বাক হয়েছিল।

এ সম্বন্ধে কোন রকম মন্তব্য করতে প্রথমে সে একটু কুণ্ঠাবোধ করল, কিন্তু বিনয়ের সপ্রতিভ ভঙ্গিতে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে অনিমেষও সহজ হবার চেষ্টা করে হেসে বলল, 'তা ঠিক। তবে তোমার চেয়েও বেশি কৃতিত্ব কিন্তু বউদির। এমন পাকা অভিনেত্রীর ডিরেক্টরের দরকার হয় না।'

লাবণ্যের দিকে ফিরে তাকাল অনিমেষ, 'আপনি মালতী মল্লিকের চেয়ে কোন অংশে কম নন। কিন্তু সেদিন অত ঘাবড়ে গেলেন কেন বলুন তো?'

লাবণ্য স্থিরদৃষ্টিতে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত একটু হাসল, 'মালতীও এখানে এসে ঘাবড়ে যেত ঠাকুরপো। এতখানি তার সাধ্যেও কুলোত না।'

লাবণ্যের ধরা গলায় দুই বন্ধু চমকে উঠে ওর মুখের দিকে তাকাল। লাবণ্যের ঠোঁটে সেই হাসিটুকু এখনো লেগে রয়েছে। কিন্তু চোখ দুটো হঠাৎ অমন ছল্‌ছল্‌ করছে কেন?

নাকুটমণি

সরিৎ কেবল অমিতার মুখের কাছে নিজের মুখ এগিয়ে এনেছে সদর দরজায় কে ডেকে উঠল, 'দিদিমণি ! ও দিদিমণি !'

মেয়েলি গলার সঙ্গে মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ। বিরক্ত হয়ে কান খাড়া করল অমিতা। এই অসময়ে আবার কে এল জ্বালাতে ? রবিবারের দুপুর। সাত দিন পরে অবসরের সঙ্গী হিসেবে আজ সে স্বামীকে পেয়েছে। অন্য দিন এ সময় সরিৎ অফিসে কলম পেষে। ছুটির পরেই সে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি আসতে পারে তা নয়। ব্যাঙ্কের কাজ শেষ হয়ে গেলে কলেজ স্ট্রীটের একটি ষ্টেশনারী দোকানে হিসাব লেখে। ফিরতে ফিরতে রাত সেই নটা, সাড়ে নটা। বেশির ভাগ দিনই বিরস আর তিরিক্ষে মেজাজ নিয়ে আছে। কথা ছোয়ানো যায় না, যেন কলে-পেষা একখানা আখ। রসটুকু ওর মনিবেরা নিংড়ে রেখে দিয়েছে। শুধু ছোবড়াটুকু পড়েছে অমিতার ভাগে।

কিন্তু রবিবারের চেহারা অন্য রকম। সকাল থেকে ঢিলে-ঢালা মন্থর গতিতে দিন স্থুরু। সাতটায় চা আটটায় বাজার। বারটায় চার-পাঁচ পদ দিয়ে পাশাপাশি বসে ভোজন। তার পর ঢালা বিছানা আর ঢালাও দুপুর। দিন দুপুর। কিন্তু জানালা-দরজা বন্ধ করলে তা প্রায় রাত দুপুরের মত। এ সময় সরিতের চাপল্য আর উচ্ছলতা দেখলে বছর পাঁচেক আগের বিয়ের সেই প্রথম ক'টি দিনের কথা অমিতার মনে পড়ে।

'দিদিমণি !'

সরিৎ বললে, 'যাও দেখ গিয়ে আমার কোন শ্যালিকা এল আবার ওখানে।'

অমিতা মৃদু হাসল, 'বোধ হয় ঘুটেওয়ালী। ছ'আনা পয়সা বাকি ছিল, নিতে এসেছে। জ্বালাতন করে ছাড়লে।'

খাট থেকে বিরক্ত ভঙ্গিতে অমিতা এবার নেমে দাঁড়াল, তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে সশব্দে সদরের হুড়কো খুলে ফেলে বলল, 'কে ?'

মেয়েটি এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল, এবার সামনে এসে বলল, 'আমি দিদিমণি! মাঠের ওই ওপারটায় থাকি।' বলে আঙুল দিয়ে ছোট হিন্দুস্থানী বস্তিটা দেখিয়ে দিল।

না, আধবয়সী সেই ঘুটেওয়ালী নয়। অমিতারই প্রায় সমবয়সী বাইশ-তেইশ বছরের একটি বধূ। মাথায় সিঁদুর। কপালে টিপ। হাতে গাছচারেক ক'রে কালো রঙের প্লাষ্টিকের চুড়ি। পরনে সবুজপাড়ে মিলের একখানা আটপৌরে আধময়লা শাড়ি। গায়ের রঙ কালো। কিন্তু গড়নটুকু বেশ। মুখের ডৌলটুকু ভারি মিষ্টি, লম্বা নাক, টানা-টানা চোখ। পানের রসে লাল পাতলা ঠোঁট ছুটিতে চেহারার শ্রী আরো বাড়িয়েছে।

অমিতা তার সদ্য-শেখা রাষ্ট্রভাষা প্রয়োগ করে বলল, 'কেয়া চাহতি হায়! কি চাও? বাংলা বাত সমঝতি?'

বউটি অমিতার হিন্দী উচ্চারণ শুনে হেসে বলল, 'খুব খুব। আমরা বহুৎ দিন এই কলকাত্তা মুলুকে আছি দিদি। আমার জন্ম থেকে। বাংলা বুঝি, বাংলা বলি। আব আমার আদমী তো বাংলায় চিঠি লেখে। সেই চিঠি পড়াতেই আপনার কাছে এসেছি দিদি।' বলে চিঠিখানা অমিতার সামনে বাড়িয়ে ধরল বউটি।

নীল রঙের একখানা খাম। বাঁ দিকে লেখা '**By Air Mail, Air letter.**'

অমিতা বিস্মিত কৌতূহলে বলল, 'তোমার স্বামী air mailএ চিঠি লিখেছে? মানে হাওয়াই জাহাজে এসেছে তার চিঠি?'

বউটি হাসিমুখে বলল, 'হাঁ দিদি, তাই তো আসে। সে জাহাজে কাজ করে কিনা। তার চিঠি হাওয়াই জাহাজেই আসে।'

ততক্ষণে ইংরেজীতে লেখা ঠিকানাটাও অমিতা পড়ে ফেলেছে। নাকুটমণি, পটলবাবুর, বস্তি—ডিহি শ্রীরামপুর রোড, কলিকাতা।

'তোমার নামই বুঝি নাকুটমণি?'

'হ্যাঁ দিদি।'

'এসো, ভিতরে এসো।'

অমিতা তাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এসে বাইরের বসবার ঘরখানায় ঢুকল। একখানা তক্তপোষ আর তু'তিনখানা চেয়ারে সাজানো বৈঠকখানা। নাকুটমণি

মেজের ওপর বসতে যাচ্ছিল, অমিতা বাধা দিয়ে বলল, 'ওকি, ওখানে কেন তক্তপোষের ওপর বস।'

তক্তপোষের ওপর একখানা শতরঞ্চি পাতা নাকুটমণি আলগোছে তার এক কোণায় বসে পড়ে বলল, 'চিঠিটা এবার পড়ুন দিদি!'

কিন্তু ওদিকে পাশের ঘর থেকে ঘন ঘন কাসির শব্দ আসছে।

সেদিকে একবার তাকিয়ে অমিতা বলল, 'পড়ছি তুমি একটু বোসো নাকুট-মণি, আমি এলাম বলে।'

ঘরে এসে স্বামীর দিকে চেয়ে অমিতা বলল, 'কি ব্যাপার?'

সরিৎ বলল, 'ব্যাপার আবার কি? নতুন বোনের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে তার ভগ্নীপতিকে দেখি একেবারে বেমালুম ভুলে গেলে। বেশ, আমারও বন্ধু-বান্ধবী আছে। আমিও তাদের সঙ্গে আলাপ করতে জানি। দাও, আমার জামাটা দাও।'

অমিতা জামা দিল না, স্বামীকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'একটু বোসো। চিঠিটা পড়ে দিয়ে আমি এক্ষুণি আসছি। যে-সে চিঠি নয়, Air mail এর চিঠি। দেখেছ কোন দিন?'

Air mailএর গর্বটা যেন অমিতার নিজের।

সরিৎ হেসে বলল, 'কই দেখি?'

অমিতা বলল, 'উঁহু, এ চিঠি তোমাকে এর চেয়ে বেশি দেখাতে পারব না। ও বিশ্বাস করে আমার হাতে দিয়েছে। যাই চিঠিটা ওকে শুনিয়ে আসি।'

বাইরের ঘরে এসে একটু ফাঁক রেখে তক্তপোষের ওপরই বসল অমিতা। তারপর চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল, 'প্রিয়তমে নাকুট!' পড়া থামিয়ে অমিতা হেসে বলল, 'ঈস্, একেবারে প্রিয়তমে নাকুট।'

তার হাসির কারণটা আন্দাজ করে নাকুটমণি লজ্জিত হয়ে বলল, 'ওই রকমই লেখে দিদি, ওর কোন সরম নেই। বোঝে না এ চিঠি আমাকে অন্য মানুষ দিয়ে পড়াতে হয়।'

অমিতা বলল, 'তাতে কি হয়েছে। কিন্তু প্রিয়তমে কথাটি বড় সেকেলে। ওকে আজকালকার পাঠ শিখিয়ে দিয়ো।' চিঠিটা অমিতা এবার একটানা পড়ে গেল:

'প্রিয়তমে নাকুট, তোমি আমার শত শত প্রেমচুম্বন জানিও। বাচ্চুকে আমার বাচ্চুলালকে আমার বাচ্চুমণিকে শত শত স্নেহ কিসি দিও। শাশুড়ী মাকে আমার প্রণাম জানাইও। নাকুট, তোমাদের জন্যে সদাই আমার প্রাণ কান্দে। মন উদাস হইয়া যায়। কাজ ভালো লাগে না, নাওয়া-খাওয়া ভালো লাগে না, রাত্রে দুই আঁখে ঘুম আসে না। চুপ করিয়া সমুদ্দুরের দিকে চাহিয়া থাকি। আমার চোখ জ্বলিয়া যায়, নাকুট, আমার বুক পুড়িয়া যায়। কত দিনে তোমাকে বুকে করিয়া আমার প্রাণ জুড়াইব।

নাকুট, আমাদের জাহাজ এখন কেপটাউনে আসিয়াছে। এক মাস জাহাজ এখানেই থাকিবে। ওপরের ঠিকানায় চিঠি দিও, তবেই পাইব। আগের মত ঠিকানা ভুল করিও না, চিঠি মারা যাইবে। চিঠি মারা গেলে নাকুট আমিও মারা যাইব। তোমার পত্রমত আরও পঞ্চাশ টাকা পাঠাইলাম, পরে আরও পাঠাইব। এই টাকা হইতে বাড়িওয়ালাকে ভাড়া দিও, তোমার শাড়ি কিনিও, বাচ্চুর জামা কিনিও।

পত্র পাইয়াই পত্র দিও। তোমার পত্র না পাইলে আমি চিন্তায় থাকি। তোমার পত্র পাইলে আমার মনে শান্তি আসে। তাই বুঝিয়া পত্র দিও। আর তোমার চোখে, তোমার গালে, তোমার ঠোঁটে, তোমার বুকে তোমার সব জায়গায় আমার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ প্রেমচুম্বন নিও।

তোমার স্বামী পান্নালাল।'

চিঠি শেষ করে অমিতা স্মিতমুখে নাকুটমণির দিকে তাকাল, 'একেবারে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ। কি সাংঘাতিক।'

নাকুটমণি লজ্জিত হয়ে বলল, 'আর বলবেন না দিদিমণি। কোন সরম নেই। কিন্তু চিঠিটার জবাব যে আপনাকে লিখে দিতে হবে। বহুৎ জরুরী কথা আছে।'

অমিতা বলল, 'আজই লিখতে হবে নাকি?'

নাকুটমণি বলল, 'হাঁ দিদি, তাহলে বড়ই উপকার হয়।'

অমিতা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'আচ্ছা, বোসো তাহলে, আমি এক্ষুণি আসছি।'

ঘরে গিয়ে অমিতা স্বামীকে বলল, 'তুমি ততক্ষণ খবরের কাগজটা দেখ। আমি দু'কথা লিখে দিয়ে আসি।'

চিঠি লিখবার আগে অমিতা অবশ্য নাকুটমণির সম্বন্ধে দু'-চার কথা জিজ্ঞেস করে নিল। নাকুট আত্মপরিচয় দিয়ে বলল, সামনের মাঠটুকু পেরিয়ে যে হিন্দুস্থানী বস্তি, তার একখানা ঘরে তারা থাকে। ভাড়া কম নয়। মাসে মাসে বারটাকা গুণে দিতে হয়। নাকুটমণির সঙ্গে থাকে তার বুড়ো বিধবা মা আর ছেলে বাচ্চুলাল। বছর পাঁচেক বয়স হয়েছে বাচ্চুর। না, তার পর ওর আর কোন ভাইবোন হয়নি। নাকুটমণির স্বামী এক বাঙালী বাবুর কাছে থেকে বাংলা লেখাপড়া শিখেছিল। সেই বাবুই জাহাজে তাকে কাজ জুটিয়ে দেয়। জাহাজে আরো বাঙালীবাবু আছে। তাদের সকলের সঙ্গেই পান্নালালের দোস্তী। লেখাপড়া জানে বলে বাবুরা সবাই তাকে ভালবাসে। খালাসীদের মধ্যে সে সর্দার। খব মান-সম্মান আছে জাহাজে। বস্তির মধ্যে আর কেউ বাংলা পড়তে জানে না। না জানায় নাকুটমণির পক্ষে ভালোই হয়েছে। যদি জানত, তার চিঠি ওরা খলে পড়ত। বস্তির লোকজন ভালো নয়। নাকুটমণির পাশের ঘরে রুক্মিণীর চিঠি প্রায়ই খোয়া যায়। সেদিক থেকে নাকুটমণির ভাগ্য ভালো। তার চিঠি কেউ ছোঁয় না। এত দিন বস্তির লাগা ওই লাল বাড়িটার একটি অল্পবয়সী বউ নাকুটমণিকে চিঠি পড়ে দিত, জবাব লিখে দিত। কিন্তু তার ছেলেপুলে হবে বলে বাপের বাড়ি চলে গেছে। বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ী আছেন। তাঁরা লোক ভালো। কিন্তু তাঁদের দিয়ে তো আর এ-সব চিঠি পড়ানো যায় না, লেখানো যায় না! তাই খুঁজে খুঁজে অমিতাকে বের করেছে নাকুট। আঁচলের খুঁট থেকে একখানা ভাঁজ করা ময়লা কাগজ অমিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে নাকুটমণি বলল, 'চিঠিটা এবার লিখে দিন দিদিমণি।'

অমিতা বলল, 'ওই কাগজে চিঠি লেখে নাকি? কেন আমার ঘরে বুঝি একখানা চিঠি লেখার কাগজও থাকতে নেই? দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি।'

ঘরে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একখানা সাদা কাগজ নিয়ে এল অমিতা। 'বল, কি লিখবে। কি পাঠ লিখবে। সে তো লিখেছে প্রিয়তমে। তুমি লিখবে কি? প্রাণেশ্বর, হৃদয়েশ্বর না প্রাণবল্লভ। কোনটা তোমার পছন্দ?'

নাকুটমণি লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল, 'ও সব কিছু লিখতে হবে না দিদি। ও সব সে না লিখলেও বুঝবে। আপনি শুধু কাজের কথাগুলি তাকে গুছিয়ে লিখে দিন? লিখুন—তার টাকা পেয়েছি, কিন্তু পঞ্চাশ টাকায় কি হবে। গেল

মাসে ছেলের অসুখে অনেক দেনা হয়েছে। তা শোধ করতে হবে। আরো যেন টাকা পাঠায়। এদিকে ঘরের চাল দিয়ে জল পড়ছে। বাড়িওয়ালা বলছে নিজের টাকায় সারিয়ে নিতে। সে এক পয়সাও খরচ করতে পারবে না! বলুন তো দিদি এ কি আবদার। বাড়িওয়ালাকে কি বলব সে যেন জানায়।'

অমিতা একটি একটি করে সব কথা লিখে নাকুটমণিকে পড়ে শোনাল। নাকুটমণি বলল, 'বেশ হয়েছে, আপনার মুসাবিদা ভারি ভালো দিদি। এবার লেফাফায় খামের ওপর ইংরেজীতে ঠিকানা লিখে দিন।' বলে একখানা খাম বাড়িয়ে দিল নাকুটমণি।

অমিতা বলল, 'সে কি নাকুট, তোমার স্বামীর অমন সোহাগভরা চিঠির জবাবে তুমি কি শুধু টাকা-পয়সার কথাই লিখবে? তার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ চুম্বনের বদলে তুমি কি একটি চুম্বনও জানাবে না?'

এ কথায় নাকুটমণি খিল-খিল করে হেসে উঠল। হেসে প্রায় কুটি-কুটি হয়ে পড়ল। তার পর বলল, 'কি যে বলেন দিদি! আচ্ছা লিখুন আপনি যা ভালো বোঝেন, আপনার মন যা চায় তাই লিখে দিন।'

একটু ভেবে নিয়ে বাকি অংশটুকু লিখে ফেলল অমিতা। তার পর নাকুট মণিকে পড়ে শোনাল, 'প্রিয়তম, আমার জন্যে তোমার যেমন বুক পোড়ে, তোমার জন্যেও আমার তেমন মন পুড়িয়া যায়। কিন্তু তোমার নাওয়া-খাওয়া ঘুম বন্ধ হইয়াছে শুনিয়া আমি আরও দুঃখ পাইলাম। তুমি অমন করিও না। দেহকে কষ্ট দিও না। তাহা হইলে আমিও কষ্ট পাইব। বোঝ তো, এক জনের কষ্টে দুই জনের কষ্ট। ক্যাপটেনকে বলিয়া ছুটি লইয়া একবার বাড়ি আসিও। তুমি আমার ভালবাসা আর কোটি কোটি প্রেমচুম্বন জানিও।'

অমিতা বলল, 'কেমন হয়েছে নাকুট? তোমার মনের কথা লিখতে পেরেছি তো? পছন্দ হয়েছে?'

'হয়েছে, দিদি, হয়েছে।' নাকুট আবার হেসে উঠল। তার পর ঠিকানা লেখা খামখানা আঁচলের তলায় লুকিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

সরিৎ অন্য দোর দিয়ে ততক্ষণে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বেরিয়েছে। পান্নালালের চিঠি খানা নাকুটমণির কাছ থেকে চেয়ে রেখেছে অমিতা। সেই চিঠি বের করে একা-একা আর একবার পড়ল। বেশ চিঠি। অমিতার জবাবটাও মন্দ হয়নি। বছর তিনেকের মধ্যে স্বামীকে চিঠি লিখবার কোন

সুযোগ হয়নি অমিতার। ক'বছর ধরে কাছে কাছেই আছে। মাঝে মাঝে দু-এক সপ্তাহের জন্যে বেহালায় বাপের বাড়ি যায়। তখনও দু'জনের মধ্যে চিঠি লেখালেখি হয় না। অমিতার বাবার বন্ধু নিবারণ মুখুয্যের বাড়িতে ফোন আছে। একেবারে পাশাপাশি বাড়ি। সরিৎ অফিস থেকে সেখানে ফোন করলে, নিবারণ বাবুর মেয়ে ইলা নীলারা অমিতাকে ডেকে দেয়। ফোনেই খোঁজ খবর দেওয়া-নেওয়া চলে। কিন্তু আজ পান্নালালকে চিঠি লেখার পর অমিতার মনে হোল ফোনের চেয়ে চিঠিই ভালো। আর সে চিঠি প্রিয়জনের কাছ থেকে যত দূরে বসে লেখা যায় ততই মধুর। এদিক থেকে নাকুটমণি খুব ভাগ্যবতী। কত দূর-দূরান্তর, দেশ-দেশান্তর থেকে তার স্বামী তাকে চিঠি লেখে। আর সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে সেই চিঠি নাকুটমণির হাতে এসে পৌঁছায়। আহা ভেবেও সুখ। অজানা সমুদ্রে চলন্ত জাহাজে বসে রাতের পর রাত জেগে এক জন আর এক জনকে চিঠি লিখছে। চিঠিতে ক'রে হাজার হাজার চুম্বন পাঠাচ্ছে। খালাসী হলে হবে কি; পান্নালালের মনে রস আছে। চিঠির প্রত্যেকটি লাইনে স্ত্রীকে সোহাগ আর ভালোবাসার কথা জানিয়েছে সে। নামটিও বেশ সুন্দর। পান্নালাল। বেশ গালভরা কথা। শুনলেই একটি স্বাস্থ্যবান্ সুপুরুষের মূর্তি যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর কেপটাউন কথাটিও বেশ সুন্দর। কে জানে সমুদ্রের তীরে বন্দরটি হয়তো ভারি অপরূপ দেখতে!

অমিতার হঠাৎ কি খেয়াল হোল। দোতলার চক্রবর্তীদের ছেলে দিলীপ ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। তার কাছ থেকে নিয়ে এল এ্যাটলাসখানা। আফ্রিকার ম্যাপ বের করে মহাদেশের একেবারে দক্ষিণ-প্রান্তে দেখে নিল বন্দরটিকে, ম্যাপে অবশ্য ছোট একটি বিন্দু। কিন্তু আসলে না জানি কত রহস্য ওই বিন্দু টুকুর মধ্যে। কত বিচিত্র রকমের মানুষ। কত বিচিত্র তাদের ভাষা, পোষাক আর আচার। দিনের বেলায় পান্নালাল তাদের ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর রাত্রে জাহাজে বসে নীল সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে বউকে চিঠি লেখে। সমুদ্রের হাওয়ায় চিঠির পাতা ওড়ে। ঢেউয়ের ছিটে এসে চিঠির লেখা ভিজিয়ে দেয়। সমুদ্রচারী পান্নালালের চিঠি সমুদ্রের জলহাওয়া বয়ে নিয়ে আসে। ম্যাপে-আঁকা আটলান্টিক মহাসমুদ্রের দিকে অমিতা কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে রইল।

স্কুলে পড়বার সময় ভূগোলটা মোটেই ভালো লাগতো না অমিতার। কিন্তু

আজ ভারি ভালো লাগতে লাগল। ভাবল দিলীপের কাছ থেকে প্রবেশিকা ভুগোলখানা চেয়ে নিয়ে আফ্রিকার বিবরণটা আর একবার পড়ে নেবে।

দিন দশেক বাদে আবার আর একখানা এয়ার মেলের চিঠি হাতে হাজির হোল নাকুটমণি। হেসে বলল, 'আপনার বহুৎ গুণ আছে দিদি। চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে জবাব এসেছে। এর আগে এত তাড়াতাড়ি কোন দিন সে চিঠি দেয়নি।'

অমিতা লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল, 'বাঃ, তোমার স্বামী তোমাকে চিঠি লিখেছে। আর গুণ হোল বুঝি আমার?'

পান্নালাল লিখেছে :

'আমার নাকুটমণি, আমার মুকুটমণি,

এবার তোমার চিঠি পাইয়া বহুৎ আনন্দ হইল। এই চিঠিতে তুমি তোমার দিল খুলিয়া দিয়াছ। বন্ধ দরজার খিল খুলিয়া দিয়াছ। এ চিঠি বিলকুল নতুন রকম হইয়াছে। তুমিও যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছ নাকুট। আমার দুই দোস্ত তোমার চিঠি লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া পড়িয়াছে। আফশোষ করিয়া বলিয়াছে তাহাদের বউদের চিঠি এত ভালো হয় না। দুই দোস্তকে চিঠি দেখাইলাম বলিয়া রাগ করিও না। বাহির হইতে তাহারা কতটুকুই বা দেখিবে কতটুকুই বা বুঝিবে! আমাদের ভিতরের কথা তাহারা কিছুই টের পাইবে না। আমার নাকুটমণি, তুমি আমাকে যে কোটি কোটি প্রেমচুম্বন পাঠাইয়াছ তাহা আমি লইলাম। হৃদয় পাতিয়া লইলাম। তোমার চুম্বনের সাগরে আমি স্নান করিলাম। আমার সব জ্বালা জুড়াইল।

আমার নাকুটমণি, তুমি আমার অগুন্‌তি প্রেমচুম্বন নিও। আকাশে যত তারা, সাগরে যত ঢেউ, তার চাইতেও বেশি চুম্বন জানিও।'

এর পর সাংসারিক কথা লিখেছে পান্নালাল। ফুরসুৎ পেলেই সে বেশি টাকা পাঠাবে। নাকুটমণি যেন খুব বুঝে-শুঝে হিসেব করে চলে। দিনকাল বড় মাঙ্গা। পাড়াপড়শীর সঙ্গে যেন বিবাদ বিসংবাদ না করে নাকুট। বাড়ি-ওয়ালাকে যেন বুঝিয়ে শুনিয়ে রাখে। পান্নালাল কলকাতায় এসে যা হয় ব্যবস্থা করবে। ছেলেকে স্নেহ আর শ্বাশুড়ীকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি শেষ করেছে পান্নালাল।

কিন্তু অবৈষয়িক কথাগুলি অমিতার মনে বারবার করে ধ্বনিত হতে লাগল। আকাশে যত তারা, সাগরে যত ঢেউ, পান্নালালের চুম্বনের সংখ্যা নাকি তার চাইতেও বেশি। এর উত্তরে নাকুটমণির হয়ে কি লিখবে অমিতা? এ চিঠির জবাব দেওয়া তো বড় সহজ হবে না।

এবার আর সাদা কাগজ নয় বাক্স খুলে নিজের নীল রঙের প্যাডটা বের করল অমিতা। বিয়ের প্রথম বছরে কিনেছিল। এখনো অনেকগুলি পাতা বাকি। বিলেতী এসেন্সের সৌরভে, ন্যাপথালিন আর শাড়ি-ব্লাউজের এক অদ্ভুত মিশ্রিত গন্ধে প্যাডটা মাখামাখি। সেই প্যাডের পাতায় চিঠি লিখতে বসল অমিতা।

নাকুটমণি আপত্তি করে বলল, 'ও কি দিদি, আপনার অত দামী কাগজ কেন খরচ করছেন?'

অমিতা হেসে বলল, 'তাতে কি হয়েছে। কাগজের কি কোন আলাদা দাম আছে নাকুট, চিঠির দামেই তার দাম।'

নাকুটমণি যদি পান্নালালের সঙ্গে কথায় না-ই পেরে ওঠে, প্যাডের দামী রঙীন কাগজ দিয়ে পাল্লা দিক্। চিঠির সবটুকুই যদি কেবল কথায় জানাতে হয় তাহলে এসব আছে কেন?

এক মাস পরে পান্নালালদের জাহাজ লণ্ডন যাত্রা করল। মাঝখানে আফ্রিকা ও ইউরোপের কত যে সাগর-উপসাগর, সহর, বন্দর পার হয়ে এল তার আর সীমা নেই, আর সব বন্দর থেকেই নাকুটমণির নামে চিঠি আসতে লাগল। চিঠির ভাষা প্রায় এক। সব চিঠিতেই সোহাগ জানাবার ধরণ প্রায় একই রকমের। কিন্তু তবু যেন তা পুরোণ হয় না। ভাষা পুরোণ হলেই কি প্রেম পুরোণ হয়, মন পুরোণ হয়, না মনের মানুষ পুরোণ হয়।

দু'একখানা চিঠিতে অবশ্য পান্নালালকে নানা দেশের বর্ণনার কথা জানাবার জন্যে অনুরোধ করল অমিতা। কিন্তু পান্নালালের যেন সে খেয়ালই নেই। কেবল প্রেম আর প্রেম। বাংলা ভাষার কাছ থেকে কেবল ওই একটি জিনিষই শিখেছে পান্নালাল। স্ত্রীকে প্রেমপত্র কি করে লিখতে হয় তাই শুধু জেনে নিয়েছে। আর যেন কিছু তার জানবার প্রয়োজন নেই। প্রেম ছাড়া আর সব কথাই যেন বাহুল্য, সব কথাই অবান্তর।

অমিতা এক একদিন স্বামীকেও জিজ্ঞেস করেছে, 'আচ্ছা, ও-সব জাহাজে কি কি চালান হয়? কোন্ কোন্ রুট দিয়ে চলে এ জাহাজগুলি?'

সরিৎ বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছে, 'কি করে জানব। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরের কি দরকার। আমার তো অত সময় নেই যে ঘরে বসে বসে কেবল জাহাজ আর খালাসীর ভাবনা ভাবব! আমাকে কাজকর্ম করে খেতে হয়।'

অমিতা বলেছে, 'আর আমাকে বুঝি কিছু করতে হয় না।'

পান্নালালের জাহাজ লণ্ডনে এসে পৌঁছল। নাকুটমণি এল চিঠি পড়াতে আর চিঠি লেখাতে।

অমিতা বলল, 'লণ্ডন কোথায় জানো নাকুটমণি?'

নাকুটমণি বলল, 'না দিদি, কি করে জানব?'

আহা বেচারা! ওর স্বামী কত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায় আর ও কিছু জানে না। কিন্তু অমিতা জানে। লণ্ডন কেপটাউনের মত অত অচেনা সহর নয়। লণ্ডনের অনেক কথা সে বইতে পড়েছে। এমন কি লণ্ডন-ফেরৎ এক জন বান্ধবীও আছে তার। বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে এসেছে। তার কাছে শুনেছে সব বিবরণ।

অমিতা বলল, 'দাঁড়াও তোমাকে লণ্ডন সহর দেখিয়ে দিচ্ছি।'

দিলীপের কাছ থেকে আজ আবার এ্যাটলাসখানা চেয়ে নিয়ে এল অমিতা। তার পর ম্যাপ খুলে লণ্ডন চেনাতে বসল নাকুটমণিকে।

নাকুটমণি অবাক হয়ে বলল, 'ওই নাকি সহর। ও তো একটা ফোঁটা।'

অমিতা হেসে বলল, 'ফোঁটা নয় নাকুট। গোটা পৃথিবীর মধ্যে ওটা সব চেয়ে বড় সহর। এখানে এখন থাকে পান্নালাল। এই হোল টেমস নদী। এইখানে তাদের জাহাজ ভিড়েছে। বুঝতে পারছ?'

বুঝতে না পারলেও নাকুটমণি ঘাড় কাত করল।

অমিতা বলল, 'নেবে তুমি এই ম্যাপখানা? নিয়ে নিজের ঘরে টাঙিয়ে রাখবে। আর রোজ ভোরে উঠে দেখবে কোথায় তোমার স্বামী আছে। ভোরে দেখবে, রাত্রে শোবার সময়, ঘুমোবার আগে দেখবে। বেশ হবে, না? তুমি বরং এটা নিয়ে যাও নাকুট। আমি দিলীপকে আর একখানা এ্যাটলাস কিনে দেব।'

নাকুটমণি বলল, 'না দিদি। এ ছবি আপনার ঘরেই টাঙানো থাক।

আমি নিয়ে কি করব? আমি তো দেখতে জানিনে, পড়তে জানিনে, চোখ থাকতেও অন্ধ।'

অমিতা একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'আমি তোমাকে এর পর থেকে লেখাপড়া শেখাব নাকুট! তুমি নিজেই তোমার স্বামীর কাছে চিঠি লিখতে পারবে।'

নাকুটমণি অমিতার ছেলেমানুষিতে না হেসে পারল না, 'সে যখন হবে তখন হবে। আজ আপনি তাড়াতাড়ি চিঠিটা লিখে দিন লক্ষ্মী দিদি! ওদিকে আমার মেলা কাজ।'

মাস দুয়েকের মধ্যে আরো চার-পাঁচখানা চিঠি আসা-যাওয়া করল। তারপর একদিন পান্নালালের চিঠি পড়ে অমিতা লাফিয়ে উঠল, 'নাকুট, কি খাওয়াবে বল?'

নাকুটমণি বলল, 'কি আবার খাওয়াব দিদি! কেন হয়েছে কি?'

অমিতা সোল্লাসে বলল, 'পান্নালাল আসছে নাকুট। এই সেপ্টেম্বর মাসে তাদের জাহাজ এসে পৌঁছবে। আনুমানিক একটা তারিখও দিয়েছে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর।'

অমিতা হঠাৎ উঠে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই দেখ নাকুট, এই হোল সেপ্টেম্বর মাস। এই হোল ছাব্বিশে তারিখ। আজ হোল সবে দোসরা। আর চব্বিশটি দিন মোটে বাকি।'

ভিতরের ঘর থেকে একটা রঙীন পেন্‌সিল নিয়ে এল অমিতা। ছাব্বিশে সেপ্টেম্বরের চার দিকে সযত্নে একটা বৃত্ত টানল। তার পর বলল, 'এই দেখ চিহ্ন দিয়ে দিলাম। এই দিন সে আসবে। তুমি এই ক্যালেণ্ডারখানা নিয়ে যাও নাকুট, আর এই পেন্‌সিলটাও নাও। এক একটা দিন যাবে, আর পেনসিল দিয়ে কেটে-কেটে দেবে। তারপর আসল দিনটিকে আর কাটবে না। বেশ হবে, নিয়ে যাও তুমি।'

নাকুটমণি বলল, 'না দিদি, ও-সব আমি পারব না, ও-সব আপনিই করুন, পড়ুন তো চিঠিখানা কি লিখেছে?'

অন্য সব কথার পর পান্নালাল লিখেছে, 'আমার প্রিয়তমে নাকুটমণি, মুকুটমণি, এবার সত্যই আমার প্রাণ জুড়াইবে। তোমাকে বুকে তুলিয়া লইয়া এবার প্রাণ জুড়াইবে। তোমাকে বুকে তুলিয়া লইয়া এবার আর কলম দিয়া

নয়, মুখ দিয়াই তোমার মুখচুম্বন করিতে পারিব। ভাবিতেও আনন্দে গায়ে আমার কাঁটা দিয়া উঠিতেছে। ত্বই ঠোঁটের একটি চুম্বন কলমের শত কোটি চুম্বনের চাইতেও বেশি নাকুট !'

জবাব লিখিয়ে নিয়ে নাকুটমণি চলে গেল। চিঠিখানা রইল অমিতার কাছে।

দিন কয়েক পরে ক্যালেণ্ডারখানার দিকে তাকিয়ে সরিৎ অবাক হয়ে গেল,

'ও কি, তারিখগুলিকে অমন করে কেটে দিচ্ছ কেন? আর ছাব্বিশ তারিখটিকেই বা অমন একটা গোলাকার আংটি পরিয়ে রেখেছ কিসের জন্যে?'

অমিতা লজ্জিত হয়ে বলল, 'নাকুটমণির সুবিধের জন্যে। ওই দিন ওর স্বামী পান্নালাল কলকাতায় আসছে। নাকুট তো ক্যালেণ্ডার দেখতে জানে-না, এই দাগ দেখে দেখে বুঝবে ক'টা দিন গেল।'

সরিৎ পরিহাসের স্বরে বললে, 'হুঁ' আমার বুঝতে আর কিছু বাকি নেই। ওই খালাসী বেটা আমার সর্বনাশ করবে দেখছি। দূরে থেকেই অমন করে টানছে, কাছে এলে না জানি—'

অমিতা তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখে হাত চাপা দিল, 'ছি ছি ছি, তোমার মুখের কোন আগল নেই। যাও গঙ্গাজল দিয়ে মুখ ধুয়ে এসো।'

সরিৎ অফিসে বেরিয়ে গেলে ক্যালেণ্ডারখানা আর বাইরের ঘরে টাঙিয়ে রাখল না অমিতা, ভিতরে এনে বিছানার নীচে লুকিয়ে রাখল।

এক দিন পাঁচ টাকার একখানা নোট ভাঙাতে এল নাকুটমণি। সঙ্গে ছেলে। নোটের রেজগী দিয়ে অমিতা বলল, 'আর মাত্র ত্বটি দিন বাকি। স্বামী এলে দেখিয়ে নেবে তো, আলাপ করিয়ে দেবে তো? না কি ঘরের মধ্যে দিনরাত লুকিয়ে রাখবে?'

নাকুটমণি হেসে বলল, 'বেটাছেলেকে কি সে ভাবে রাখা যায় দিদিমণি? আপনার ভাবনা নেই, এলেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবো এখানে।'

অমিতা ঘরে গিয়ে জেলি আর বিস্কুট এনে দিল পান্নালালের ছেলের হাতে, তারপর তার গাল টিপে দিয়ে বলল, 'বল তো বাচ্চু, কে আসছে?'

বাচ্চু হেসে বলল, 'মেরে বাপজী।'

ছাব্বিশ তারিখে নয় আরও ত্ব'দিন দেরি করে আঠাশ তারিখে গঙ্গার ঘাটে এসে লাগল পান্নালালদের সওদাগরী জাহাজ। নাকুটমণি কথা রাখল।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা স্বামীকে নিয়ে এল অমিতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। সরিৎ তখনো তার পার্ট টাইম কাজ সেরে আসেনি। অমিতা বাইরের ঘরে ওদের বসতে দিল।

নাকুটমণি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এই আমার স্বামী, আর এই আমাদের সেই দিদিমণি। সব চিঠি লিখে দিয়েছেন। ভারী উপকারী মানুষ।'

অমিতা একবার তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। বড় নিরাশ হয়েছে সে। এই কি সেই দূর দেশের নীল সমুদ্রের নাবিক? নাবিকের নীল পোষাক ছেড়ে পান্নালাল অবশ্য নাগরিকের ধুতি পাঞ্জাবি পরেই এসেছে। কিন্তু এ কি চেহারা! যেমন বেঁটে, তেমনি কালো। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স। ঠোঁটের ওপর বিশ্রী ধরণের বাটারফ্লাই গোঁফ। আজকাল অমন গোঁফ কেউ রাখে না। ভাঙা গালে চোয়াল দুটো জেগে উঠেছে। লম্বা জুলপি গালের অনেকখানি পর্যন্ত নামানো। মোটা-মোটা কালো কালো ঠোঁট দুটি ঠিক একেবারে জোঁকের মত। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চোখ দু'টি লালচে। চাউনিও যেন কেমন তেরছা-তেরছা।

পান্নালাল জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'নমস্কার দিদিমণি। আপনিই তিনি। আসা অবধি নাকুটমণি বলছে আপনার কথা। তা আপনি তো ভারি রস দিয়ে লিখতে পারেন দিদিমণি। হেঃ হেঃ হেঃ।' কৌতুকে হেসে উঠল পান্নালাল।

আরক্ত মুখে অমিতা ফের ওর দিকে তাকাল। পানের ছোপ-ধরা অসমান কয়েকটি দাঁত। হাসলে কুৎসিত দেখায়।

পান্নালাল তার প্রশস্তি শেষ করল, 'সারা জাহাজ সেই রসের চিঠি পড়ে একেবারে মাতোয়ারা। হেঃ হেঃ হেঃ।'

নাঃ, আর সহ্য করা যায় না। লজ্জায় অপমানে কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে অমিতার। ঝাঁ-ঝাঁ করছে। উঠে যেতে পারলে বাঁচে।

একটু বাদে সত্যিই উঠে পড়ল অমিতা, নাকুটমণির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা বোসো। আমি চা নিয়ে আসছি। পান্নালাল বাধা দিয়ে বলল, না দিদিমণি, চা এখন থাক। চা আজ খাব না। তাড়া আছে। একটা পান থাকে তো তাই বরং আনুন।'

অমিতা চা খাওয়ার জন্যে দ্বিতীয় বার অনুরোধ করল না। শক্ত কাঠের মত দাঁড়িয়ে শুকনো গলায় বলল, 'পান নেই, পান আমরা কেউ খাইনে।'

পান্নালাল বললে, 'ও! একটু সুপুরি কি মশলা টশলা দিন, তাতেই হবে।'

অমিতা ঘরে গিয়ে একটা চায়ের প্লেটে ক'রে দু'টি লবঙ্গ আর এলাচদানা পান্নালালের সামনে রাখল। পান্নালাল সেগুলি তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আচ্ছা, আজ চলি দিদিমণি! আর একদিন এসে দাদাবাবুর সঙ্গে আলাপ করব, চা খাব। সপ্তাহ তিনেক জাহাজ থাকবে এখানে। তারপর ফের নোঙর তুলতে হবে।'

পান্নালালরা চলে গেল।

রাত্রে সরিৎ বলল, 'তোমার দিন গোণার পালা কি শেষ হোল? মহাসমুদ্রের মহারাজ কি এসে পৌঁচেছেন?'

অমিতা বলল, 'তুমি বড্ড বাজে বক।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'লোকটি দেখতে কি বিশ্রী, আর মোটেই রুচি নেই। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে জানে না। একটি আস্ত ইতর।'

সরিৎ কৌতুকের ভঙ্গিতে বলল, 'আহাহা, বড়ই আফশোষের কথা তো! তুমি কোথায় প্রতীক্ষা করছ সপ্তডিঙ্গা মধুকর থেকে নেমে আসবে কন্দর্প-কান্তি রূপবান্ রুচিবান্ এক রাজপুত্তুর, তা নয়—।'

অমিতা বলল, 'থামো। সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না।'

পান্নালালের সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল নেই অমিতার। তার কোন খবরও সে শুনতে চায় না। তবু নানা রকম বিশ্রী বিশ্রী সব খবর তার কানে এসে পৌঁছতে লাগল। পান্নালাল রাত্রে মদ খেয়ে এসে বস্তির মধ্যে হল্লা করেছে, বউকে ধরে মেরেছে। ছি ছি ছি, লোকটা এত ইতর। আর এই লোকই কিনা নাকুটমণিকে অত ভালো ভালো চিঠি লিখত। লক্ষ লক্ষ প্রেমচুম্বন জানাত!

নাকুটমণি আর আসে না। সেদিন বিকেল বেলায় অমিতাদের বাড়ির সামনের গলি দিয়ে কোথায় যাচ্ছে, অমিতা দেখতে পেয়ে তাকে হাতের ইসারায় ডাকল, 'নাকুটমণি শোন, আর যে এদিক মাড়াও না। ব্যাপার কি?'

নাকুটমণি দোরের কাছে এসে দাঁড়াল, 'সময় পাইনে দিদিমণি।'

অমিতা বলল, 'এসো, বোসো এসে। তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে কোরো না।'

নাকুটমণি ঘরে এসে বসল, অমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলুন দিদি, কি বলবেন।'

অমিতা একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমাদের নতুন ঝি বিমলা তোমাদের ওই বস্তির মধ্যেই থাকে। সে তোমাদের সম্বন্ধে নানারকম কথা বলছিল ; রোজ রাত্রে নাকি তোমরা ঝগড়া-মারামারি কর। তোমাদের জ্বালায় সারা বস্তির লোক নাকি অস্থির হয়ে উঠেছে ? কি ব্যাপার বল তো ? দেড় বছর বাদে ক'টা দিনের জন্যে স্বামী এসেছে ঘরে। এত গোলমাল কিসের তোমাদের ?'

নাকুটমণি একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আপনি যখন সবই শুনছেন আপনার কাছে কিছু গোপন করব না দিদি ! আপনি জিজ্ঞেস না করলেও সব আমি বলতাম। আমার ওপর আপনার বড্ড দরদ আছে। বড় দুঃখে, বড় অশান্তিতে আছি দিদি। আমার আদমী মানুষ না।'

অমিতা বলল, 'সে কি নাকুট ?'

আরও কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ করে রইল নাকুটমণি। তারপর বলল, 'বড় সরমের কথা দিদি। বিদেশী বন্দর থেকে এবার ও খারাপ রোগ-ব্যামো নিয়ে এসেছে। আমি বলেছি তুই দাবাইখানায় যা। ওষুধপত্তর খেয়ে রোগ সারা। নইলে আমি ছুঁতে দেব না, আমার কাছে শুতে দেব না। কিন্তু ও তা শোনে না, রোজ হামলা করে। ও আমার সর্বনাশ করেছে দিদি ! আমার মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে। বাচ্চুর পর তিন-তিনটে বাচ্চা আমার পেটেই মারা গেল। এবার ওকে আমি আর জায়গা দিচ্ছিনে।'

লজ্জায় মুখ আরক্ত হয়ে উঠল অমিতার। কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বলতে পারল না। একটু বাদে বলল, 'এই নিয়ে তোমাকে বুঝি খব মারে ?'

নাকুটমণি বলল, 'আমিও ছেড়ে দিইনে দিদি, আমিও আচ্ছা করে দু'চার ঘা লাগিয়ে দিই।'

এবার অমিতার হাসি পেল, 'তুমি পারো ওর সঙ্গে ?'

নাকুটমণি বলল, 'পারব না কেন দিদি ! আসলে ও দুর্বলা। ও আবার একটা মরদ নাকি ?'

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় অমিতার সর্বাঙ্গ রি রি করতে লাগল। ছি ছি ছি, এমন কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত, লম্পট, দুশ্চরিত্র পুরুষের কাছে সে নাকুটমণির হয়ে জবাব দিয়েছে ! ভাবতেও মনটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

রাত্রে স্বামীর কাছে অভিযোগ জানাল অমিতা, 'শুনেছ পান্নালালের কীর্তি ? লোকটা একেবারে পাকা বদমাস। ছিঃ !'

সরিৎ বিস্মিত না হয়ে বলল, 'এ আর এমন নতুন কি। ওরা তো ওই রকমই হয়, ঘাটে ঘাটে ওদের ঘট। বন্দরে বন্দরে ওদের প্রিয়া। প্রেমের বীজের সঙ্গে রোগের বীজাণুও তারা বিদেশী নাবিক বন্ধুদের উপহার দেয়। বলে, যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব—'

অমিতা বলল, 'থামো থামো, ছিঃ ! লোকটা যে এত খারাপ আমি ভাবতেই পারিনি। অথচ কি সুন্দর সুন্দর সব চিঠি ! সব মিথ্যে, সব মিথ্যে।'

পান্নালাল যেন শুধু নাকুটমণির সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, অমিতাকেও ঠকিয়েছে।

তিন সপ্তাহ বাদে পান্নালাল চলে গেল। যাওয়ার আগে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু অসুখের অছিলায় অমিতা ওর সামনে বেরোয়নি।

আরও মাস দেড়েক কাটল। পান্নালাল আর নাকুটমণির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল অমিতা, কিন্তু সেদিন সকালে কাজ করতে এসে বিমলা খবর দিল, 'ভালো কথা বউদি, নাকুটমণির অসুখ। ওর উঠে এসে দেখা করার সাধ্য নেই। দুপুর বেলায় আপনাকে দয়া করে যেতে বলেছে। ক'দিন ধরেই বলছে, আমার বলতে মনে থাকে না।'

অমিতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি অসুখ বিমলা ?'

বিমলা মুখের অপরূপ ভঙ্গি করে বলল, 'কি জানি বউদি, জ্বর আরো যেন সব কি কি। ওর সোয়ামী তো মনিষ্যি নয়, এক এক বার আসে আর যত সব জাহাজী রোগ নামিয়ে দিয়ে যায়।'

অমিতা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। একবার ভাবল যাবে কি যাবে না। কিন্তু নাকুটমণির তো কোন দোষ নেই, যত দোষ সেই লম্পট বদমাসটার।

অত করে যখন বলেছে নাকুটমণি একবার দেখে আসাই উচিত। তা ছাড়া দূর তো নয়, এই তো পা বাড়ালেই নাকুটমণিদের বস্তি। দেখে আসাই ভালো।

ঝিকে অমিতা বলল, 'বেশ, আজ দুপুরের পরে এসে তুমি আমাকে নিয়ে যেয়ো বিমলা। আমি তো ওদের ঘর চিনিনে।'

বিমলা বলল, 'আচ্ছা, আমি এসে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব বউদি! কিন্তু ও-সব জায়গায় আপনার না যাওয়াই ভালো।'

না। অমিতা যাবে। গিয়ে নাকুটমণিকে বলে আসবে অমন স্বামীকে যেন নাকুট ছেড়ে দেয়। যেন আর একটা বিয়ে করে তার সঙ্গে ঘর-সংসার করে। তাদের মধ্যে তো ও-সব চলে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বিমলা এসে বলল, 'কই বউদি, চলুন।'

যাওয়ার সময় দু'টি টাকা অমিতা আঁচলে বেঁধে নিল। নাকুটকে ফল-টল খাওয়ার জন্যে দিয়ে আসবে।

ঘুঁটে শুকানো মাঠটার ঠিক উত্তরে ঘিঞ্জি বস্তি। সারি-সারি টালির ঘর। কোন-কোনটির দোরের সামনে চট টাঙানো। দুই সারির মাঝখানে আধ হাত খানেক চওড়া পথ। কোনো কোনো জায়গায় ময়লা জল, কাদা জমে রয়েছে। মাঝে মাঝে এক-একখানা করে ইট পাতা। তার একটিতে পা দিতেই খানিকটা কাদা-জল ছিটকে অমিতার শাড়িতে এসে লাগল। আঁকা-বাঁকা এ-গলি সে-গলির ভিতর দিয়ে বিমলার পিছনে পিছনে অমিতা এসে একখানা ঘরের সামনে দাঁড়াল। ভিতর থেকে দোর বন্ধ। কবাটে চকখড়ি দিয়ে ইংরেজীতে লেখা পান্নালালের নাম। জাহাজে কাজ করে দু'-চার অক্ষর ইংরেজীও শিখেছে খালাসীপুঙ্গব। সেই বিদ্যে ফলিয়েছে নিজের জানলা-কবাটের ওপর। মনে মনে ভাবল অমিতা।

বিমলা ডাকল, 'ও নাকুটমণি, ওঠো, দোর খুলে দাও। বউদি এসেছেন!'

একজন প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক এসে দোর খুলে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি নাকুটের মা। ওর বুখার হয়েছে। আসুন, ভিতরে আসুন।'

ঘরের সামনে এক চিলতে বারান্দা। তার এক পাশে রান্না-বান্নার সরঞ্জাম। আর এক দিকে দু'টি মোরগ আর একটি লোম-ওঠা রোগা নেড়ী

কুকুর। বাচ্চু তাদের মাঝখানে বসে খেলছে। অমিতাকে দেখে কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে উঠল।

ঘরের ভিতর থেকে নাকুটমণি তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'এই চুপ। আসুন দিদিমণি, এখানে আসুন।'

ঘরের ভিতরটা কিন্তু বেশি নোংরা নয়। দেয়ালগুলিতে সদ্য চূণকাম করানো হয়েছে। উত্তর দিকে ছোট ছোট দু'টি জানলা। তার নিচে একখানা তক্তপোষ পাতা, তার ওপর নাকুটমণি কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে। অমিতাকে দেখে শীর্ণ ঠোঁটে একটু হাসল, 'আসুন দিদি, রোগের জন্যে নিজে যেতে পারলাম না। আপনাকে কষ্ট দিয়ে আনলাম।'

অমিতা বলল, 'না না, কষ্ট কি। তুমি এখন কেমন আছ নাকুট?'

নাকুটমণি বলল, 'ভালো আছি। মা ডাক্তার ডেকে এনেছিল। তিনি ওষুধ দিয়েছেন, ইনজেকশন করেছেন। বলেছেন সেরে যাবে। মা, দিদিকে ওই টুলটা দাও বসতে।

নাকুটমণির মা তক্তপোষের তলা থেকে ছোট একখানা টুল বের করে অমিতার দিকে এগিয়ে দিল।

'বসুন দিদি। আপনাকে একটা কাজের জন্যে ডেকেছি। কাজ আর কি। সেই আগের কাজ।' অমিতার দিকে তাকিয়ে নাকুটমণি একটু হাসল। চিঠি লিখে দিতে হবে দিদি। ক'দিন ধরে এসে রয়েছে চিঠিটা। জ্বরে নিজের চৈতন্য ছিল না। শুনতে পারিনি। মা, আমার সেই চিঠিটা কোথায়, দাও তো দিদিকে।'

অমিতা রুক্ষস্বরে বলল, 'থাক থাক ও চিঠি আমার আর দেখবার দরকার নেই, জবাবটাও তুমি আর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ো, নাকুটমণি। আমি পারব না।'

নাকুটমণি ফের একটু হাসল, 'দিদির গোসা হয়েছে। অমন গোসা আগে আগে আমারও হোত। কিন্তু চিঠি আপনাকেই যে লিখতে হবে দিদি! আর কে লিখবে? আমার জানা-শোনা আর তো কেউ নেই।'

কিন্তু চিঠিটা খুঁজে পাওয়া গেল না, তাই নিয়ে নাকুটমণি খানিকক্ষণ মা'র সঙ্গে রাগারাগি বকাবকি করল। তারপর বলল, 'আচ্ছা, মা, তুমি

বাইরে গিয়ে বসো। দেখ গিয়ে বাচ্চু কি করছে। দিদিমণির সঙ্গে আমার কথা আছে।'

মা সরে গেলে নাকুটমণি বলল, 'দিদিমণি, আপনি সেই কলমটা এনেছেন যার থেকে আপনিই কালি বেরোয়? আর সেই নীল রঙের গন্ধ মাখা কাগজ?'

অমিতা বলল, না। আমি তো জানিনে যে 'তুমি ফের চিঠি লেখাবে? আর জানলেও আনতাম না।'

নাকুটমণি ম্লান মুখে বলল, 'ও আচ্ছা দিদি, আপনি বসুন। আমিই আনছি সব জোগাড় করে।'

তক্তপোষ থেকে নাকুটমণি নেমে দাঁড়াল। তারপর বস্তির আর এক ঘর থেকে দোয়াত আর কলম নিয়ে এল সংগ্রহ করে। দোয়াতের কালি একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকেছে। কলমটাও একেবারে অচল।

'কাগজ আমার কাছেই আছে দিদি।'

বিছানার তলা থেকে সেই পুরোন, ময়লা, ভাজকরা কাগজখানা বের করল নাকুটমণি। বলল, 'নিন দিদি, এবার লিখুন।'

ক্লান্তদেহে নাকুটমণি আবার শুয়ে পড়ল।

অমিতা বলল, 'দরকারী কথাগুলি চটপট বল। আমার সময় নেই বেশি।'

নাকুটমণি বলল, 'না দিদি, বেশি লিখতে হবে না আপনার। অল্পই কথা।'

চিঠির গোড়ায় কোন রকম সম্বোধন দিল না অমিতা। নাকুটমণির কথা মত সাংসারিক বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিখে তাকে পড়ে শোনাল।

পান্নালাল যে ঘর সারিয়ে গেছে তা খুব ভালোই হয়েছে। চাল দিয়ে আর জল পড়ে না। সে নিজের হাতে দেয়ালগুলিতে যে চুণকাম করে দিয়ে গেছে তারও ভারি খোলতাই হয়েছে। কোন রাজমিস্ত্রীর হাতের কাজ এমন হয় না। আর যে মর-মর নেড়ী কুকুরটাকে রাস্তার নর্দমা থেকে পান্নালাল তুলে এনেছিল সে মরেনি। একটু একটু করে বেঁচে উঠেছে। লোকজন দেখলে খুব ডাকে। বাচ্চুর সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েছে। মোরগটা আগের চেয়ে অনেক সেরে উঠেছে। মুরগীটা একদিন অন্তর-অন্তর ডিম পাড়ে। জিনিস-পত্রের দাম খুব মাঙ্গা। নিজের খরচ-খরচা বাদে যদি কুলোয় পান্নালাল যেন

দু'-পাঁচ টাকা আরো বেশি পাঠিয়ে দেয়। সবাই বলছে, এই বস্তি নাকি ভেঙে দেবে। এখানে নাকি বাবুদের বেড়াবার বাগান হবে। তাহলে অন্য বস্তিতে চলে যেতে হবে নাকুটমণিকে। তখন নড়া-চড়ায় অনেক টাকার দরকার পড়বে। তার জন্যে আগে থেকেই যেন তৈরী থাকে পান্নালাল।

চিঠি লেখা শেষ করে কাগজখানা ভাঁজ করল অমিতা। তার পর খামের ভিতরে ভরে রাখতে যাচ্ছে, নাকুটমণি বলল, 'আর কিছু লিখলেন না দিদি?'

অমিতা বলল, 'আর আবার কি লিখব?'

নাকুটমণি বলল, 'ওই সঙ্গে আর দু-একটা কথা লিখে দিন দিদি।'

অমিতা অবাক হয়ে তাকাল, 'ও-সব কথা তুমি ফের লিখতে চাও নাকুট? তার চিঠির ও-সব কথায় তুমি এখনো বিশ্বাস কর?'

নাকুটমণি ম্লান হাসল, 'করি দিদি। বিশ্বাস না করলে টিকব কি করে। তাছাড়া এ তো নতুন নয়। আমার বাবাও জাহাজে কাজ করত। তাকে নিয়ে মাকেও এই রকম ভুগতে হয়েছে। এই আমাদের নিয়ম। জাহাজের রোজগার যারা খায় তাদের এ সব সহ্য করতে হয় দিদি! তাকে লিখে দিন আরো দু'-একটি কথা। জায়গা আছে তো?'

জায়গা আছে। কিন্তু অমিতার মনে আর কোন কথা যে নেই!

অমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে নাকুটমণি মৃদু হাসল, 'আপনার বুঝি সরম হচ্ছে দিদি। আচ্ছা, আমি বলি আপনি লিখে যান।'

নাকুটমণি খুব আস্তে আস্তে, অমিতাকে লিখবার সময় দিয়ে বলে যেতে লাগল; 'আমার প্রিয়তম, তুমি আমার শত শত প্রেমচুম্বন নিও। তুমি বাড়ি আসিবার পর মাঝে-মাঝে আমাদের যে ঝগড়া হইয়াছে সে কথা ভাবিয়া মন খরাপ করিও না। বোঝ তো, অসুখ-বিসুখ হইলে সাবধানে থাকিতে হয়। এখন তুমি বড় সহরে আছ। বড় ডাক্তার দেখাইয়া তোমার অসুখ সারাইয়া লইও। আর আমার মা যে কবচটা তোমাকে দিয়াছেন তাহা সব সময় পরিয়া থাকিও, তাহা হইলে রাক্ষুসীরা আর তোমাকে ছুঁইতে পারিবে না, ডাকিনীরা ফের হাতছানি দিয়া ডাকিয়া লইতে পারিবে না।

মনে থাকে যেন তুমি আমার মা'র পা ছুঁইয়া শপথ করিয়াছ, আমার গা ছুঁইয়া শপথ করিয়াছ, আমাদের ছেলের মাথায় হাত রাখিয়া শপথ করিয়া গিয়াছ। সে শপথ আমি তোমাকে করিতে বলি নাই, তুমি নিজের ইচ্ছায়

করিয়াছ। নিজের মনের জোরে করিয়াছ। তাহা যেন মনে থাকে। যাইবার সময় তুমি আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়াছ, সেই কান্না আমার বুকের মধ্যে গিয়া রহিয়াছে। প্রিয়তম, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি। তোমার দোষ নয়, লোণা সমুদ্দুরের দোষ। সে-ই মানুষের রক্তকে লোণা করিয়া দেয়। রক্তে তুফান তোলে। কিন্তু তুমি মা কালীর নাম স্মরণ করিও, সব তুফান থামিয়া যাইবে। তুমি আমার মুখ মনে করিও, সব তুফান থামিয়া যাইবে। তুমি আমার কথা মনে রাখিও, প্রিয়তম, আমি যে কেবল তোমার মুখের দিকেই তাকাইয়া আছি, সেই কথা মনে রাখিও। আর মুখ ভরিয়া, তোমার দুই ঠোঁট ভরিয়া আমার সব প্রেমচুম্বন নিও।'

চিঠি শেষ করিয়া অমিতার দিকে তাকাল নাকুটমণি, 'লিখে নিয়েছ দিদি?'

অমিতা একটু কাল স্তব্ধ হয়ে থেকে নাকুটমণির দিকে তাকাল, তারপর ভাবার্দ্র গলায় বলল, 'হ্যাঁ নিয়েছি, নাকুট! এমন চিঠি স্বামীর কাছে আমিও লিখতে পারতাম না।'

'কি যে বল দিদি!

বলতে বলতে সেই প্রথম দিনের মতই আজও নাকুটমণি খিল-খিল করে হেসে উঠল।

শেফালী

বাজারের লম্বা ফর্দ নিয়ে সকালেই দাম্পত্য কলহ শুরু হয়েছিল ; সদর দরজায় আগন্তুকের গলা শুনতে পেলাম 'কল্যাণবাবু আছেন নাকি, কল্যাণবাবু ?'

যথাসাধ্য মনের বিরক্তি চেপে সৌজন্যে গলা ভিজিয়ে বাইরের ঘরে এসে বললাম, 'কে ফণিবাবু নাকি, আসুন আসুন।'

আমন্ত্রণটা আন্তরিক নয় কিন্তু ফণিবাবু সে কথা বুঝলেন না, কিংবা বুঝেও নিজের গরজেই না বুঝবার ভান করলেন। দরজা খোলাই ছিল। তিনি একেবারে সোজা ভিতরে এসে তক্তপোষখানার ওপর চেপে বসলেন, বললেন, 'তারপর খবর টবর কি ?'

বললাম, 'খবরের মধ্যে বাজারে যেতে হবে। এক্ষুণি বেরোচ্ছিলাম।

ফণিবাবু বললেন, 'তাড়াতাড়ি বিদায় করতে চাচ্ছেন বুঝি ! বেশিক্ষণ বসব না। আমারও বাজারটাজার আছে তা সেরে টিউশনিতে বেরোতে হবে। একটা দরকারী কথার জন্যে এসেছি। সেটুকু সেরেই চলে যাব।'

ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না-না-না সেকি ! বসুন বসুন। বাজারে যাওয়ার মধ্যে কি আছে। যা মাছ তরকারির দাম, তাতে বাজারে কি আর যেতে ইচ্ছে করে মশাই, নেহাতই বাধ্য হয়ে যেতে হয়।'

ঘরে এসে দেখলাম পকেটে একটি মাত্র সিগারেটই আছে। এনে দিলাম ফণিবাবুর হাতে। স্ত্রীকে ডেকে চা-ও করতে বললাম।

ফণিমোহন দাশগুপ্ত আমাদের পাড়ার হাইস্কুলের একজন সিনিয়ার টিচার। আর ওই স্কুলেই আমার ছেলে-ভাইপোরা পড়ে। তাই ওঁকে একটু খাতির-টাতির করি। ফণিবাবু সিগারেট নিলেন না, নিজের পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরালেন, বললেন, 'সিগারেট আপনি খান। ওতে আমার

জমে না। কিন্তু বড়ই দরকারে পড়ে এসেছি, কল্যাণবাবু, গোটা পনেরো টাকা ধার দিতে পারেন নাকি, অন্ততপক্ষে গোটা দশেক ?'

ছেলেদের মাষ্টার হলেও আবদারের একটা সীমা আছে। আমি তো সামান্য মাইনের কেরানি। যারা তিন চার শো টাকা মাইনে পায় তারাও তো মাসের এই সাতাশ তারিখে দশ পনেরো টাকা কোনো প্রতিবেশীকে ধার দিতে পারে না। ভিতরটা কালো হয়ে গিয়েছিল, তবু ঠোঁটে হাসির আলো টেনে এনে বললাম, 'বড় হাত টানাটানি যাচ্ছে ফণিবাবু, কিছু মনে করবেন না। কিন্তু ব্যাপার কি, হঠাৎ এত টাকার দরকার পড়ল কিসে আপনার। বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ আছে নাকি ?'

ফণিবাবু বললেন, 'আরে মশাই, ওই শেফালীটার জন্যে।'

বছর পঞ্চাশেক হয়েছে ফণিবাবুর বয়স। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। কপালে ত্রিবলী, দুই গালে দুই গহ্বর। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'শেফালী' আবার কে ?

ফণিবাবু নিস্পৃহভাবে বললেন, 'একটি মেয়ে। আমাদের স্কুল থেকেই এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। ফী-এর টাকা জুটছে না। সেই টাকা এখন জুটিয়ে দাও! আজকালকার দিনে ফী-এর টাকা মানুষ কবার জোটাতে পারে বলুন তো! চেয়ে চিন্তে, ধারকর্জ করে একবার যদি বা জুটিয়ে দিলাম তা তিনি—'

অমিতা দু কাপ চা আমাদের সামনে নামিয়ে রেখে ভিতরে চলে গেল। তার মুখ অপ্রসন্ন। ফণিবাবুর আসার উদ্দেশ্য তারও কানে গেছে।

পাশের ঘর থেকে ছেলেদের পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। একজন পড়ছে আর্যজাতির ইতিহাস আর একজন খাদ্যের ভিটামিন তত্ত্ব।

ফণিবাবুর দিকে চেয়ে বললাম, 'সে টাকাটা খোয়া গেল কি ক'রে।

ফণিবাবু একচুমুকে অনেকখানি চা গিলে বললেন, 'খোয়া ঠিক যায়নি! কিন্তু সে অনেক কথা মশাই। আপনার আবার বাজারের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, 'তা হোক না। বলুন না ব্যাপারটা কি ?'

'তাহলে গোড়া থেকেই শুনুন।' ফণিবাবু স্যাণ্ডালের ভিতর থেকে গোড়ালিতে কাদা মাখা দু'খানি পা তক্তপোষের ওপর তুলে নিয়ে শক্ত হয়ে বসে শুরু করলেন, 'শেফালী চক্রবর্তীকে আমি এই বছর দুই ধরে চিনি।

আমাদের বিদ্যাপীঠেরই মেয়ে। অবশ্য গার্লস সেকশনে কত মেয়েই তো পড়ে। সকলের সঙ্গে আলাপ হওয়ার কথা নয়, আলাপ হয় না। তবে ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসের যারা ভালো ছাত্রী, যারা ফার্স্ট সেকেণ্ড স্ট্যাণ্ড করে তাদের নাম মাঝে মাঝে কানে যায়। আমাদের স্কুলে মেয়েদের ক্লাস হয় সকালে আর ছেলেদের দুপুরে, মেয়েরা মেয়েদের পড়ায় আর আমরা ছেলেদের ঠ্যাঙাই। কিন্তু তা হলে হবে কি, সেক্রেটারির ইচ্ছামত কোশ্চেন একই হাতে করতে হয়। তবে খাতা দেখার সময় মেয়েদের পরীক্ষার খাতা আমরা দেখি আর আমাদের ছেলেদের খাতা দেখেন মেয়েরা। যে যত পারি নম্বরের বেলায় কষাকষি করি। এতে মশাই অনেক অসুবিধে, অনেক ঝগড়াঝাটি লাগে। সে থাকগে। হোক এবেলা ওবেলা স্কুল তো একই। তাই সব ক্লাশের ভালো ছাত্রীদের নাম আমাদের কানে এসে পৌঁছায়। কিন্তু শেফালী চক্রবর্তীর নাম আমার কানে তেমনভাবে আসেনি। ছাত্রী হিসাবে শেফালী মাঝারি। কোনো রকমে পাশ টাশ করে ক্লাসে ওঠে।

যাই হোক নাম শোনবার আগে ওকে আমি চোখেই দেখলাম প্রথমে। সেদিন গার্লস সেকশন ছুটি হয়ে গেছে। বয়েজ সেকশন আরম্ভ। এগারটা বাজে বাজে। মাষ্টার মশাইরা এখনো এসে পৌঁছোননি। আমি একটু আগে আগে এসে লাইব্রেরী গুছোচ্ছি। দেখি দরজার কাছে একটি মেয়ে দাঁড়ানো। এগুচ্ছে আর পেছোচ্ছে। বললাম, 'কে হে ওখানে?'

'আমি'।

দরজার আড়াল ছেড়ে সরে এল মেয়েটী। তা বয়স হয়েছে ওর। ষোল পার হয়ে গেছে বলেই মনে হল। ছিপ্‌ছিপে লম্বা। গায়ের রঙটা গৌর বলা চলে না, ফ্যাকাশে। যতটা লম্বা, গায়েপায়ে ততটা হয়নি। বয়স অনুযায়ী বাড় না হলে দেখতে ভালো লাগে না। বললাম, 'কি চাও তুমি. এসো ভিতরে এসো।'

মেয়েটী সাহস পেয়ে এবার আলমারির কাছে এসে দাঁড়াল। দেখলাম চেহারাটা ভালোই। দিব্যি টানা টানা নাক চোখ। পাতলা ঠোঁট। মুখের গড়নটুকু ভারি মিষ্টি। সুন্দরী, হ্যাঁ রীতিমত সুন্দরী মশাই। এই যদি কোনো বড়লোকের ঘরের মেয়ে হোত, রূপসী বলে নাম ছড়িয়ে পড়ত পাড়ায়। কিন্তু ওর তো তা পড়বার জো নেই, রূপ থাকলে কি হবে, স্বাস্থ্য

নেই, মানানসই শাড়ি গয়না নেই। এক রাহুর গ্রাসেই চাঁদ অস্থির আর ওকে যেন দুই রাহুতে গ্রাস করেছে। স্বাস্থ্য নেই আর নেই সচ্ছলতা। পরনে পুরোনো একখানা মিলের শাড়ি। হাতে দু'গাছি কালো রঙের প্লাষ্টিকের চুড়ি। কি বলব মশাই দেখে ভারি মায়া হল। 'বেলা' বলে আমার একটী ভাগ্নী ছিল। মা বাপ নেই। আমাদের সংসারেই থাকত। দেখতে দেখতে ডাগর হয়ে উঠল। গরীবের সংসার। কাচ্চা বাচ্চা মেলাই জন্মেছে। কি করে পার করব, কি করে পার করব তাই ভাবছি, টাইফয়েড এসে পার করে নিয়ে গেল। আমি চশমা কপালে তুলে আরো ভালো করে চেয়ে দেখলাম অনেকটা সেই বেলার মুখের আদল আসে। বেঁচে থাকলে অত বড়ই হোত।

কনে দেখার মতো অমন খুটে খুটে দেখছি বলে মেয়েটী একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল, আমি ওর লজ্জা ভাঙবার জন্যে বললাম, তুমি কি চাও মা।'

তাতে যেন ও আরো লজ্জায় ভেঙ্গে পড়ল। আজকালকার ষোল-সতেরো বছরের মেয়েদের তো মা ডাক শোনার অভ্যেস নেই। না কচি ছেলের মুখে না বুড়ো মানুষের মুখে। আমাদের মা ঠাকুরমারা ওই বয়সে অন্তত দু'তিনটী সন্তানের মা ডাক শুনে ছাড়ত। সে যাকগে। মেয়েটী কোনো— রকমে বলল, 'আমি একখানা বই চাই।'

বললাম, 'কি বই?'

মেয়েটী বলল, 'ওই রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'খানা'

তখন লাইব্রেরিতে দু'একখানা করে কিছু বই সবে আমরা আনাতে শুরু করেছি। সে বই ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলি করা হয় না। আমরা টিচাররাই অবসর পেলে নাড়াচাড়া করি।

বললাম, 'এ বই তো বাইরে দেওয়া হয় না। তাছাড়া এ কি তুমি বুঝবে?'

ও মৃদু হেসে 'বলল, বুঝব। রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক বই আমি পড়েছি। বুঝতে মোটেই কষ্ট হয়নি।'

মোটেই কথাটায় আমি হাসলাম। বললাম, 'কষ্ট হবে আরো বড় হলে, যখন আরো বেশী বুঝবে।'

মেয়েটি বলল, 'আমাকে একদিনের জন্যে যদি দেন কালই আমি ফিরিয়ে এনে দেব।'

আলমারি খুলে বইখানি আমি ওর হাতে দিয়ে বললাম, এ বই এক দিনে শেষ করা যায় না। তুমিও কোর না। ধীরে সুস্থে পড়। আমি এর থেকে ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করব।

আমার কথায় মেয়েটি হাসল। আমিও নিজে হাসলাম। সতেরো বছর মাষ্টারি করে করে এখন এই সব বুলিই বোরোয় মুখ দিয়ে। তবুতো ভালো ভয়েস চেঞ্জ কিংবা চেঞ্জ অব ন্যারেশন জিজ্ঞেস করবার ওকে ভয় দেখাইনি।

বই নিয়ে মেয়েটি চলে যাচ্ছিল, আমি ওকে ডেকে বললাম, 'তোমার নাম কি?'

ও বলল, 'শেফালী, শেফালী চক্রবর্তী।'

'কোন্ ক্লাসে পড়?'

'ক্লাস নাইনে।'

আজকালকার ওর বয়সী মেয়েরা কলেজেরও দু'এক ক্লাস ডিঙিয়ে যায়। ক্লাস নাইনে যারা পড়ে তারা অনেকেই ফ্রক পরে। একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম ওরা এসেছে চাঁদপুর থেকে। সেখানকার স্কুলে পড়ত। পাকিস্তানী গোলমালে বছর দুই পড়া বন্ধ ছিল। তা ছাড়া বাপও মারা গেছেন বছর দেড়েক। দাদা বেকার ছিল এতদিন। মাত্র বছরখানেক হলো একটি সাপ্তাহিক কাগজের অফিসে চাকরি পেয়েছে। আর টিউশনি করে।

'তোমরা কোথায় আছ?'

'কাছেই, ফুলবাগান লেনে।'

এমনি করেই আলাপ।

দিন তিনেক বাদে গোরা বইটা ও ফেরৎ দিয়ে গেল। বই থেকে যে সব কথা জিজ্ঞেস করলাম তার মোটামুটি সদুত্তর ও দিল। খুশিই হলাম। কিন্তু টার্মিনাল পরীক্ষায় ওর ইংরেজি খাতা দেখে খুশি হতে পারলাম না। পদে পদে বানান আর ব্যাকরণের ভুল। অতি কষ্টে পাশের নম্বর পেল। আমি ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি, ইংরেজি তোমার এত খারাপ হল কেন? একটা ভাষা যারা ভালো জানে আরেকটা ভাষাও তো তাদের জানবার কথা।'

ও অপরাধের ভারে মুখ নিচু করে রইল। বললাম, 'অঙ্কে পেয়েছ কত?'

'পঁচিশ।'

বললাম, 'সর্বনাশ, তুমি পাশ করবে কি করে? তোমার দাদা কি তোমাকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেয় না?'

শেফালী বলল, 'চাকরি আর টিউশনি করে দাদার সময় থাকে না। রবিবারও তার অফিস থাকে।'

চাকরি আর টিউশনি আমিও করি। নিজের ছেলেমেয়েদের একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেওয়ার আমিও সময় পাইনে। বেশি বয়সে কতকগুলি অপোগণ্ড জন্মে গেছে মশাই। কি যে গতি হবে কে জানে? যাকগে। শেফালীকে বলে দিলাম, 'রবিবার দুপুরের পরে বইপত্তর নিয়ে যেয়ো আমার ওখানে। দেখব তোমার কোথায় কি অসুবিধে। আমার বাসা চেন তো? বেনেপুকুর লেনে।'

নম্বরটাও বলে দিলাম।

রবিবার ঠিক একটার পরই একগাদা বই নিয়ে শেফালী হাজির। খাওয়া-দাওয়ার পর কোলের ছেলেপুলেগুলিকে ঘুম পাড়িয়ে আমার স্ত্রী আমার শিয়রের কাছে বসে মাথার পাকা চুল বেছে দিচ্ছে, শেফালীকে দেখে সে মোটেই খুশি হল না। ওর সাক্ষাতেই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি আশ্চর্য, রবিবারেও কি তোমার পাঠশালা বন্ধ থাকবে না?' বলে সে তক্তপোষ থেকে নেমে একটু রাগ ক'রেই চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

শেফালী অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'আমি তাহলে আরো একটু পরে আসব মাস্টারমশাই, এখন যাই।'

বললাম, 'না-না-না বসো।'

শেফালী খুশি হয়ে তক্তপোষের এক কোণায় উঠে বসল।

ওকে সবে এক প্যাসেজ ট্রানশ্লেসন দিয়েছি, বাইরে থেকে আর একটি ছেলের গলা শুনলাম, 'মাষ্টারমশাই আসব?' জ্বালালে। 'কে তুমি হে বাপু?'

ছেলেটি তার ভীরু মুখখানা ততক্ষণে ভিতরের দিকে বাড়িয়ে ধরেছে, বলল, 'আমি মাস্টারমশাই।'

'সুবোধ?'

'হ্যাঁ! আসব মাস্টারমশাই?'

ওর বগলেও বই খাতা। কি আর করি। মুখ ভার করে বললাম, 'আয়।'

মুখে কচি গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। গায়ে একটা ময়লা শার্ট। পরনে হাফ প্যান্ট। বয়স বছর সতেরোর কম হবে না। হাফপ্যান্ট ছেড়ে ধুতি পরবারই বয়স হয়েছে। কিন্তু বয়স হলেই তো সব হয় না।

সুবোধ এসে তক্তপোষের আর এক কোণায় বসল। ঘরখানা আমাদের একসঙ্গে শোবার আর বসবার। তক্তপোষখানাও তাই। কি করব মশাই, দেখেছেন তো দিনকাল। আজকাল একখানা ঘরের ভাড়া আগেকার দিনের গোটা একটি বাড়ি ভাড়ার সমান। আর আগেকার একখানা খাটের দামে আজকাল একখানা আকাঠার তক্তপোষ কিনতে হয়। এদিকে মশাই মাস্টারীর মজুরীতো ঠিক তাই আছে। যা দু'এক টাকা বেড়েছে তাতে দুখানা ঘর ভাড়া করা যায় না, দুখানা তক্তপোষ কেনাও সাধ্যে কুলোয় না।

ওরা দুজনে মুখোমুখিই বসল, কিন্তু মুখ নিচু করে। লজ্জা নয়, বিদ্বেষের ভাবটাই বেশি।

সুবোধ দাসও আমাদের স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। বসন্ত দাস আমার খুড়তুতো ভাইয়ের অফিসের বেয়ারা। তার ছেলে। বসন্তের সখ হয়েছে ছেলেকে ইংরেজী স্কুলে পড়াবে। গরীবের ঘোড়ারোগ মশাই, পায়তো ভাতা-টাতা নিয়ে টাকা পঁয়ত্রিশেক। আর কি টুকটাক করে জানিনে। ওই রোজগারের গুটি তিনেক ছেলেমেয়ে আর নিজেরা স্বামী-স্ত্রী জন পাঁচেকের খরচ কি করে চালায় তা ভগবানই জানেন। ইন্টালীর শম্ভুবাবু লেনে থাকে আমার খুড়তুতো ভাই মণিমোহন। বছর কয়েক আগে বসন্ত তার চিঠি আর ঐ সুবোধকে নিয়ে এসে হাজির। কি ব্যাপার! না সুবোধ পড়বে আমাদের স্কুলে তার সুবিধে সুযেগে করে দাও।

আমি বসন্তকে চিনি, তার অবস্থাও আমার ভাল করে জানা আছে। বললাম, 'বসন্ত পড়াশোনার যে আজকাল বেজায় খরচ। পারবে চালাতে?'

বসন্ত বলল, 'বাবু, না পেরে করব কি। দাস হলে হবে কি, কায়েত আমরা খারাপ নই। আগে আগে অনেক ঘোষ-বোসের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এখন সে সব অত্মীয়-কুটুম্বরা চিনতে পারে না। না খেয়ে মরি সে-ও ভালো, সুবোধকে আমি বেয়ারাগিরি করতে দেব না। ছেলে আমার ওই একটিই। আর সব মেয়ে, বিয়ে দিলেই পর হয়ে যাবে।

কিন্তু পুরুষ ছেলে হয়ে ও যদি লেখাপড়া না শেখে, বুদ্ধিশুদ্ধি না হয়, ও-ও তো আর আপন থাকবেনা মাস্টারমশাই।'

তাই সুবোধকে চেষ্টা-চরিত্র করে ভর্তি করে দিলাম। প্রথমে হাফ ফ্রি-শিপ, তারপরে ফ্রি-শিপই পেল। কিন্তু স্কুলের কয়েকটাকা মাইনে থেকে রেহাই পেলে কি হবে। আরো খরচ তো আছে। ওর বাবা যা আনে তাতে ওদের পেটের খোরাকই যে হয় না। বয়সের ছেলে কিন্তু বয়সের যোগ্য খোরাক যে পায়না তা ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। সুবোধ সুন্দর নয়। গোলগাল মুখ, দাঁতগুলি উঁচু উঁচু, চোয়াড়ে চেহারা। কিন্তু স্বাস্থ্যের তো একটা আলাদা সৌন্দর্য্য আছে মশাই। জোয়ান বয়সের চেকনাই থাকে বলে। সেই চেকনাইটুকুও নেই সুবোধের। হাড়িডসার চেহারা। মাথায় প্রায় শেফালীরই সমান। দু-এক আঙুল লম্বা হবে কি হবে না। তবে সুবোধ পড়াশুনোয় ভালো। কোনোবার সেকেণ্ড ফার্ষ্ট ছাড়া হয় না। অঙ্কে, ইংরেজিতে সমান চৌখোশ। মনেমনে ওর ইচ্ছা ফার্স্ট ডিভিশনে তো যাবেই। ছোটখাট একটা বৃত্তিও পাবে। সেকেণ্ড ক্লাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার তোড়জোড় শুরু করেছে। ওকে আমার বলে দিতে হয়নি। ছুটির দিনে বই পত্তর নিয়ে আমার বাসায় আসা আরম্ভ করেছে। কোনো কোনো দিন পত্রপাঠ বিদায় দিই, কোনো কোনো দিন বসতেও বলি। আজও বসতে বললাম।'

দুজনেই দুজনের দিকে তাকাল, যেন পরস্পরের শরিক ওরা, প্রতিদ্বন্দ্বী! শরিক তো বটেই। আমার সামান্য স্নেহ আর সৌজন্যের ভাণ্ডার ওদের একজনের পক্ষেই যথেষ্ট নয়, তাতে আবার দুজন এসে জুটেছে! মুখ দেখে ওদের মনের কথাটা আমি টের পেলাম।

পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, 'অমন মুখ গোমড়া করে রয়েছ কেন? তোমরা তো একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়। কেবল সময়টা আলাদা।'

সুবোধ বলল, 'জানি, মাস্টারমশাই।'

শেফালী বলল, 'জানি, মাস্টারমশাই।

কেউ কারো সঙ্গে কথাও বলল না। স্কুলে কারো সঙ্গে কারো সাক্ষাৎ হয় না, কিন্তু আমার বাসায় সপ্তাহে দু একদিন করে ওদের প্রায়ই দেখা হতে লাগল। একজন আর একজনের প্রতিদ্বন্দ্বী। একজনের সঙ্গে আর একজনের ঘোর প্রতিযোগিতা। শেফালী পড়াশুনোয় ওর সঙ্গে পেরে ওঠে না। কিন্তু

সেবায় যত্নে ওর সঙ্গে পাল্লা চালায়। দু 'এক মাসের মধ্যেই আমার স্ত্রীরও চিত্তজয় করল। যে দিন আসে তার কোলের ছেলে টেনে কোলে নেয়, হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে করে। আমার স্ত্রী সুবোধের সামনেই একদিন শেফালীর হয়ে সুপারিশ করে বলল, 'মেয়েটি সত্যিই ভালো। গেরস্থ ঘরের সুবিধে অসুবিধে বোঝে। ওকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিও। পড়াশুনোয় ভালো হ'লেও করবে কি, বেচারা বাড়িতে পড়বার একেবারেই সময় পায় না। ঘরে রোগা বিধবা মা, মাসের মধ্যে পনেরো দিন বিছানাধরা। দুরন্ত চার পাঁচটি ভাইবোন, তাঁদেরও অসুখবিসুখ লেগেই আছে। দাদাটি সেই সকালে নাকে মুখে দুটি গুজে বেরোয় আর রাত বারোটায় ফেরে। সংসারের সব ঝামেলা ঝক্কি পোয়ানে হয় ওই একফোঁটা মেয়েকে। ও পড়বে কখন বলো।'

একথা শুনে সুবোধ হিংসায় জ্বলে। নিজের গুণ সে নিজেই গায়, 'আমিও কি সময় পাই মাস্টারমশাই? বাড়ির কাজকর্ম আমাকেও দেখতে হয়। তাছাড়া একফোঁটা জায়গা নেই যে বসে এক ঘণ্টা পড়ি। কানের কাছে গোলমাল চেঁচামেচি লেগেই আছে। সব কখানা বই আজও কিনতে পারিনি। তবুও তো—'

তবুও সুবোধ ক্লাসে ফার্স্ট হয়। এই অহঙ্কারটুকু ভাষায় না করলেও ভঙ্গিতে গোপন করে না সুবোধ। আর ওর এই গর্ব শেফালীর আত্মসম্মানকে আঘাত করে। একজন বেয়ারার ছেলে হয়ে ও ক্লাসে একেবারে অদ্বিতীয় জায়গা দখল করে তা যেন শেফালীর সহ্য হতে চায় না। শেফালীরও সব বই নেই। আমি বলি যে অদলবদল করে পড়ো তোমরা। কিন্তু ওরা ক্লাসের আর সব ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বই চেয়ে পড়ে তবু একজন আর একজনকে বই দেয় না, কি নোটখাতা দিয়ে সাহায্য করে না। ওদের এই অসযোগে আমি মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ধমক দিই, এসব কি কাণ্ড তোমাদের? একই জিনিস আমি দু'বার করে লিখিয়ে দিতে পারব না বাপু। আমার সময়ের দাম আছে।'

ধমক খেয়েও ওদের জেদ ভাঙলো না। বরং জেদাজেদি বেড়েই চলল। এ্যানুয়াল পরীক্ষার সব বিষয়েই ফার্স্ট হল সুবোধ। কেবল বাংলায় নম্বর তিনেক কম পেল শেফালীর চেয়ে। কিন্তু সুবোধ বলল, 'তা হতেই পারে না। আমি বায়াত্তুর পাব কেন সেকেণ্ড পেপারে? আমার আরো বেশি নম্বর ওঠার কথা। আমাদের খাতা ফের এগজামিন করুন।'

হেডমাস্টারমশাই ওর জেদ দেখে নিজে দেখলেন খাতা। চুলচেরা বিচারে সুবোধেরই জয় হল। শেফালীর চেয়ে এক নম্বর দু' নম্বর নয়, পাঁচ নম্বর বেশি পেল সে। আর বাংলা পাঁচের মতো মুখ করে শেফালী কাঁদো কাঁদো হয়ে ঘরে ফিরে গেল।

ফার্স্ট ক্লাসে উঠে ওদের প্রতিযোগিতা আরো বাড়তে লাগল। শেফালী আমাকে একদিন ওদের বাসায় চা খেতে বলল। কেবল চাই নয়, লুচি হালুয়া করেও খাওয়াল। আমি বাসায় এসে গল্প করলাম স্ত্রীর কাছে। সে গল্প তার মুখ থেকে সুবোধের কানে গিয়ে পৌঁছিল। ঘর তো নয়। দেব লেনের একতলায় অন্ধকার একটু খোপ। কিন্তু সেই ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে সুবোধ আমার জন্যে নামজাদা মিষ্টির দোকান থেকে আধসের রাজভোগ নিয়ে এল।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, এ সব কি সুবোধ! এ কিন্তু তোমাদের বড়ই বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এমন করলে আমি তোমাদের কাউকেই আমার ত্রিসীমানায় ঘেষতে দেব না।'

সুবোধ হাসিমুখে চুপ করে রইল। ওর মনে তৃপ্তির অন্ত নেই। ধমকালে হবে কি? একটি মেয়ের সঙ্গে ওর পৌরুষের পাল্লা। সে পৌরুষ কি শুধু বাংলায় পাঁচ নম্বর পেয়েই খুশি থাকতে চায়?

যাক্‌গে মশাই, আপনার বাজারের বেলা হয়ে যাচ্ছে। ওদের আরো অনেক জেদ, রেষারেষি, হিংসাবিদ্বেষের ফিরিস্তি আর বাড়াব না শুধু একটা ঘটনার কথা বলছি। পুলিসের কি একটা লাঠিচার্জের ব্যাপার নিয়ে আমাদের স্কুলে ষ্ট্রাইক হয়ে গেল। সেক্রেটারি সরকারপক্ষের লোক। আর নিমকের খাতিরে আমরা কয়েকজন বুড়ো বুড়ো ভীষ্ম, দ্রোণ তাঁরই পক্ষে। পুরোপুরি ষ্ট্রাইকটা আমরা হতে দিলাম না। কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে ক্লাস চালালাম। গুণতিতে ছাত্রদের চেয়ে টেবিল বেঞ্চগুলিই অবশ্য বেশি। শুনতে পেলাম মেয়েদের সেক্‌শনেই ষ্ট্রাইকটা বেশি জমেছে। আর তাদের মধ্যে পাণ্ডাগিরি করছে নাকি আমাদের শেফালী। শুনে আমি প্রথমবার অবাক হলাম। দ্বিতীয়বার অবাক হলাম না। ওর দাদা তারাপ্রসাদ বাইশ তেইশ বছরের ছোকরা। ওদের বাসায় যেদিন চা খেতে গিয়েছিলাম সেদিনই আলাপ পরিচয় হয়েছিল। চেহারাখানা শুকিয়ে কাঠ হয়েছে। কিন্তু কাঠে কাঠে ঘষা লাগলে আগুন জ্বলে। ওর বুলিটুলি শুনে আমার বুঝতে বাকি

ছিল না যে ও আপনারা যাকে বলেন বাঁ-পথ ঘেষা তাই। ওকে নেশায় পেয়েছে। পৃথিবীকে উল্‌টেপাল্‌টে দেবে। আরে বাপু, উল্‌টেপাল্‌টে দেওয়া কি অত সোজা! কিন্তু আমাদের পাকা মাথার বুঝ ওরা বুঝবে কেন? ওর টেবিলে যে সব মার্কামারা বইপত্তর দেখলাম, পেলাম আর যে সব কাগজ-পত্তরের কাটিং পেলাম, তাতে আমার বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। চা খাব কি মশাই, আমি তো পালাতে পারলে বাঁচি। শেফালী যে দাদারই বোন, দাদারই শিষ্যা তা আমি কথাবার্তায় টের পেতাম। হাজার হলেও রক্তের সম্বন্ধ তো। কিন্তু রক্তের সম্বন্ধের চেয়েও বোধহয় মশাই হাড়ের সম্বন্ধের জোর বেশি। এই বয়সেই শেফালীর চোয়ালের হাড় জেগেছে। আর তারা-প্রসাদ ছোকরার পাঁজরের হাড়গুলি আঙুলে গোণা যায়। ওদের কেবল ভাইবোনে মিতালি নয়, হাড়ে হাড়ে মিতালি। যাকৃগে মশাই আপনার বাজারের বেলা হয়ে গেছে, আমারও বাজার সারতে হবে। হ্যাঁ, পথে শেফালীর সঙ্গে দেখা। আমি তো ওকে খুব ধমকে দিলাম। 'এ সব কি শুনছি তোমার নামে? হাফ ফ্রি-শিপটি আজই যাবে।'

শেফালী মুখ নিচু করে রইল।

বললাম, 'ছাত্রাণাম্ অধ্যয়ন' তপঃ। ছাত্রীদের বেলায়ও সেই কথা। যাও ঘরে যাও।'

ওকে ধমকে টমকে এলাম তো মশাই ক্লাসে। ফাস্ট ক্লাসেই প্রথম পিরিয়ড ছিল। স্কুল কম্পাউণ্ডের বাইরে একদল ছেলে হল্লা করছে। তারাই দলে ভারি। ক্লাশে গিয়ে দেখলাম গুটিচারেক ছেলেমেয়ে মাত্র রয়েছে ভিতরে। আর তাদের মধ্যে আমাদের ওই সুবোধ দাসও আছে। অন্য দিন ও ফার্স্ট বেঞ্চে এসে বসে। আজ গিয়েছে একেবারে পিছনে। মুখ নিচু করে বসে আছে। আমি বললাম, 'কি হয়েছে, সুবোধ?'

সুবোধ বলল 'কিছু হয়নি স্যার।'

তারপর রইল ফের মুখ নিচু করে। মনে হল ওর চোখ দুটো ছল ছল করছে। আমার দেখবারও ভুল হতে পারে। চশমাটার বড় গোলমাল হচ্ছিল। গ্লাস না পালটালে আর চলছিল না।

তারপর মশাই আমাদের সেক্রেটারি আর হেডমাষ্টার হেডমিষ্ট্রেস তিন-জনে মিলে শেফালীকে খুব ধমক দিলেন। ফের এমন করলে কনসেশন

কাটা যাবে বলে ভয় দেখালেন। আর ওর সামনেই সুবোধকে ডেকে নিয়ে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। সুবোধ কারো কোনো ধমক খেল না, তবু কেন যে মুখ কালো করে, মুখ নিচু করে রইল, তা আমার বুদ্ধির অগম্য মশাই।

সেই থেকে সুবোধ শেফালীর একেবারে দু'চোখের বিষ হয়ে গেল। কেবল আড়ালে আবডালে নয় ওর মুখের সামনেই বুর্জোয়া আর রিএ্যাকশনারি বলে গাল দিয়ে ছাড়ল। এ যুগে ও দু'টি গাল শকার বকারের চেয়েও বেশি। তারপর থেকে সুবোধ আমার ঘরে ঢোকে তো শেফালী ঢোকে না, শেফালী ঢোকে তো সুবোধ বেরিয়ে আসে। কিন্তু আমার কাছে সাহায্যের জন্য দু-জনেই যায়। টেস্ট হয়ে গেল। সুবোধের রেজাল্ট ভালোই হোল। সব বিষয়েই ফার্স্ট হল সুবোধ। শেফালী কোনোরকমে পাশ করল। বললাম, 'এবার ফী-এর টাকা জোগাড় কর।

এই সময় এক কাণ্ড ঘটল। শেফালীর দাদা তারাপ্রসাদের চাকরিটি গেল। তার চাকরি প্রায় যাওয়া চাকরিই ছিল। সময় মতো মাইনে পেত না। মাঝে মাঝে পার্ট-পেমেন্ট হোত। কিছু পেত, অনেক কিছুই বাকি থাকত। তবু চাকরি যাওয়ায় ছোকরা একেবারে অকূলে পড়ল। শেফালী এসে বলল, 'মাস্টারমশাই, একটা টিউশনি আমাকে জুটিয়ে দিন। সংসার যে চলে না।

কিন্তু টিউশনি কি চাইলেই জোটে?

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'কোনো রকমে মুখ বুজে পরীক্ষাটা আগে দাও। তারপর ওসব কোরো। অনেক গেছে, অল্প আছে। কটা দিন কেটেই যাবে।'

তারপর এল ফী-দাখিলের তারিখ। মাত্র পনেরোটি টাকা তাই জোটানো শেফালীর পক্ষে শক্ত; আমি যৎসামান্য সাহায্য করলাম। পঞ্জিকা দেখে দিন-ক্ষণ ঠিক করে দিলাম।

এদিকে সুবোধের সংসারেও বিপদ ঘটেছে। তার বাপের অবশ্য চাকরি যায় নি। মোটরের ধাক্কায় সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে গুটি দুই দাঁত গেছে। ডান পাটাও জখম হয়েছে। মাসখানেক ধরে ঘরধরা হয়ে পড়ে আছে বসন্ত। কিন্তু সুবোধের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে পরীক্ষাই দেবে। পরীক্ষার ভাবনাই ভাবছে। ভালো ছেলেরা বোধহয় একটু বেশি স্বার্থপর হয়। পরীক্ষার কথা ছাড়া সুবোধের মুখে আর কোনো কথা নেই। আর কোনো

চিন্তা নেই মনে। সংসারের ওই অবস্থায়ও দশটা টাকা সে নিজেই কোত্থেকে যোগাড় করে আনল। বাকি পাঁচ টাকা আমি টিচারদের কাছ থেকে তুলে দিলাম। ফী দেওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ ওরও ঠিক একদিনই পড়ল।

বেলা তখন গোটা এগার বাজে। বারটার থেকে স্কুলে ফী নেওয়া শুরু হবে। আমি খেয়ে দেয়ে বাসায় একটু বিশ্রাম করছি, শেফালী এসে উপস্থিত হল। ফী দাখিল করতে যাবে। তার আগে আমাকে নমস্কার করতে এসেছে। মনটা ভারি খুশি। মুখখানা হাসি হাসি। মায়ের তোরঙ্গ থেকে বেরিয়েছে আজ একখানা পুরনো জর্জেট। বেরিয়েছে শেষ সম্বল একগাছি হার। আজ মুখে একটু পাউডারের পাফও বুলিয়েছে শেফালী। পিঠের ওপর ঝুলছে লম্বা একটী বেণী। কালো ধারার প্রান্তে একটু লাল ফিতে। মাত্র এইটুকুই তো প্রসাধন। কিন্তু তাতেই যেন অসাধ্যসাধন হয়েছে। লাবণ্যলেখা মূর্তিমতী একটী লক্ষ্মী ঠাকরুণ যেন এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে।

ও নিচু হয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বললাম, ভালো করে ফর্ম ফিল আপ কোরো। কাটা ছেড়া যায় না যেন। টাকা এনেছ তো মনে করে? শেফালী আঁচলের খুটে বেঁধে এনেছে টাকা।

আমি হেসে বললাম, 'সেকেলে মেয়েদের মতো একেবারে আচলে করে এনেছ? তোমাদের তো ছোটবড় কতরকমের কত থলি দেখি আজকাল।

শেফালীও একটু হাসল, 'মা বললেন, এ সব টাকা আচলে বেঁধে নেয়াই ভালো। আঁচলেই লক্ষ্মী-বাঁধা থাকেন।'

আমার স্ত্রীকে প্রণাম সেরে ও বেরুতে যাচ্ছে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল সুবোধ। এমন শুভ দিনেও ওর বেশবাসের কোনে পরির্তবন হয়নি। উস্কো-খুস্কো চুল। গায়ে ছেড়া আধময়লা হাফ শার্টটা, পরনের হাফ-প্যাণ্ট হাঁটুর বিঘতখানেক আগেই থেমে গেছে। একেবারে হতচ্ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া চেহারা হাতে একরাশ বই আর খাতা।

বললাম, 'ব্যাপার কি? আজও ওই বইপত্তরগুলি নিয়ে যাচ্ছ কোথায়? তোমার কি কোনো কাণ্ড জ্ঞান হবে না?'

সুবোধ আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'এসব বই আর কোনো কাজে লাগবে না, মাষ্টারমশাই। এগুলি আমি দিতে এলাম।'

বললাম, 'কাকে দিতে এলে?'

সুবোধ বলল, 'শেফালীকে। ওর-ও তো সব বই নেই, সব নোট নেই। ঐগুলি ওর দরকারে লাগবে।'

শেফালী পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ফের সুবোধের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ব্যাপার কি, তুমি কি পরীক্ষা দিচ্ছ না? ফী দিচ্ছ না আজ?'

সুবোধ বলল, 'না, মাষ্টারমশাই।'

বললাম, 'বিষয়টা কি? ফীয়ের টাকা হারিয়ে ফেলেছ নাকি? কি করে হারালে?'

'হারিয়ে ফেলিনি, কেড়ে নিয়েছে।'

বললাম, 'কে কেড়ে নিল?'

সুবোধ বলল, 'বাড়িওয়ালা। আমিই তার টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

তীব্র একটা ঘৃণার ছাপ সুবোধের চোখেমুখে ফুটে উঠল।

আরো দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করায় সুবোধ ঘটনাটা খুলে বলল। বাড়িওয়ালা মধুবাবুর কাছে তিন মাসের ঘর ভাড়া বাকি। তাই নিয়ে আজো সুবোধের রোগা বাপকে তিনি অপমান করেছিলেন। সুবোধের আর সহ্য হয়নি। সে প্রতিবাদ করেছে। তার জবাবে মধুবাবু বলেছেন, 'খুব তো লম্ফঝম্ফ করছিস! বাপের বেটা হোস তো ভাড়া গুণে দিয়ে কথা বল।'

তাদের খপরির ভাড়া সাড়ে সাত টাকা। দু মাসের ভাড়া তাঁর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে সুবোধ।

আর দেরি না করে আমাদের ঘর থেকে সুবোধ বেরিয়ে যাচ্ছিল। শেফালী বাধা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাষ্টারমশাই, ওকে যেতে নিষেধ করে দিন, ওকে থাকতে বলুন।'

তারপর আঁচলের গিট খুলে শেফালী দুখানি নোট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল। 'মাষ্টারমশাই, ওকে দিন।'

সুবোধ ওর কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাষ্টারমশাই, আমি কেন ওর ফী-এর টাকা নিতে যাব?'

শেফালী বলল, 'তাতে দোষ কি মাষ্টারমশাই? ও স্কুলের সেরা ছেলে,

ও স্কুলের নাম রাখবে। ও এবার পরীক্ষা দিক। আমার তো প্রিপ্যারেশনও ভালো হয় নি, আমি না হয় পরের বার দেব। ওকে বলুন, মাষ্টারমশাই, ওতে কোনো দোষ হবে না, কোনো অপমান হবে না। আমি দিচ্ছি, মাষ্টারমশাই, আমি আমাদের স্কুলের সেরা ছেলেকে দিচ্ছি।'

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দু'জোড়া চোখ ছলছল করছে। দুজনে আজ মুখোমুখি দাঁড়ানো। একজন আর একজনের ভিজে চোখে দেখতে পেয়েছে নিজেকে।

বললাম, 'নাও সুবোধ, হাত পেতে নাও।'

সুবোধ হাত পেতে নিল, কিন্তু ফী আর সেদিন দিল না। যতদিন আরো পনেরো টাকা না জুটবে ততদিন নাকি ফী দেবেও না।''

কাহিনী শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন ফণিবাবু বললেন, 'ঈস্, বাজারের বেলা বয়ে গেল মশাই। চলুন, শিগ্‌গির চলুন।'

এ্যাজমা

পণ্ডিতিয়া প্লেসে সত্যেন রায়ের বাসায় সেদিনকার সান্ধ্য মজলিসে আমাদের অচ্যুত গোঁসাই একেবারে ঝোড়ো কাকের চেহারা নিয়ে এসে হাজির হোল।

বললুম, 'ব্যাপার কি, তোমার আশা তো আমরা আজ প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

অচ্যুত তক্তপোষের একটা কোণ ঘেঁসে বসতে বসতে বলল, 'আমি নিজেও আর বড় একটা আশা রাখতে পারছিনে।'

সত্যেন বলল, "কেন, হয়েছে কি বলতো।"

রোহিণী আচার্য ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে আয়েস ক'রে সিগারেট টানছিল, অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'হবে আবার কি। বউ বোধ হয় আটকে রেখেছিল। আসতে দিচ্ছিল না। অচ্যুতের যত বয়স বাড়ছে তত ও চরিত্রচ্যুত হচ্ছে। ওর মত স্ত্রৈণ আমাদের মধ্যে কেউ নেই।'

আমি অচ্যুতের পক্ষ নিয়ে বললুম, "তোমার আর সত্যেনের স্ত্রৈণ হওয়ার সুযোগ নেই বলেই স্ত্রী-ওয়ালা বন্ধুদের ওপর তোমাদের এত রাগ। অচ্যুত, তোমার কি শরীর ফের খারাপ হয়েছে নাকি?"

অচ্যুত হতাশার ভঙ্গি করল, 'আর বলো না, এ্যাজমাটা ফের বড় কষ্ট দিচ্ছে।'

অরুণ মুখুজ্জে বলল, "অচ্যুতের চেহারা দেখে অবশ্য তাই মনে হয়। স্ত্রীর চেয়ে ও এ্যাজমা ওর বেশী অনুরাগিণী। কিন্তু তুমি এমন হাত পা ছেড়ে বসে আছ কেন বলতো। ভাল ক'রে চিকিৎসা টিকিৎসা করাও। আচ্ছা কোন ইন্‌জেকসন টিনজেকসন বেরোয়নি এর?"

রোগের চিকিৎসায় মনোযোগী না হওয়ার জন্য আমরা সবাই

অচ্যুতকে অনুযোগ দেওয়া সুরু করলাম। অচ্যুত বলল, সাধ্যমত চিকিৎসা সে সব রকমই করে দেখেছে। কিন্তু বহু দিনের পুরোন রোগ। যাই যাই ক'রেও যাচ্ছে না।

এ্যাসট্রেটা সামনে থাকতেও রোহিণী সিগারেটের টুকরোটা আমাদের সবাইর মাথার ওপর দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে বলল, 'ভেবনা অচ্যুত, ও সব রোগ না যাওয়াই ভালো। জন্তু জানোয়ারের মত মারাত্মক রোগও এক সময় না এক সময় পোষ মানে। আর তাতে সব পুষিয়ে যায়। পোষা রোগ অনেক সময় অনেক কাজে আসে। ওকে তাড়াতে নেই।'

সত্যেন বলল, "রোহিণী, তোমার ব্যাঙ্ক যাওয়ার পর এখন তো প্রায় আধা বেকার হয়ে আছ। এবার ডাক্তারী সুরু ক'রে দাও, বেশ পসার হবে।"

বললাম, "তা ঠিক। বেশির ভাগ ডাক্তারই ওষুধ দিয়ে রোগ পোষে। যে ডাক্তার বিনা ওষুধে রোগ পুষবার পরামর্শ দেয়, ওষুধের দামটা সে ভিজিটের টাকার মধ্যে নিয়ে নিতে পারে।'

রোহিণী বিরক্তির ভঙ্গি ক'রে বলল, 'কেন মিছিমিছি বক বক করছ। আমি যা বলি তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলি। পৃথিবীতে পরের স্ত্রী আর নিজের অভিজ্ঞতার মত দামী জিনিস আর নেই। পোষা রোগ যে কত কাজে লাগে তা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি।'

এবার আমরা সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। রোহিণীর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার গল্প আমরা কেউ বিশ্বাস করিনে, কিন্তু উপভোগ করি।

বললুম 'ও তুমি গল্প বলবে? তা এত ভূমিকা করছিলে কেন। চটপট সুরু ক'রে দাও।'

রোহিণী বলল, 'আমি কি তোমার মত? গল্প চট ক'রে শুরু ক'রে পট ক'রে শেষ ক'রে দিলাম? ধীরে সুস্থে রহে সয়ে যদি না বলতে পারলাম, বললাম কি! ঘোড়ায় চড়ে গুলী ছোঁড়া যায়, গল্প ছোঁড়া যায় না।'

রোহিণী অরুণের প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বের ক'রে নিয়ে সুরু করল, 'সে অনেক কাল আগের কথা। এগার বার বছর হয়ে গেল। আমি তখন এম. এ. পড়ি আর একটি মেয়েকে মাঝে মাঝে পড়াই।'

সত্যেন বাধা দিয়ে বলল, 'রোহিণী, শেষ পর্যন্ত তুমি কি পুরোন ধাঁচের একটা প্রেমের গল্পই সুরু করলে? সেই ছাত্রী আর টিউটরের চিরন্তন

প্রেম ?' অধীর হয়ে রোহিণী চেয়ারের হাতলে একটা চাপড় মেরে বলল, 'আলবৎ প্রেম। আলবৎ প্রেমের গল্প। দেখ, পৃথিবীতে শুধু দুই জাতের খাঁটি গল্প আছে। ভুতের আর প্রেমের। বলতে পার ভুতের আর অদ্ভুতের। এক নম্বরেরটা কমবয়সী আর দু-নম্বরেরটা বেশী বয়সীদের জন্য। যদি প্রেম না চাও, বল, ভুত নামাই।'

আমরা তাড়াতাড়ি রোহিণীকে শান্ত ক'রে বললাম, 'আমাদের ভুতে দরকার নেই।'

রোহিণী বলতে লাগল, 'পড়াতাম। ঠিক পেশাদারী পড়ানো নয়। যেদিন খুসি যেতাম, যেদিন খুসি যেতাম না। যেদিন খুসি পড়াতাম, যেদিন খুসি বসে বসে গল্প করতাম। প্রেমের গল্প না, ভুতের গল্প। ফাষ্ট ইয়ারের ছাত্রীর কাছে আর কোন গল্প করা যায় না সে জ্ঞান আমার ছিল। ছাত্রার বাবা অবনীবাবু এতে খুব অখুসী হতেন না, কারণ তাকে মাইনে দিতে হোত না। তাঁর স্ত্রী আর কন্যা শুধু বার দুই ক'রে চা যোগাতেন তখনকার দিনে আমার তাতেই চলত। অবনী দাসের বাড়ি আমাদের বহরমপুর সহরেই। বাবার বন্ধু বলে ছেলেবেলা থেকে ওঁদের সঙ্গে জানা শোনা। সেই সুবাদে অবনী কাকা আমাকে খবই ভালবাসতেন। তাঁর এই ভালোবাসার আরো কারণ ছিল। কাষ্টমস্ থেকে তাঁর চাকরি যাওয়ার পর ইউনিভারসিটির এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের কাজটি চেষ্টা-চরিত্র ক'রে আমিই তাঁকে জুটিয়ে দিয়েছিলাম। দৃশ্য অদৃশ্য এই সব নানা কারণে রেণুকে মানে তার শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্বকে তিনি নিশ্চিন্তে আমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঠিক যে নিশ্চিন্ত ছিলেন তা না। কারণ মাঝে মাঝে তিনি অতর্কিতে পড়াবার সময় এসে হানা দিতেন। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই পুলিশের হস্তগত হোত না।

রেণুর বয়স তখন সতের আঠার। মুখচোরা শান্ত স্বভাবের মেয়ে। আমাকে খুব ভয় ভক্তি করত। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলত না, পাছে আমি চোখ রাঙাই।

ম্যাট্রিক পাশ করবার পর থেকেই অবনীবাবু ওর সম্বন্ধ খুঁজতে সুরু করেছিলেন। কিন্তু পছন্দ মত ঘর বর মিলছিল না। তা ছাড়া যে ছেলের চেহারা আর চাকরি মোটামুটি চলনসই তার হাঁক ডাক মোটা। অত টাকা অবনীবাবুর ছিলনা। রেণুর পরেও কাচ্চা বাচ্চা অনেকগুলি ছিল। বিয়ে

দিতে দেরি হওয়ায় আমার পরামর্শে অবনীবাবু রেণুকে কলেজে পড়তে দিয়েছিলেন।

ভালো একটা সম্বন্ধ হব হব ক'রে শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে গেল।

আমি বললুম, 'তুমি বড় অপয়া। নইলে এমন সম্বন্ধ কারো ভাঙ্গে?

রেণু মুখ নিচু ক'রে বলল, 'এমন ক'রে সব সম্বন্ধই ভেঙ্গে যাক। আমি তাই চাই।'

'কেন?'

রেণু একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তা হ'লে পড়াটা বন্ধ হয়না।'

আর একদিন কথায় কথায় কাকীমা বললেন, 'রেণু রোহিণীকে যত ভক্তিশ্রদ্ধা করে, তেমন আর কাউকে করে না। রোহিণী যদি কায়েতের ছেলে হোত—'

রেণু সেই ঘরেই ছিল। কাকীমার কথা শেষ না হ'তেই উঠে চলে গেল।

অবনীবাবু স্ত্রীকে ধমক দিলেন, 'তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে, রোহিণী আমার ঘরের ছেলের মত। যত সব বাজে কথা বলে—'

কাকীমা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেন, 'বললুম বলে নাকি। তুমিও যেমন।'

আমি এম. এ. পাশ ক'রে বেরুলুম। রেণুরও বিয়ে হয়ে গেল। ছেলে মোটামুটি ভালই। বি. এ. পাশ। কৃষ্ণনগরে মুন্সেফ কোর্টে কাজ করে। সহরে নিজেদের বাড়ি আছে। জমি জমাও আছে কিছু। এত ভাল ছেলে পাওয়া সত্বেও পণ যৌতুক অবনী কাকার অনেক কম লাগল। শীতাংশু বোস নিজে পছন্দ ক'রে জানিয়ে গেছে তার কোন দাবী দাওয়া নেই।

অবনী কাকার আত্মীয় স্বজনেরা সবাই সায় দিয়ে বললেন, 'এর চেয়ে ভালো সম্বন্ধ আর হ'তে পারে না।'

কিন্তু রেণুর মুখ ভার হয়েই রইল। আমি বললুম, 'ব্যাপার কি। মুখটা অমন হাঁড়ি করে রয়েছো যে। লোককে দেখাবার জন্যে বুঝি।'

রেণু বলল, 'হু, দেখাবার জন্যেই তো।'

বিয়ের রাত্রে রেণু আরো এক কাণ্ড দেখাল। বরযাত্রীরা এসে পড়েছেন। অবনী কাকার আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে আমিও তাঁদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। রেণুর ছোট ভাই নান্নু এসে আমাকে খবর দিল, 'মা ডাকছে আপনাকে।'

ভিতরে গিয়ে বললুম, 'ব্যাপার কি কাকীমা, ডেকেছেন যে।'

কাকীমা আমাকে আরো আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আমার কিছু ভালো লাগে না বাপু। ইচ্ছে করছে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এ বাড়ি থেকে চলে যাই।'

বললুম, 'কেন হয়েছে কি?'

কাকীমা বললেন, 'কি জানি, কি হয়েছে তোমরাই জানো। মেয়ে সেই সকাল থেকে কাঁদছে তো কেবল কাঁদছেই। বাড়ি ভরা লোকজন। সবাই কি ভাববে বলতো। সকলের মনতো সমান নয়।'

বললুম, 'তা তো নয়ই, কিন্তু কাঁদছে কেন।'

কাকীমা বললেন, 'কেন তা মন খুলে বললে তো হোতই, কিন্তু এমন একগুঁয়ে মেয়ে, ওর মুখ থেকে কথা বের করে, আমার বাপের-ও সাধ্য নেই। ভরসা ক'রে ওর বাপকেও খবর দিতে পারছি না। তিনি শুনলে চেঁচিয়ে মেচিয়ে সমস্ত বাড়ি মাথায় ক'রে নেবেন। কারো কাছে মুখ দেখাবার জো থাকবে না। অথচ মেয়ে সেই জেদ ক'রে বসে আছে তো আছেই। না পরছে শাড়ি গয়না, না শুনছে কারো কোন কথা। এদিকে বিয়ের লগ্ন এল বলে। আর কোন উপায় না দেখে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি ওকে একটু ধমকে টমকে দিয়ে এসো। তোমাকে যেমন ও ভয় করে, আর কাউকে তেমন করে না।'

অস্বীকার করবনা, একথা শুনে আমারও একটু একটু ভয় করতে লাগল। তবু ধমক দেওয়ার জন্যে মনে মনে গলাটা শানিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। কাকীমার কথায় ওঁদের আত্মীয় কুটুম্বের মেয়েরা রেণুর কাছ থেকে সরে গেলেন।

ওকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে রেণু'। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রেণু ফের চোখ নামিয়ে নিয়ে শান্তভাবে বলল, 'কিছু হয়নি।'

বললাম, 'তুমি নাকি কথা শুনছ না।'

রেণু বলল, 'ও, সেই জন্যেই তুমি বুঝি কথা শোনাতে এসেছ। বল কি শুনতে হবে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'আমার কোন কথা শুনতে হবে না। ওঁরা যা বলেছেন তাই শুন্‌লেই হবে।'

রেণু বলল, 'ওঁদের কথা শুনতে হবে কি না হবে তা আমি জানি। তোমার যদি কিছু বলবার থাকে বল।'

এমন নির্ভয়ে স্পষ্ট ভাষায় রেণু কোন দিন আমার সঙ্গে কথা বলেনি। ওর এই দৃঢ়তায় বিস্মিত হলাম। কিন্তু যতখানি বিরক্ত হব ভেবেছিলাম তা যেন হ'তে পারলাম না। বললাম, 'না, আমার আর কিছু বলবার নেই। পাগলামি না ক'রে ওরা যা বলেছেন তাই করো শাড়ি টারি পরে তৈরী হও।'

'যদি তৈরী না হই, ধর যদি পাগলামিই করি। তুমি ঠেকাতে পার, তুমি কি করতে পার শুনি,' অবুঝ ছোট মেয়েকে শান্ত করবার ভঙ্গিতে বললাম, 'ছিঃ, অমন করে নাকি।'

বলে আলগোছে আমি ওর পিঠে হাত রাখতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে রেণু সরে দাঁড়াল, 'ছুঁয়োনা, তুমি আমাকে ছুঁয়োনা, যাও চলে যাও এখান থেকে।'

দোরের বাইরে থেকে কাকীমা বললেন, 'রোহিণী তুমি চলে এস।'

আমি ভেজানো দোরের এক পাট খুলে বেরিয়ে এলাম।

কাকীমা মৃদুস্বরে বললেন, 'ছিঃ, তোমার কাছ থেকে এসব আশা করিনি রোহিণী।'

রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, বললাম, 'কি আশা করেননি।'

কাকীমা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেন, 'কিছু না, তুমি ওদিককার কাজকর্ম দেখ গিয়ে।'

কাজ কর্ম দেখবার মত মনের অবস্থা সেদিন আর আমার ছিল না। কিন্তু পাছে আর কেউ কিছু মনে করে সেই জন্যে শেষ পর্যন্ত রয়ে গেলাম। বরের সঙ্গে আলাপ করলাম, বরযাত্রীদের আপ্যায়ন করলাম। রেণুর এক মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে আমি ওর বিয়ের পিঁড়ি পর্যন্ত ধরলাম।

পরদিন রেণু স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ি চলে গেল।

মনে মনে ভাবলাম আপদ গেল।

কিন্তু সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতে দেখি আমার মেসের ঠিকানায় নীল রঙা এক এনভেলপ এসে হাজির। সে চিঠি যে বেণুর লেখা তা আমার বুঝতে বাকি রহিল না। আমি ভারি বিরক্ত বোধ করলাম, কিন্তু অবশ্য আর কিছুই যে বোধ করলাম না তা বললে তোমরাও বিশ্বাস করবে না। আমারও মিথ্যা কথা বলা হবে। চিঠিতে রেণু লিখেছে তার সেদিনকার ব্যবহারে আমি কি রাগ করেছি। রাগ যদি না ক'রে থাকব কেন যাওয়ার সময় তার সঙ্গে দেখা করলাম না, একটা কথা পর্যন্ত বললাম না। যদি রাগ ক'রে থাকি সে রাগ যেন ভুলে যাই, যদি দুঃখ পেয়ে থাকি সে দুঃখ যেন মোটেই মনে না রাখি, মন থেকে সব যেন ধুয়ে মুছে ফেলে দিই, সব।

তারপর রেণু লিখেছে কৃষ্ণনগর জায়গাটা তার মোটেই ভাল লাগছে না। একেক সময়ে মনে হচ্ছে সে যেন দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। মরে যাওয়াই তার উচিত, না জেনে না শুনে, ভালো ক'রে খোঁজ খবর না নিয়ে সবাই মিলে যখন তাকে এক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের হাতে তুলে দিয়েছেন তখন আর তার বেঁচে লাভ কি।

ব্যাধি! আমি চমকে উঠলাম। কি এমন ব্যাধি হতে পারে শীতাংশুর। কালো বেঁটে একটু রোগা রোগা চেহারা অবশ্য লোকটির। কিন্তু রুগ্ন বলে তো মনে হোল না। অবশ্য এমন অনেক রোগ আছে যা বাইরে থেকে ধরা যায় না, ভিতর থেকে বোঝা যায়। শীতাংশুর রোগ সম্বন্ধে আমি কৌতূহলী না হয়ে পারলাম না। কিন্তু রেণুকে চিঠি লিখে সে কৌতূহল মেটানো সঙ্গত মনে হোল না। আর জটিলতা বাড়িয়ে কাজ নেই। কিন্তু মন তো কেবল সব সময়ে লাভই চায় না, লোকসানের দিকেও তার লোভ থাকে। কিংবা লোকসানের মধ্যেও সে এক ধরণের লাভের স্বাদ পায়। আমারও নানারকম লোকসান হতে লাগল। লিখব না লিখব না ক'রেও রেণুকে চিঠি লিখলাম। পয়সা খরচ ক'রে ষ্ট্যাম্প কিনে খামের মুখ বন্ধ করলাম। তারপর ডাকে দিতে গিয়ে মনে হোল এ চিঠি ডাকে দেওয়া যায় না। ষ্ট্যাম্প শুদ্ধ চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললাম। তারপর ডাকে দেওয়ার যোগ্য চিঠির মুসাবিদা মনের মধ্যে দিন কয়েক ধ'রে চলতে

লাগল। কিন্তু ঘুরে ফিরে যে কথাগুলি মনে এল তার সবই সেই ছেঁড়া চিঠির মধ্যে আছে। নিজের মনকে আচ্ছা করে ধমক দিলাম। নিতান্তই একটি সাধারণ মেয়ে, লজিক যার মাথায় মোটেই ঢোকে না, শুদ্ধ ক'রে একটা ইংরাজী সেণ্টেন্স লিখতে যার আধ ঘণ্টা লাগে, বাংলা লিখতে যার অগুণতি বানান ভুল হয়, তাকে নিয়ে কেন এ কাঙালপণা। কী আছে ওর, কী এমন দেখেছি ওর মধ্যে। কিন্তু এ ধমক যেন লোক দেখানো ধমক, তা কোন কাজে লাগল না। বারবার মনে পড়তে লাগল রেণুর এক রাত্রির ব্যবহার, তার সমস্ত ছাত্রিত্বকে ছাড়িয়ে গেছে। ওর সেই ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না' আমাকে যেন চিরদিনের জন্য স্পর্শ লোভাতুর ক'রে রেখে গেছে।

বাপের বাড়ি এসে রেণু আর একটা চিঠি লিখল। সে চিঠি সংক্ষিপ্ত। আমার সঙ্গে তার কথা আছে। অবশ্যই যেন দেখা করি।

যাব না যাব না ক'রেও শেষ পর্যন্ত একদিন সন্ধ্যার দিকে গিয়ে হাজির হলাম। অবনী কাকা বাড়ি ছিলেন না। কাকীমা আমাকে দেখে মুখ গম্ভীর করলেন। বললেন, 'এসো।'

তাঁর শুকনো মুখ আর শুকনো গলা আমি লক্ষ্য না ক'রে পারলাম না। মনে মনে ভারি ক্ষুণ্ণ হলাম। রাগও হোল। এমন কি অপরাধ করেছি যে কাকীমা আমার সঙ্গে সাধারণ ভদ্র ব্যবহারটুকু পর্যন্ত করলেন না। এতদিনের এত হৃদ্যতা, অন্তরঙ্গতা সবই কি সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। যতটুকুই হোক সময়ে অসময়ে কিছু উপকার তো ওঁরা পেয়েছেন। এমন অকৃতজ্ঞ ওঁরা যে সে-কথা, একেবারেই ভুলে গেলেন। আমার এখানে না আসাই উচিত ছিল।

কিন্তু একটু বাদেই গা ধুয়ে চুল বেঁধে, ঘি রঙের শাড়ি পরে রেণু যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন আর কোন আফশোষ রইল না। মনে হোল এই কয়েক দিনের মধ্যে ওর যেন রূপান্তর ঘটে গেছে। হাতে গলায় সামান্য কয়েকখানা গয়নায়, আর সিঁথির সিঁদুরে একটি মেয়ের চেহারা যে এমন বদলে যেতে পারে, তা যেন বিশ্বাস করা যায় না।

রেণু আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'কেমন আছ।'

আমি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, "তুমি কেমন আছ বল।"

আমার মত রেণুও জবাব দিল না।

একটু বাদে আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'শীতাংশু বাবু কেমন আছেন। অসুখের কথা লিখেছিলে। কি অসুখ তাঁর।'

কাকীমা যেন চমকে উঠলেন, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে চিঠি লিখেছিল না-কি ও? কি লিখেছিল?'

মেয়েকেও জিজ্ঞেস করলেন কাকীমা, 'কি লিখেছিলি।'

আমি একটু অপ্রতিভ ভাবে বললাম 'শীতাংশুবাবুর অসুখের কথাই লিখেছিল।'

কাকীমা নীরস স্বরে বললেন, 'তা অসুখের কথা রোহিণীকে লিখে কি হবে। ও কি ডাক্তার? আর এ্যাজমার দোষ অনেকেরই থাকে। তা নিয়ে অমন লেখালেখির কি আছে। আমি যে কবচটা আনিয়েছি শীতাংশুকে সেটা পরতে দিস। যারাই পড়েছে একেবারে অব্যর্থ ফল পেয়েছে।'

আমি বললাম, 'শীতাংশুবাবু বুঝি এ্যাজমায় ভুগছেন? তা নিয়ে অত ভাববার কি আছে। আজকাল অনেক ভালো ভালো সব ওষুধ বেরিয়েছে—'

রেণু বলল, 'কোন ওষুধেই কিছু হয়নি' হবেও না, অনেক দিনের পুরোন রোগ, বিয়ের সময় গোপন ক'রে গিয়েছিল। কিন্তু রোগ কি আর কেউ চেপে রাখতে পারে?'

কাকীমা বললেন, 'তোর যত সব আদিখ্যেতা। এমন কি খারাপ রোগ যে লুকিয়ে রাখতে যাবে।'

রেণু বলল, 'খারাপ কি ভালো তুমি তার কি বুঝবে।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাশে শুয়ে একজন লোক যখন নিঃশ্বাসের জন্য অমন বিশ্রী ভাবে হাঁপায় তখন কি যে খারাপ লাগে তা তোমরা ভাবতেও পার না। নিজেরই হাঁপ ধরে যায় মনে হয় নিজেও দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। এমন ক'রে আমি আর পারব না, কিছুতেই পারব না, তা বলে রাখলুম।'

বলতে বলতে রেণু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাকীমা আমার দিকে একটুকাল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বাবা রোহিণী, তোমাকে একটা কথা বলি।'

'বলুন।'

'তুমি ছেলেবেলা থেকে রেণুকে দেখে আসছ, ওকে লেখা পড়া শিখিয়েছ, ওর যাতে ভালো হয় তাই করে এসেছ।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম। এ সব যে কোন কথার ভূমিকা তা আমার বুঝতে বাকি রইল না।'

কাকীমা বললেন, 'এখনো যাতে ওর ভালো হয়, তাই করো। হিন্দুর মেয়ে, বিয়ে হয়ে গেছে। আর তো কিছু করবার নেই। স্বামী যেমনই হোক, তাকে ভালোও বাসতে হবে, তাকে নিয়ে ওর ঘর সংসারও করতে হবে। মাঝখান থেকে মিছিমিছি কেন অশান্তির সৃষ্টি।'

মনে মনে বেশ একটু অপমানিত বোধ করলাম, বললাম 'এ সব কথা আমাকে কেন বলছেন। আমি কি কোন অশান্তি ঘটিয়েছি বলে আপনার ধারণা?'

কাকীমা একটু থমকে গেলেন, 'না তা ঠিক নয়, তাই বলছিলাম তুমি ঠিক তা করতে পার না, তুমি তেমন ছেলে নও, তবু মায়ের মন। কত ভাবনা চিন্তাই তো আসে। সে তোমাদের বুঝবার কথা নয়। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। তোমাকে বেশি কিছু বলা দরকার করে না। আমি বলি কি দিন কয়েক তুমি ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ চিঠিপত্র লেখালেখি একেবারে বন্ধ করে দাও। দেখবে দু দিন বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমার ভারি অসহ্য লাগছিল। আর কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়ালাম। কাকীমা সদর দরজা পর্যন্ত পিছনে পিছনে এলেন, 'রাগ করলে না তো বাবা। আমি সকলের ভালোর জন্যেই বলছি।'

বললাম, 'আমি তা জানি কাকীমা।'

কিন্তু কাকীমার গায়ে পড়া হিতোপদেশ আর শুভেচ্ছাটা আমার মোটেই ভালো লাগল না। মনের মধ্যে বরং কেমন এক ধরণের জ্বালাই করতে লাগল। কেন চুপ চাপ সব মেনে নিলাম। ওঁর মুখের উপর কড়া কড়া কথা কেন শুনিয়ে দিয়ে এলাম না। নিজের বোকামির জন্য নিজের ওপরই রাগ হতে লাগল। একবার মনে হলো উল্টো দিক থেকে বরং এর শোধ নিই। রেণুর সঙ্গে খুব চিঠিপত্র লিখি, মেলামেশা করি, আমি ওর গভীর প্রেমে পড়ে গেছি এমন ভাব দেখাই। রেণুর জন্য যে শান্তি কাকীমা চেয়েছিলেন তা নষ্ট করি, কাকীমাকেও স্থির থাকতে না দিই। ওঁর হিতোপদেশের দাম যে আমার কাছে কানাকড়িও নেই তা বুঝতে দিই ওঁকে।

কিন্তু এ সব করতে গিয়ে করতে পারলাম না। নিজের কাছ থেকেই কিসের একটা বাধা পেলাম। কোন নৈতিক বাধা নয়। রেণুর প্রেম পত্রের জবাবে কিছুতেই আমি তাকে প্রণয়ের পাঠ লিখতে পারলাম না। যাই লিখি তাতে নিজের গালেই যেন চড় মারতে ইচ্ছা করে। বড় ন্যাকামি ন্যাকামি মনে হয়। আমি চাই যে এমন কিছু লিখি যাতে আমার সম্বন্ধে ওর সেই পুরোণ শ্রদ্ধা আর সমীহার ভাবটাও বজায় থাকে আবার আমি যে ওকে ভালোবাসি সে কথাও জানানো যায়। কিন্তু কিছুতেই আমি তেমন চিঠি লিখতে পারলাম না। আর তা যত না পারলাম তত বেশি ক'রে খারাপ লাগতে লাগল। ভিতরে ভিতরে আমি তত ওর ওপর আকৃষ্ট হচ্ছি একথাও বুঝতে বাকি রইল না। অথচ তা স্বীকার করতেও যে লজ্জা না পেলাম তা নয়। শেষ পর্যন্ত ওকে জানালাম যে ওর ও সব চিঠি পত্রের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সে চিঠিতে আমার দুর্বলতা ধরা পড়বার মত বোধ হয় আরো কিছু ছিল। রেণু পাল্টা জবাবে লিখল 'যাক চিঠি আর তোমাকে লিখতে হবে না। তুমি একবার এখানে এস, দেখে যাও কেমন আছি।'

কিন্তু যেতে লিখলেই কি আর যাওয়া যায়! নিজের মনের বাধা বিঘ্নের অন্ত নেই। শেষ নেই এগুনো পিছোনোর। ওর চিঠি পেয়ে বরং এক ধরণের অনুতাপ হতে লাগল ওর কাছে এমন করে ধরা দিতে গেলাম কেন। কেন ওর সাহস বাড়িয়ে দিলাম। ফলে ওর সেই চিঠির আর জবাব দিলাম না।

ঠিক এই সময়ে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারিগিরি জুটে গেল। আর কামিনী থেকে কাঞ্চন সংসর্গে এসে আমি বেঁচে গেলাম। আমি যে আসলে দুর্বল নই, আমি যে কাজের লোক নিজের আর অন্যের কাছে তার প্রমাণ দিতে পেরে আমি খুসি হয়ে উঠলাম। তারপর পুরো দু' বছর আমি কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে রইলাম। একথা মনে করতে ভালো লাগল যে, রেণুকে আমার আর মনে নেই।

আমাদের কৃষ্ণনগর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার হিসাব-পত্রে কিছু গোলমাল ঘটিয়ে বসেছেন। গোলমালের জন্য কতখানি বা তিনি দায়ী কতখানি ... এ্যাকাউন্ট্যান্ট, ব্যাপারটা গড়িয়েছেই বা কতখানি তা তদন্তের ভার আমার ওপর পড়ল। দু' বছর আগে হলে আমি হয়তো কৃষ্ণনগর যেতে সাহস পেতাম না। কিন্তু এখন আমার মনে কোন ভয় নেই। আর ভয় যে নেই তার প্রমাণ

দেওয়ার জন্যেই আমি রেণুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ঠিক ওকে দেখতে নয়, নিজেকে দেখাতে। আমি ওর সেই শ্রদ্ধা আর সমীহার পাত্রই আসলে রয়ে গেছি তার প্রমাণ দিতে।

ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে। আমার মন খুব প্রসন্ন। যে ম্যানেজাকে আমি ইচ্ছা করলে জেলে দিতে পারতাম বিনা স্বার্থে তার মান প্রাণ রক্ষা করেছি, তাকে সৎ হওয়ার আর একটা সুযোগ দিতে পেরেছি একথা ভেবে আমি আত্মপ্রসাদ বোধ করলাম। কৃতজ্ঞতায় ম্যানেজারের বাপ মা স্ত্রী পুত্র প্রায় আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। তাদের সবাইকে আমি বাঁচিয়েছি। অথচ ব্যাঙ্কের মর্যাদা নষ্ট করিনি।

মাঘের শেষ। শীতটা যাই যাই করছে অথচ একেবারে যায়নি। বছরের এই সময়টায় আমার শরীর সব চেয়ে ভালো থাকে। কাজ কর্মেও খুব উৎসাহ পাই।

শীতাংশু বোসকে আমাদের ম্যানেজার প্রথমে চিনতেই পারলেন না। তার পেশা আর চেহারার খানিকটা বর্ণনা দেওয়ায় তিনি বললেন—'ও আমাদের ফটিক মাষ্টারের কথা বলছেন।'

আমার মত প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষের ফটিক মাষ্টারের সঙ্গে কি সম্পর্ক থাকতে পারে তা ভেবে তিনি যেটুকু বিস্মিত হলেন তা গোপন করবার জন্যই আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চললেন।

সহরের দক্ষিণ প্রান্তে পাটকেলে রঙের পুরোণ একতলা ছোট বাড়ি। আশপাশটা বড় জংলা মনে হোল। গাছ গাছালি যা আছে তার মধ্যে আগাছাই বেশি।

শীতাংশুর নাম ধরে ডাকতে ভিতর থেকে একটি মেয়ে মুখ বার করল 'তিনি তো নেই।'

মনে হলো অনেক দিন পরে এমন মিষ্টি গলা শুনলাম। অনেক কাল পরে ফের একখানা সুন্দর মুখ দেখলাম। আমার সমস্ত পৃথিবী অস্তিত্বে ভরে উঠল।

তিনি তো তিনি, রেণু যদি বলত গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাই নেই, তাতেও আমার কিছু এসে যেত না। কারণ ও যখন আছে তখন সব আছে।

ম্যানেজার একটু পরেই বিদায় নিলেন।

রেণু আমাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'অমন ক'রে তাকিয়ে কি দেখছ, চিনতে পারছ না?

এমন অন্তরঙ্গতা রেণুর সঙ্গে আমার ছিল না যে এভাবে সে কথা বলতে পারে। কিন্তু একথা তো আজ শুধু হঠাৎ ও বলে নি, দু'বছর ধরে এ কথার ও মহড়া দিয়ে আসছে। কল্পনায় আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে এমন আরো অনেক কথা রেণু অনেকবার বলেছে। তাই আজ ওর মুখে কিছু বাধল না। আর ওর এই অসঙ্কোচ বাকস্ফূর্তিতে আমিও খুসি হলাম। ও আর ছোট নেই, ও আমার সমান হয়ে উঠেছে তা দেখে আমার ভালো লাগল।

রেণুর কথার জবাবে বললাম 'চেনা তো একটু শক্তই।'

'কেন, এতই কি মোটা হয়েছি?'

ঠিক মোটা বলা চলে না, একটু পুষ্ট হয়েছে রেণু, লম্বায়ও যেন একটু বেড়েছে। এত দিনে কিছুতেই যেন ওর কৈশোর ঘুচছিল না, কিন্তু এবার ও পূর্ণতা পেয়েছে। পূর্ণ নারীত্ব।

বললাম 'তোমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে।'

রেণু বলল, 'তা হবে। পুরুষের মত আমাদের মনের ভাবনা চিন্তাটা দেহের ওপর দিয়ে দেখা যায় না। মনটা যতই শুকিয়ে যাক্ শরীরটা ফুলতেই থাকে।'

বললাম, 'মনটাই বা শুকিয়ে যাবে কেন।'

রেণু আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল, 'সব কেনর জবাব কি সবাইকে দেওয়া যায়। দিয়ে কি কোন লাভ আছে?'

বলতে বলতে আমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। বাইরের দিকেরই একখানা ঘর। কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন পরিপাটি করে গুছানো। গৃহস্থালীর ওপর বিন্দুমাত্র যে রেণুর অমনোযোগ আছে তা মনে হয় না। ওকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলবে যে মেয়েরা পুরুষের মত নয়। যখন মন তাদের বেশী অগোছালো থাকে তখনই ঘর তারা বেশি করে গুছোয়।

রেণু বলল, বোসো, দাঁড়িয়েই থাকবে না কি।'

বললাম, 'না। এবার দৌড়াতে সুরু করব। আর ঘণ্টা খানেক বাদেই আমার ট্রেণ।'

রেণু একটু হাসল, 'তাই নাকি, তা হ'লে চল। তোমাকে ষ্টেশনেই পৌছে দিয়ে আসি। তোমার সাহেবী পোষাক টোষাক এবার ছাড়। হাত মুখ ধুয়ে নাও। চল তোমাকে ইদারাটা দেখিয়ে দিচ্ছি। চমৎকার জল, শীতে গরম, গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা।' বললাম, 'এমন ইদারা যে আর হয় না তা' জানি। কিন্তু ইদারার মালিক গেলেন কোথায়, তাঁকে দেখছিনে।'

রেণু আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'ইদারার মালিক? ব্যস্ত হচ্ছ কেন, তিনি এখনই এসে পড়বেন। না কি তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর ইদারার জল ছোঁবে না।' বললাম, 'তা, কেন। তোমার অনুমতিই যথেষ্ট। কিন্তু শীতাংশু বাবু কেমন আছেন আজকাল, তাঁর সেই এ্যাজ্‌মার দোষটা গেছে তো?'

রেণু বলল, 'ওকি যাবার?'

বললাম, 'এ্যাজ্‌মার টান দেখতে দেখতে আজকালও কি তোমার দম বন্ধ হয়, না সয়ে গেছে?'

রেণু একথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।

হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরতে না ফিরতেই শীতাংশু এসে হাজির হোল। গায়ে নস্যি রঙের সস্তা একটা র‍্যাপার। তাতে আপাদমস্তক না হলেও পদ আর মস্তক ছাড়া সবটুকুই লোকটির ঢাকা পড়েছে। কালো, রোগাটে, অত্যন্ত আনইম্‌প্রেসিভ চেহারা। চোখ মুখের ধরণ দেখলে হঠাৎ ব্লাণ্ট বলেই মনে হয়। ঘষা কাঁচের মত তার ভিতর দিয়ে কিছুই দেখা যায় না আর তার ফলে মন অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে ভরে যায়।

শীতাংশু আমার দিকে ভ্রূ-কুঁচকে তাকাল।

রেণু বলল, 'অমন ক'রে তাকাচ্ছ কেন। আমার মাষ্টার মশাই ছিলেন। ওকে তুমি আমাদের বিয়ের সময় দেখেছ।'

হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানিয়ে পরম অপ্রতিভ ভঙ্গিতে শীতাংশু বলল, 'ও আমি ঠিক চিনতে পারিনি।

বললাম, 'তাতে আপনার স্মরণ শক্তির খুব দোষ দিতে পারিনে। বিয়ের রাত্রে শ্বশুর বাড়ীতে যত লোক আসে যায় তার সবাইকেই যদি মনে রাখা যেত, তা'হলে এক গাড়ি প্যাসেঞ্জারের মুখও লোকে মনে রাখত।'

রেণু বলল, 'কিন্তু বিয়ের রাত্রের কোন মুখই কি কারো মনে থাকে না?'

বললাম, 'থাকে, তাও, রোজ রাত্রে দেখতে হয় বলে। কি বলুন শীতাংশু বাবু?

শীতাংশু বক্তব্য খুজে না পেয়ে একটু হাসল।

রেণু এবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার এত দেরি হোল যে! স্কুল তো সেই কখন ছুটি হয়ে গেছে!

শীতাংশু কৈফিয়তের সুরে বলল, 'লাইব্রেরীতে কতকগুলি বই এল কিনা সেগুলি লিষ্ট করতে করতে—'

রেণু বলল, 'লাইব্রেরীটা দেখাশোনা করবার জন্যে তো গোটা পাঁচেক টাকা বেশি দেয়। তার জন্য অত খেটে মরছ কেন। তা ছাড়া রোজ রোজ তুমি যে অমনি ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ—

শীতাংশু চোখের ইসারায় আপত্তি করায় রেণু থেমে গেল।

কিন্তু আমি সে আপত্তি না মেনে বললাম, 'বেশি ঠাণ্ডা লাগানোটা আপনার পক্ষে তো খারাপই, আপনার সেই এ্যাজমার দোষ তো শুনলুম সারেনি।'

শীতাংশু প্রতিবাদ ক'রে উঠল, 'ওর কথা আপনি শুনবেন না। ও রোগ আমার সেরে যাওয়ার মধ্যেই। এই তো এত বড় শীতটা গেল—কই কোন কষ্ট পাইনি তো। বরং অন্যান্য বারের চেয়ে বেশ ভালোই তো আছি। আমার রোগের চেয়ে ওর ম্যানিয়াটা বড়।'

বলে স্ত্রীর দিকে তাকাল শীতাংশু। রেণু কোন কথা বলল না।

শীতাংশু এবার উঠে দাঁড়াল।

রেণু বলল, 'কোথায় চললে!'

শীতাংশু বলল, 'বাঃ বাজারে যেতে হবে না। এতকাল বাদে উনি এই প্রথম এলেন। কিন্তু কিছু পাওয়া যায় না এখানে। মাছ তরিতরকারি কিছু না—সত্যি, এত দিন পরে আপনি এলেন, কিন্তু—'

বললাম, 'আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

রেণু বলল, 'রাত করে ঠাণ্ডার মধ্যে তোমার যাওয়ারই বা কি দরকার। টাকা আর থলি দিয়ে ও বাড়ির ভঞ্জুকে পাঠিয়ে দিই বরং—'

শীতাংশু বলল, কি যে বল! ভঞ্জুকে দিয়ে এসব কাজ হয়?'

বলে শীতাংশু ভিতরের ঘরে চলে গেল। রেণুও গেল পিছনে পিছনে।

তারপর স্বামী-স্ত্রীতে মিলে অতিথি-অভ্যর্থনার আয়োজন সুরু করল। আমি বাইরের লোক। বাইরের ঘরেই বসে রইলাম।

কোন একটা লোকের অস্তিত্বই আমার কাছে ছিল না। রেণুর কাছেও যে ছিল আমি তার প্রমাণ পাইনি। কিন্তু ফের শীতাংশু অস্তিত্ব পেয়েছে। কিন্তু ওকে আমি স্বীকার করব না, কিছুতেই স্বীকার করব না। ওকে যদি স্বীকার করি, আমার নিজেকে অস্বীকার করতে হবে; ওকে যদি না ঠকাই আমি নিজে ঠকব। আজ আমি তা পারব না। কিছুতেই পারব না।

রেণু রান্নাবান্নার জোগাড়ে গেল। বাজারে ভালো মাছ পাওয়া যায়নি। শীতাংশু চড়া দামে মুরগীর মাংস নিয়ে এসেছে। তরিতরকারি, দই, মিষ্টি কিছুই বাদ রাখেনি। খুবই ভদ্রতা করেছে শীতাংশু। ও যখন আমার মেসে যাবে আমিও করব। আমিও অনেক টাকা ব্যয় ক'রে খাওয়াব, নিজে মেঝেয় শুয়ে, আমার তক্তপোষ ছেড়ে দেব, কিন্তু তাই বলে সর্বত্যাগী হ'তে পারবনা। শীতাংশুই কি পারে, শীতাংশুই কি পারত?

দু'একটা মসলা আনতে ভুল হয়েছে। শীতাংশুকে আরো একবার দোকানে ছুটতে হোল। রাঁধতে রাঁধতে রেণু ফের আর একবার খোঁজ নিতে এল 'রান্না হ'তে বেশ কিন্তু দেরি হবে। জেগে থাক্‌তে পারবে তো— না ঘুমিয়ে পড়বে?'

'না খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পরব, আমাকে কি এমনই ঘুম-কাতুরে মনে হয় নাকি তোমার?

রেণু বলল, 'কি জানি, সঙ্গদোষে হয়ে যেতেও তো পারো।'

'কেন শীতাংশু বাবু ঘুমোন বুঝি খুব?'

'ঘুমোয় মানে? রাত্রে রাঁধতে একটু দেরি হলে একঘুম দিয়ে নেয়। তার-পর আমি খেয়ে ঘরে আসতে আসতে আর এক ঘুম। রাত্রেও এমন নিঃসারে ঘুমোয় যে বাড়ীতে যদি চোর ডাকাতও ঢোকে—'

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রেণু একটুকাল চুপ ক'রে রইল, তারপর বলল, 'তা ছাড়া যেদিন একটু বেশি খাটুনি হয় সেদিন তো কথাই নেই।'

বললাম, 'রোগা মানুষকে অত খাটাও কেন?'

রেণু বলল, 'আমি কি আর খাটাই। সে যে রোগা নয় তাই প্রাণপণে প্রমাণ করবার জন্যেই ইচ্ছা ক'রে খাটে। বিয়ের সময় যেমন রোগের কথা চেপে

গিয়েছিল, এখনও তেমনি চেপে রাখতে চায়। আর এই গোপন ভাবটাই আমার সব চেয়ে খারাপ লাগে। এত বিশ্রী লাগে দেখতে যে বলবার নয়। পৃথিবীতে আর কোন রোগই বোধ হয় এত কদর্য হয় না।'

রেণুর মুখে সত্যিই একটা ঘৃণার ছাপ পড়ল।

রাত সাড়ে দশটার সময় আমি আর শীতাংশু ওদের শোবার ঘরের মেঝেয় আসন পেতে খেতে বসলাম। মাংস ছাড়াও আরো কয়েকটা ভাল তরকারি রান্না করেছে রেণু। আমি যে-তরকারি যে-ধরণের রান্না পছন্দ করি তার কিছুই দেখছি ও ভোলেনি।

খাওয়া সেরে প্রায় দু' জনেই এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। আলমারির আয়নায় পাশাপাশি আমাদের ছায়া পড়ল। তোমরা আমাকে রূপবান বলে অনেক দিন প্রশংসা করেছ। আর আমি তাতে লজ্জিত হয়ে ভেবেছি মেয়েদের মত কেবল কি আমার রূপটাই আমার বন্ধুদের চোখে পড়ল। মনে হোত রূপের সঙ্গে পৌরুষের যোগাযোগটা যেন খুব ঘনিষ্ঠ নয়। রূপটা আসলে মেয়েলি। কিন্তু আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম। কেবল লম্বায় নয়, শ্রীতে, শক্তিতে সব দিক থেকেই শীতাংশুর তুলনায় আমার জিৎ। আমি আরও জিতব। আমি ঠকতে আসি নি, ঠকতে চাইনি, আমি ঠকতে পারব না।

লেপ তোষক টানাটানি ক'রে বাইরের ঘরের তক্তপাষে রেণু সযত্নে আমার বিছানা পেতে দিল। শীতাংশুও স্ত্রীকে সাহায্য করতে আসছিল, রেণু ধমকে তাকে নিরস্ত করল। শীতাংশু ফিরে গেল তার ঘরে।

আমার দিকে একটু কাল তাকিয়ে থেকে রেণু বলল, 'দেখ আর কিছু তোমার চাই না কি?'

বললাম, 'কেন এত হৈ চৈ করছ। তার চেয়ে আমাকে ছেড়ে দিলেই তো ভালো করতে।'

রেণু একটু হাসল, 'ধরেই বা তোমাকে কে রেখেছে। যাও না।'

পানের খিলি এগিয়ে দেওয়ার সময় ওর আঙুলগুলি আমার হাত ছুঁয়ে গেল।

এমনি ছোঁয়াছুঁয়ি তো এর আগে কত দিনই হয়েছে। কিন্তু কোন দিন কিছু টেরও পাই নি লক্ষ্যও করিনি। আজ কিছুই আমার চোখ এড়াল না।

শুধু কি চোখ? সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমি ওর অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম আজ আর কারোরই এড়াবার যো নেই। এড়াবার ইচ্ছাও কি আর আছে?

আমার মনে হোল এত দিন শুধু মনকে চোখ ঠেরেছি। ব্যাঙ্কের বড় বড় খাতাপত্রের আড়ালে সব ঢেকে রাখতে চেয়েছি। কিন্তু কিছু কি চাপা রইল, কিছু কি ঢাকা রইল?

রেণু একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তারপর, বিয়ে টিয়ে করবে কবে? না কি ভেবেছ সংসারে কোন কিছুর ভার না নিয়ে এমনি চিরকাল কাটিয়ে দিতে পারবে?

বললাম, 'এতদিন তাই ভেবেছিলাম।'

'আর আজ।'

'আজ কি ভাবছি তা-কি তুমি টের পাচ্ছ না?'

রেণু বাইরের অন্ধকারের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'ওমা তোমাকে জল দেওয়া হয় নি।'

বললাম, 'ঠিক জলটা তো চাই আমার, জল নিয়ে এসো।

রেণু বলল, 'আনছি। কিন্তু জল থেকে যে আগুন জ্বলে তার ভালো বাংলাটা যেন কি তুমি সেবার বলেছিলে—'

বললাম, 'বাড়বাগ্নি। তা জ্বলুক। তাতে আমার আর ভয় নেই।'

আমি উঠে ওর হাত ধরতে গেলাম। রেণু দু' পা পিছিয়ে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'যাই, জল নিয়ে আসি।'

বললাম, 'আসবে তো?'

'আসব। এসে যেন না দেখি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ!'

বললাম, 'আমি সারা রাত জেগে থাকব।'

সারা রাতই আমি জেগে রইলাম। আমি জানি জল নিয়ে রেণু একবার আসবেই। না এসে ওর যো নেই। ও-ও যে তৃষ্ণার্ত তা আমি টের পেয়েছি।

রাত গভীর হতে লাগল, অন্ধকার গভীর হতে লাগল, সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু শিয়রের কাছ থেকে আমার হাত ঘড়িটার শব্দ হতে লাগল। কিন্তু হাত ঘড়ির শব্দ কি অত জোরালো হয়? না, এ শুধু হাত ঘড়ি নয়।

হৃৎপিণ্ড দিয়ে তৈরী এ আর একটা বড় ঘড়ির পেণ্ডুলাম। আশায় আশঙ্কায় তা বারবার দোল খাচ্ছে, ঘা খাচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্য, রাত প্রায় শেষ হয়ে এল; মোমের মত জ্বলে জ্বলে আমি নিঃশেষিত হলাম—রেণু এল না। ব্যাপারটা কি। ও কি ভয় পেল, না ধরা পড়ল, না কি ছলনা করল আমার সঙ্গে! তা ঠিকমত না জেনে আমি যেতে পারব না।

সরু লম্বা করিডোর পেরিয়ে পা টিপে টিপে আমি ওদের ঘরের সামনে গিয়ে দাড়ালাম। দোর যদি বন্ধ দেখি, সে দোরে আমি ঘা দেব। দোর না ভাঙলেও সুখ নিদ্রা ভাঙবে।

কিন্তু না, দোর বন্ধ নয়। আধো খোলা দোরের ভিতর দিয়ে ঘরের আলো দেখা যাচ্ছে। আমি একটু দাড়ালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা শব্দ আমার কানে আসতে লাগল। হাপানির টান। একটা লোকের কাছে গোটা পৃথিবী একেবারে নিবায়ু হয়ে পড়েছে। সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসের এক ফোটা বাতাস সে খুঁজে পাচ্ছে না।

ফিরে আসছিলাম। ভিতর থেকে রেণু জিজ্ঞাসা করল 'কে ওখানে?'

সাড়া দিয়ে বললাম, 'আমি।'

রেণু বলল, 'এসো, ঘরে এসো।'

ঘরে গিয়ে শীতাংশুর বিছানার কাছে দাড়ালাম।

শীতাংশু তেমনি শ্বাস টেনে চলেছে। তার পাশে বসে পরিচর্যা করছে রেণু। বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

আমি বললাম, 'কখন থেকে এমন সুরু হোল।'

রেণু বলল, 'সেই প্রথম রাত থেকে। সারা রাতের মধ্যে একটু যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকি। এত ক'রে বলি অনিয়ম অত্যাচার কোরো না; কিন্তু একটা কথাও যদি আমার কানে তোলে। এ যন্ত্রণা আমি আর সইতে পারিনে।'

শীতাংশু ক্লিষ্ট স্বরে কি একটু প্রতিবাদ করতে করতে পাশ ফিরল। আর আমি ভোরের গাড়িতে কলকাতা ফিরলাম।

রোহিণী তার গল্প শেষ ক'রে আর একটা সিগারেট ধরাল।

সত্যেন বলল, 'তুমি সুরুতে পোষা রোগের কথা কি বলছিলে।'

রোহিণী একটু হাসল, 'আমি শেষেও ঠিক সেই কথাই বলছি। সে রাত্রের রোগটা শীতাংশুর শুধু পোষাক নয়, পোষাকী। থিয়েটারের পোষাক।'

অরুণ প্রতিবাদ করল, 'তুমি কি ক'রে বুঝলে যে সেটা রোগ নয়—রোগের পোষাক! যত সব বাজে আন্দাজী কথা।'

রোহিণী বলল, 'দেখ, তীরন্দাজের আন্দাজটাই সব। আমি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। এ্যাজ্‌মা তো আমি এই নতুন দেখলাম না। নিজে না ভুগলেও একজন বন্ধুকে তো ভুগতে দেখেছি। তা ছাড়া কেবল আমি কেন, সে রাত্রের এ্যাজ্‌মার টানটা যে আসলে কিসের টান আমার মনে হয় তা রেণুও বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেই সে আর পা বাড়াতে পারে নি। নকল রোগের ভিতর থেকে আসল মানুষটীকে সে-ই বোধহয় রেণু প্রথম চিনল। হয়ত সেই ওদের প্রথম শুভরাত্রি।

বেসুরো

এত অপ্রস্তুত মানসী আর কোন দিন বোধ করে নি, স্বামীর বন্ধু অবনী সোমের একান্ত অনুরোধে পড়ে গান গাইতে বসেছিল, প্রথম থেকেই অবশ্য বলেছিল মানসী ক'দিন ধরে গলাটা ভালো নেই ; চাপা সর্দিতে ভার ভার হয়ে আছে গান না হয় অবনীবাবুকে আর একদিন শোনাবে, কিন্তু অবনী কিছুতেই শুনল না, বলল, যারা গাইতে জানে তাদের কোন দিনই বা গলা ভালো থাকে, আধ ঘন্টা সাধা-সাধির পর তবে গলা ভালো হয়। মানসীর স্বামী সলিলও বন্ধুর পক্ষে যোগ দিল বলল, 'আহা গাওই না অত করে যখন বলছে অবনী।'

সলিল নিজে গান জানে না, কিন্তু গান শোনার ভারি আগ্রহ, বন্ধুদের ডেকে স্ত্রীর গান শোনানোর আগ্রহ তার আরো বেশি, কোন দিন গলা ভালো থাকে না, মেজাজ থাকে না গাওয়ার মত, সে সব বোধ তার নেই, তবু মানসী তার ওপর রাগ করে না, স্বামী তার গাইবার শক্তিকে মনে মনে বেশ একটু গর্বের সামগ্রী বলে মনে তা করে মানসীর জানতে বাকি নেই, কোন আত্মীয় বন্ধু এসে স্ত্রীর মিষ্ট কণ্ঠের সঙ্গে তাদের পরিচিত করার সুযোগ খোঁজে সলিল। একেক সময় বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। লজ্জা করে মানসীর কিন্তু সেই সঙ্গে আনন্দও হয়।

অবনী সোম স্বামীর পুরোন বন্ধু। এক সঙ্গে দুজনে কলেজে পড়েছে কিন্তু মানসীর সঙ্গে এই প্রথম তার পরিচয় হলো।

অবনী হেসে বলল, 'বিয়ের সময় সলিল আমাকে ফাঁকি দিয়েছে, কোন খোজ-খবর করেনি, আপনি আর ফাঁকি দেবেন না।'

বেশ চমৎকার কথা বলবার ধরন অবনীর। দেখতে ও মোটামুটি সুপুরুষ, বয়স ত্রিশের নিচে, লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান চেহারা, বেশ-বাসে বিলাসিতা নেই, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা আছে। গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী কিন্তু সদ্য ইস্ত্রি ভাঙা,

পরনের ধুতিখানি খুব যে মিহি তা নয়, কিন্তু পরবার ধরনের মধ্যে যত তার নৈপুণ্য আছে. কোঁচাটি সরু, সুন্দর করে কোঁচান, মসৃণ ব্যাকব্রাস করা চুল, দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো, পায়ের জুতা জোড়া দামি নয়, খুব নতুনও নয়, কিন্তু পালিসে মসৃণ, বেশ ভালো লাগল মানসীর। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারল স্বামীর বন্ধু স্বামীর মত এলোমেলো অগোছালো গোছের পুরুষ নয়।

অবনী আরো একবার অনুরোধ করতে হারমনিয়মটা খুলে নিয়ে বলল, 'এ গলায় কেউ ভদ্রলোকের সামনে গান গায় না, নিন্দে করতে পারবেন না কিন্তু, বাঁয়া তবলাটা আবার মানিকতলার সুলতাদি নিয়ে গেছেন।' অবনী বলল, 'ভালোই করেছেন। তবলা থাকলেই বা কি হোত তবলচি পেতেন কোথায়, না কি সলিল আজকাল বাজাতে টাজাতে শিখেছে।'

মানসী হাসল, 'আপনার বন্ধু শিখবেন বাজনা, তবেই হয়েছে।'

তারপর পর পর দু'খানি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইল মানসী। একখানা আগেকার দিনের রচনা, ক্লাসিক সুর। আর একখানা বিশিষ্ট রাবীন্দ্রিক ঢঙের।

ড্রেসিং টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে গান শুনতে শুনতে পকেট থেকে দেশলাই বের করল অবনী, কিন্তু সিগারেট ধরাল না, দেশলাইর খোল দিয়ে টেবিলে টোকা দিতে লাগল।

গান শেষ হবার পর অবনি বলল, 'বাঃ তোমার স্ত্রী এমন চমৎকার গাইতে পারেন, একথা কোনদিন তো আমাকে বলনি সলিল।'

স্বামীর বন্ধুদের এর চেয়েও বেশি প্রশংসা মানসী শুনেছে, কিন্তু এমন অকৃত্রিম আনন্দের প্রকাশ বহুদিন দেখেনি।

মানসী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি যে বলেন। এমন কিছু গাইতে পারিনে যার জন্য অত প্রশংসা পেতে পারি, কিন্তু তবলায় আপনার বেশ হাত আছে বলে মনে হয়!'

অবনী হেসে বলল, 'তবলায় না টেবিল দেশলাইতে বলুন।' মানসী হেসে হারমনিয়মে আরো একটা গানের সুর তুলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা বড় বেসুরো কথা বলে বসল অবনী, 'আচ্ছা আপনার কি টনসিলিটির দোষ আছে।'

রীডে আঙুল রেখে মানসী বিস্মিত হয়ে বলল, 'না তো।'

অবনী বলল, 'অবশ্য গোড়ার দিকে টনসিলিটি তেমন টের পাওয়া যায় না, আচ্ছা মাঝে মাঝে খুব সর্দিটর্দীতে ভোগেন তাই নয়?'

মানসী বলল 'হ্যাঁ, ঠাণ্ডা তেমন সয়না আমার। একটু হলেই গলা বসে যায়

অবনী বলল, 'গায়িকাদের পক্ষে এ-তো ভালো কথা নয় তা ছাড়া আপনার গলা এত খারাপ হয়ে আছে জানলে আমি কিছুতেই এমন পীড়াপীড়ি করতাম না।'

মানসীর গলা একটু ভার ভার ছিল ঠিকই; কিন্তু সলিল আর তার বন্ধুদের দৌরাত্ম্যে সব রকম গলায়ই তার গাইবার অভ্যাস আছে। অবনীর কথায় ভারি লজ্জিত, ভারি অপ্রস্তুত হোল মানসী, একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কেন গান কি খুব খারাপ শুনলেন?'

অবনী বলল, 'ওই দেখুন, আমি কি তাই বলেছি, বরং খুব চমৎকার গেয়েছেন আপনি, কিন্তু গলা সম্বন্ধে আপনার Concious হওয়া দরকার, আরো Care নেওয়া দরকার। আপনাদের গলা হলো সম্পদ আমাদের মত চেঁচাবার ঝগড়া করবার গলা তো নয়।'

মানসী কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'শ্লেষ্মার দোষ আছে, মাঝে মাঝে বড় ভুগি।'

অবনী একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'এমন ভোগা তো মোটেই উচিত নয়। একজন ডাক্তার-টাক্তার দেখালেই তো পারেন।'

মানসী বলল, 'এর জন্য আবার ডাক্তার।'

অবনী জোর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ এর জন্যই ডাক্তার। আপনার হাতে পায়ে কোন ব্যাধি হলে বলতাম না, কিন্তু গলার জন্য না বলে পারছিনে।'

এরপর সলিল বলল, 'আমিও অনেক দিন ভেবেছি একজন ডাক্তার-টাক্তার কাউকে দেখাই, কিন্তু যাই যাই করে আর হয়ে ওঠেনি। সময়ও পাইনে। যত সব ক্ষুদে মক্কেল নিয়ে কারবার! ঘটি বাটি চুরির সাফাই গাইতে গাইতে দিন কেটে যায়।'

অবনী বলল, 'তাহলেও ওর সম্বন্ধে Negligenceটা তোমার ঠিক হয়নি।'

সলিল এবার জিজ্ঞেস করল, 'আছে নাকি জানাশোনা তোমার কোন থ্রোট স্পেশালিষ্ট?'

অবনী বলল, 'আজকাল স্পেশালিষ্টদের আর অভাব কি? মেডিক্যাল কি কারমাইকেলেও নিয়ে যেতে পারো।'

সলিল বলল, 'না—না—না, তবু একটু জানাশোনা থাকলে সুবিধা হয়।'

অবনী একটু কি চিন্তা করে বলল 'জানাশোনা অবশ্য সামান্য একটু আছে। বালীগঞ্জের কমলেশ সান্যাল গলার রোগই দেখেন সাধারণত। অনেক গায়ক গায়িকার মুখে ওঁর নাম শুনেছি। আমি নিজেও দু একজন পেশেন্টকে পাঠিয়ে দেখেছি। চমৎকার ফল পেয়েছেন তাঁরা।' তারপর মানসীর দিকে ফিরে তাকাল অবনী, 'আপনি চিনবেন মিসেস রায়, বল্লরী দত্ত, আর অঞ্জন মুখার্জী, রেডিও আর্টিষ্ট।'

মানসী ঘাড় কাৎ ক'রে একটু হাসল, 'খুবই চিনি। ওঁরাও গিয়েছিলেন না কি?'

অবনী বলল, 'হ্যাঁ, গলার রোগে বেশ ভুগছিলেন। মাঝখানে তিনমাস কেউ কোন প্রোগ্রাম নেন নি লক্ষ্য করেছেন বোধ হয়। আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম কমলেশবাবুর সঙ্গে, শুনলাম মাসখানেকের মধ্যেই কিওরও হয়েছেন। এই তো পরশু বোধ হয় দুজনেরই প্রোগ্রাম ছিল।'

মানসী বলল, হ্যাঁ, আপনি তো সব খোঁজ খবর রাখেন দেখছি। বেশ তো আমাকেও—'

অবনী বলল, 'আচ্ছা, তা দেওয়া যাবে না হয়।' তারপর সলিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা তেমন কিছু Expensiveও নয়। সপ্তাহখানেক কি সপ্তাহ দুই লাগে, দুটি কি তিনটি পুরে দেন বাস।'

সলিল বলল, 'পুরে? হোমিওপ্যাথ নাকি?'

অবনী বলল, 'হ্যাঁ, কেন হোমিওপ্যাথিতে কি তোমার বিশ্বাস নেই?'

সলিল হেসে বলল, 'তা ঠিক নয়, আমার বিশ্বাস সব প্যাথিতেই সমান। যখন যেটির সুবিধা—অসুখ সারলেই হোল। কোন ডাক্তারের কোন ওষুধে সারল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।''

অবনীও হাসল, 'তার চেয়ে দাগী চোরকে কি করে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রমাণ করবার ফন্দীটি বের করতে পারলে তোমার দুটো পয়সা বেশি আসে, তাই না?'

সলিল বলল, 'পয়সা আর কই ভাই, যা দিনকাল, বেশ তো তোমার কমলেশ বাবুকেই দাওনা একটি কল।'

অবনী বলল, 'কল দিলে তো সেই টাকা ষোলর ধাক্কা।'

সলিল বলিল, 'বল কি অত?'

অবনী বলল, 'তার চেয়ে এক কাজ কর না। পরশু তো রবিবার আছে। বেড়াতে বেড়াতে নিয়ে যাওনা বৌদিকে। তাতে দোষ কি, বড় বড় ঘরের বউ-ঝিরা পর্যন্ত যায়। তাছাড়া কমলেশ বাবুও চেয়ার ছেড়ে বড় একটা বেরুতে চান না। বেরুলেই ক্ষতি। বহু রোগী এসে বসে থাকে। তাই যাও। ওষুধ টষুধ নিয়ে আট-দশ টাকার বেশি বোধহয় পড়বে না।'

সলিল একটু চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে যাওয়া চাই।'

অবনী বলল, 'আমাকে আবার টানাটানি কেন, ঠিকানা দিলে চিনে যেতে পারবে না? ঠিক গড়িয়াহাটার মোড়ে, বড় রাস্তার ওপরেই।' এবার মানসী অনুরোধ করল, ''তা হোক। তবু আপনি আসবেন অবনীবাবু। আপনার বন্ধুটিকে তো জানেন। রবিবার ঘর থেকে আর বেরুতে চান না।

অবনী একটু হেসে বলল, 'কিন্তু ঘর যদি সঙ্গে থাকে তাহলে আর বেরুতে আপত্তি কি? আচ্ছা, চেষ্টা করব আসতে।'

মানসী বলল, 'চেষ্টা নয়, নিশ্চয়ই আসবেন। চা খেয়ে একসঙ্গে বেরুব।'

রবিবার বেলা সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই চলে এল অবনী, মানসী ডিমের মামলেট করল, পরোটা হালুয়ার প্লেট সাজিয়ে অবনীর সামনে রাখল।

অবনী বলল, 'এ কি, শুধু যে চায়েরই কথা ছিল।'

সলিল বলল, 'আহা, খাওনা। কিছু কিছু কথা রাখলে দোষ হয় না।'

চা জলযোগে আপ্যায়নের পর মানসী উঠে গেল কাপড় ছাড়তে, বেশ-বাস পরে আয়নার সামনে একটু দাঁড়াল, তেমন কিছু পারিপাট্য যে করেছে তা নয়, ঘি রঙের একখানা শান্তিপুরী, কানে ইদানী'কার শূন্যগভ ইয়ারিং, গলার সরু হার, আর হাতে চারগাছা করে চুড়ি, গলায় মুখে পাউডারের ছোপ পড়েছে কি পড়েনি, কিন্তু নিজের চোখেই যেন কেমন কেমন লাগছে। ঠিক যেন রোগিণীর মত মনে হচ্ছে না নিজেকে। গলার কথা ভাবতে অবশ্য একটু উদ্বেগের ভাব এল, চেষ্টা করে একটু আনতেও গেল।

পুরোন ঝি উষাকে সব বুঝিয়ে টুঝিয়ে দিল মানসী। দরকার মত রান্নার কাজও ওকে দিয়ে চলে। খানিক বাদে বসবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'কই চলুন।'

অবনী হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল—সলিল তা লক্ষ্য করে হেসে বলল,'অত অধীর হয়ো না অবনী, মানসী আজ বেশি সময় নেয়নি। মোটে আধ ঘন্টা।'

মানসী বলল, 'আপনারা বুঝি এতক্ষণ ঘড়ি দেখছিলেন?'

অবনী জবাব দিল, 'হ্যাঁ, এতক্ষণ দেখবার মত আর কিছু ছিল না।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আরক্ত হয়ে উঠল মানসী। স্বামীর বন্ধুরা এসে কেবল যে গান শোনে না, চেয়েও দেখে তা মানসী না জানে তা নয়। কিন্তু অবনীর চোখের অভিনন্দন একটু নতুন ধরনের, কেমন যেন গা শির শির করে।

গড়পাড় থেকে গড়িয়াহাটা দীর্ঘ পথ। রবিবার। দারুণ ভিড় বাসে। লেডীস সীটে একজন স্থূলাঙ্গিনীর পাশে কোন রকমে একটু জায়গা মিলল মানসীর। সলিল আর অবনী চলল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। খানিক বাদে মির্জাপুরের মোড়ে এসে ভদ্রমহিলাটি নেমে গেলেন।

অবনী সলিলকে বলল, 'যাও, এবার দখল কর জায়গা।'

সলিল বন্ধুকে বলল, 'তুমি বস গিয়ে।'

অবনী হেসে বলল, 'উঁহু, ওখানে বসা নিরাপদ নয়। দু মিনিট বাদেই ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে।

পরে সামনের বেঞ্চ থেকে একজন লোক উঠে গেলে অবনী তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে বসল।

মানসী মনে মনে ভাবল, কি লাজুক! পাছে জোর ক'রে কেউ ধ'রে বসিয়ে দেয় তাই তাড়াতাড়ি সরে যাওয়া হোল, কিন্তু অসভ্য তো সলিলও কম নয়। কি দরকার ছিল অবনীকে বসতে বলবার। বেশ মূর্খের মত জবাব দিয়েছে। কিন্তু ওভাবে কথাটা না বললেও তো পারতো অবনী। মানুষকে ভারি লজ্জা দিতে পারে।

অবনীকে সীট নিতে দেখে সলিল এসে পাশে বসল মানসীর।

মানসী বলল, 'উকিল হয়ে বার বার কথায় হারো কেন। ঠিকমত জবাব দিতে পারো না?'

সলিল এ প্রশ্নেরও কোন জবাব দিতে না পেরে মৃদু হাসল।

একতলায় দোকানপাট, দোতলায় করিডোরের দু দিকে সারি সারি ডাক্তারের চেম্বার। পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অবনীর পিছনে পিছনে

হেঁটে চলল মানসী আর সলিল। ডাঃ কমলেশ সান্যালের চেম্বার মিলল এতক্ষণে।

কাটা দরজা ঠেলে অবনীই আগে ঘরে ঢুকল। তারপর মানসীর দিকে তাকিয়ে বলল., 'আসুন'।

চেয়ারে কৌচে সুসজ্জিত ছোট্ট কেবিন। খানিক দূরে বড় একটা টেবিল ফ্যান ঘুরছে। দক্ষিণের জানালা দুটি খোলা। তার নিচে বাইশ তেইশ বছরের একটি কম্পাউণ্ডার কাজ করছে। লম্বা কৌচে জন দুই প্রৌঢ় বয়সী ভদ্রলোক বসে আছে। খানিকটা দূরে কালো পর্দায় ঘেরা ছোট্ট চেম্বার। তার ভিতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ আসছে।

অবনী সেদিকে একবার তাকিয়ে মানসীর দিকে ফিরে বলল, 'একটু বসতে হবে বোধ হয়, রোগী দেখছেন।'

মিনিট দুয়েক বাদেই কমলেশ বাবু বেরিয়ে এলেন। বছর পঞ্চাশেকের প্রৌঢ়। চুলে পাক ধরেছে। দেখতে বেশ। সাদা ট্রাউজারে চমৎকার মানিয়েছে। পরিচয় ও নমস্কার বিনিময়ের পর কমলেশবাবু বললেন, ''ট্রাবলটা কি।'

অবনী একটু হেসে বলল, 'ট্রাবল উনি নিজেই বলবেন। চমৎকার গাইতে জানেন। এমন অদ্ভুত সুর বোধ হয় আমি শিল্পীর আর কারো শুনিনি। কিন্তু গলার জন্য—

কমলেশবাবু মৃদু হেসে বললেন, আপনি এবার আসুন তো মা লক্ষ্মী। শুনি কষ্টটা কি।'

তারপর কালো কাপড় দিয়ে ঘেরা ছোট্ট খোপের ভিতরে নিয়ে গিয়ে সামনের চেয়ারে বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। চামচ দিয়ে জিভ চেপে ধ'রে গলার ভিতরটা দেখলেন একটু। তারপর মধুর স্বরে বললেন- 'রোগটা এমন কিছু শক্ত নয় মা, তবে শক্ত হতে পারে। কয়েক দিন একটু কষ্ট করে যাতায়াত করতে হবে। আর যা যা বলি ঠিক ঠিক মেনে চলতে হবে। দই, টক, ডিম, মাংস সব বন্ধ। আর গলা সম্পর্কেও কটা দিন একটু সতর্ক থাকতে হবে। গানটা কিছুদিন বাদ দিতে হবে। ঝগড়াটাও। সেটা অবশ্য চিরদিনের জন্য বাদ দিতে পারলেই ভালো হয়।'

মানসী এবার হাসল, 'তাই কি কেউ পারে?' তারপর ডাক্তার বাবু আরো দু' একটা ব্যাধির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর আন্দাজ বেশির ভাগই

মিলে গেল। অম্বলের দোষ আছে মানসীর, ভালো হজম হয় না, ঘুমের ব্যাঘাত হয় রাত্রে।

কমলেশ বাবু বললেন, 'আমি আগেই বুঝেছি। আচ্ছা, যে ওষুধ দিচ্ছি, তাতে ওসবও দেখবে। ওষধটা কিন্তু নিয়মিত খাওয়া চাই মা, আর খুব সাবধান যেন কুপথ্য না পড়ে। তাহলে কিন্তু কিছু করতে পারব না।'

মানসী ভরসা দিল, কুপথ্য পড়বে না। কিন্তু ক'দিন গান বন্ধ করে থাকতে হবে বলুন তো?'

'এখন মাস খানেক মাস দেড়েক, বেশি দিন নয়।,

কম্পাউণ্ডারকে মুখে মুখে কয়েকটা ওষুধের নাম এবং ডোজ বলে দিলেন ডাক্তারবাবু। মিনিট দশেকের মধ্যেই ওষুধ তৈরী হয়ে গেল।

অবনী সলিলের পাশে বসে ফিস ফিস করে বলল, 'আটটা টাকা দাও দেখি।'

দশ টাকার একখানা নোট বের করে দিল সলিল।

অবনী বিরক্তির স্বরে বলল, 'আঃ খুচরো, আটটা টাকা দাও না, ডাক্তার কবরেজের কাছে অনেক সময় চেঞ্জ পাওয়া মুস্কিল হয়।'

চেঞ্জ উকিলের কাছে পাওয়া গেল। ব্যাগে আরো আটটা টাকা আছে খুচরো।

সলিল বলল, 'কিন্তু দশ টাকার নোট পরে ভাঙাব কি করে?'

অবনী বলল, 'আচ্ছা তা পরে দেখা যাবে। এক প্যাকেট সিগারেট কিনলেই হবে।

উঠে গিয়ে অবনী আটটা টাকা কমলেশবাবুর হাতে দিয়ে বলল, 'আমি হাতে করে দিচ্ছি ডাক্তারবাবু কিছু বলতে পারবেন না। আমার বিশিষ্ট বন্ধু আগেই বলেছি।'

কমলেশবাবু একবার অবনীর দিকে তাকালেন তারপর বললেন, 'আচ্ছা, That will do.'

নমস্কার বিনিময়ের পরে বেরিয়ে এল মানসীরা। তিন দিনের ওষুধ দিয়েছেন ডাক্তার বাবু। চতুর্থ দিনে ফের আসতে হবে।

সিড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে মানসী বলল, 'অত দর কষাকষি করছিলেন কেন। ওঁর যা ফি দিলেই হোত, মিছামিছি আমাদের জন্য—'

অবনী বলল, 'লোকে বন্ধু-বান্ধবদের জন্য যা করে তা মিছামিছি করে না।'

তারপর মানসীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'গান কিন্তু শোনাতে হবে। গলা যেদিন ভাল হয়ে যাবে, গান গাওয়ার পারমিশন পাবেন, সেদিন কিন্তু গলা ভালো নেই, গলা ভালো নেই বলতে পারবেন না।

মানসীও হেসে জবাব দিল, 'সেইজন্যই ডাক্তারের কাছে ধরে বেঁধে নিয়ে এলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, সেইজন্যই তো আনলাম।'

মোড়ে এসে অবনী, সলিল আর মানসীকে বাসে তুলে দিল।

সলিল বলল, 'সে কি তুমি আসবে না?'

অবনী বলল, 'না ভাই' টালিগঞ্জের দিকে কাজ আছে আমার একটু, সেখানে যেতে হবে।'

তাহলে শুক্রবার দিন কিন্তু অবশ্য আসবেন।'

শুক্রবার দিন অবশ্য অবনী এলোনা। মানসী মাঝে মাঝে প্রত্যাশা করলেও সলিল বল্‌ল, 'ক্ষেপেছ? উইক ডেজ এ সকাল বেলায় সে আসবে কি করে? অপিস টপিস তো আছে সবারই।'

কোর্ট থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যার পর সলিলই গড়িয়াহাটায় নিয়ে গেল স্ত্রীকে, রবিবারের সকাল বেলার মত শুক্রবারের এই সান্ধ্য ভ্রমণটুকুও বেশ লাগল মানসীর।

সলিলের বড় একটা বেরুবার অভ্যাস নেই, স্ত্রীকে নিয়ে তো নয়ই, কোর্ট থেকে ফিরে এসে চা-জলযোগ শেষ হলে পার্কে একা-একাই বেড়াতে বেড়ায়, রাত্রে যদি কোন মক্কেল টক্কেল আসে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চলে, না হলে আইনের বই আছে, নিতান্তই যখন ওসব ভালো লাগে না পাড়ায় ক্লাব-ঘরে গিয়ে বসে।

মানসীরও একা-একা থাকা যেন অভ্যাস হয়ে গেছে ঠিক একা-একা নয়, গৃহস্থালী আছে, অবসর যাপনের জন্য আছে গান, আছে রেডিও।

গড়িয়াহাটার চিকিৎসা উপলক্ষে এই যাতায়াতটুকু দুজনার মনেই বেশ একটু নতুনত্বের স্বাদ আনল। কমলেশবাবু আজ খুব যত্ন করে দেখলেন, ওষুধ পালটে দিলেন মানসী যখন নালিশের ভঙ্গিতে বলল 'আপনার ওষুধ খেয়ে অসুখ তো বেড়ে গেছে ডাক্তারবাবু।' তিনি মিষ্টি হেসে বললেন,

'সেইতো আমার কথা মা। হোমিওপ্যাথিক ওষুধে প্রথমে একচোট বাড়ে, শেষে ছাড়ে।

ওষুধের দাম বাবদ আর চার টাকা রাখলেন কমলেশবাবু।

ফেরার পথে স্ত্রীকে নিয়ে বাসে পাশাপাশি বসে সলিল হঠাৎ বলল, 'দেখ এক হিসাবে অবনীর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

মানসী বলল 'কেন বলতো?'

সলিল বলল, 'এতদূরের ডাক্তারের কাছে ও টেনে নিয়ে এসেছিল বলেই আমাদের এই বেড়ানটুকু হোল। অনেক দিন পরে চাঁদ দেখলাম আজ।'

জানলার ফাঁকে গাছের আড়ালে খণ্ড চাঁদ মানসীর চোখে পড়েছিল, বেশ লাগছিল তারও; কিন্তু স্বামীর কথায় কৃত্রিম কোপের ভঙ্গিতে বলল, 'বাঃ, আমি এদিকে অসুখে ভুগছি, আর তুমি চাঁদ নিয়ে কবিত্ব করছ। ব্যাপার মন্দ নয়।

মাঝে মাঝে আরো একদিন খোঁজ নিতে এল অবনী, 'কেমন আছেন, গলার ট্রাবলটা একটু কমলো কি।'

মানসী বলল, 'তবু ভালো, এতদিন বাদে আপনার খোঁজ নেওয়ার কথা মনে হোল, কমলো আর কই। ওষুধ খেয়ে আরো বেড়ে গেছে। সপ্তাহে দু'বার করে ছুটছি ডাক্তারের বাড়িতে।'

অবনী বলল, 'কি আর করবেন বলুন। অন্য কোন রোগ হলে না হয়তো হেলা ফেলা করতে পারতেন, কিন্তু এতো আর কিছু নয়, গলা। ও জিনিস আপনার কেবল নিজের নয় আরো অনেকের।'

মানসী অবনীর দিকে তাকিয়ে একটু চোখ নামিয়ে নিল। অদ্ভুত দরদ অবনীর গলায়। আরো অনেকের মধ্যে অবনীও যে একজন সে কথাটা যেন আরো গোপন থাকতে চায় না, গোপন রাখতে চায় না অবনী। ভারি লজ্জা করতে লাগল মানসীর, সে কি সত্যিই অত ভালো গাইতে পারে? তার ভালো স্বাভাবিক গলার গানতো এখনো শোনেনি অবনী।

চা-টা খেয়ে বিদায় নেওয়ার সময় অবনী আরো একবার বলে গেল, 'খুব সাবধানে থাকবেন, খবরদার ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লাগাবেন না যেন। আর খালি গলায় কেন আছেন? একটা কম্ফর্টর-টম্ফর্টর জড়িয়ে রাখলেও তো পারেন।'

মানসী হেসে বলল, 'হ্যাঁ, এই গরমের মধ্যে একটা কম্ফর্টর জড়িয়ে দম বন্ধ হয়ে মরি। বেশ পরামর্শ দিচ্ছেন আপনি।'

সলিল বলল, 'ওর আবার গ্রীষ্ম বোধটা বেশি, বুঝলে অবনী? শীতের দিনেও—'

অবনী বলল, 'তা আমি আগেই টের পেয়েছি। শীতের দিনেও বোধ হয় গলার জন্য কিছু ব্যবহার করেন না, না? ওই রকম ঠাণ্ডা লাগিয়েই রোগটা তৈরী ক'রে বসেছেন আর কি! কিন্তু আমার কথা শুনুন, আপাতত একটু অসুবিধা ফীল করলেও সন্ধ্যার পর থেকে পাতলা মত একটা কম্ফর্টার জড়িয়ে রাখুন গলায়। তেমন পাতলা কম্ফর্টার নেই বাড়িতে?'

মানসী হেসে বলল, 'নেই। আপনি একটা ধার দিন না।'

প্রগল্‌ভতায় নিজেই যেন একটু লজ্জিত হলো মানসী। অল্প কয়েক দিনের আলাপ। অবনী কিছু মনে করল কিনা কে জানে?

কিন্তু দেখা গেল অবনী মোটেই নিরীহ আশ্রয়মৃগ নয়। মানসার কথায় সেও হেসে জবাব দিতে ছাড়ল না. থাকবে না কেন, আছে। কিন্তু আমার বাড়ির কম্ফর্টারে কি আপনার কাজ চলবে? আপনি কতখানি কম্ফর্ট পাবেন জানিনে, কিন্তু সলিলের হয়তো ডিস্‌কম্ফর্টের অন্ত থাকবে না।

মানসী আরক্ত হয়ে চুপ ক'রে রইল। কি জবাব দেবে ভেবে পেলো না। ভাবল, সলিল একবার যোগ্য জবাব দেবে।

কিন্তু সলিল উল্‌টোভাবে তার বন্ধুর পক্ষ নিয়েই বলল, 'কেমন? আর ঘাঁটাবে অবনীকে?'

যাওয়ার সময় অবনী আরো একবার অনুনয়ের ভঙ্গিতে গলা সম্বন্ধে মানসীকে সাবধান থাকতে ব'লে গেল।

রোগটা কিন্তু সহজে ছাড়ল না। প্রায় মাস দুই ধ'রে মানসীকে ওষুধ আনতে যেতে হ'লো ডাক্তারখানায়। কোন সপ্তাহে দু'বার, কোন সপ্তাহে একবার। কোন সপ্তাহে টাকা তিনেক খরচ হয়, কোন সপ্তাহে চার।

চাঁদ দেখাবার লোভ দেখিয়েও মানসী স্বামীকে প্রত্যেকবার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। মক্কেলের জরুরী কাজকর্মে আটকা পড়ে যায়। মানসীকে এক এক দিন একাই যেতে হয়।

সলিল বলে, 'যাওনা দিনের বেলায়, ভয় কি?'

মানসী জবাব দেয়, 'দিনের বেলায় কেন, ভয় আমার রাতের বেলায়ও নেই। পাছে তুমি ভয় পাও সেই ভয়। কিন্তু সলিল ততক্ষণে আইনের বইয়ের মধ্যে ডুবে গেছে।

একা একা চলাফেরার অভ্যাস আছে মানসীর। জার্নিটুকু মন্দ লাগে না। কেবল পথ নয়, ডাক্তারখানার আবহাওয়াটুকুও ভালোই লাগে। কমলেশবাবু বেশ ভদ্র ব্যবহার করেন। অবসর মত টুকটাক আলাপও চলে। ছেলে বেলায় কমলেশবাবুরও গান-বাজনার দিকে বেশ একটু ঝোঁক ছিল। এখন কাজের চাপে, সংসারের চাপে সব গেছে। কেবল ডাক্তার নয়, দু'চার জন রোগিনীর সঙ্গেও আলাপ হলো মানসীর। স্কুলের ছাত্রী, কলেজের ছাত্রী পড়তে পড়তেই কারো বা বিয়ে হয়ে গেছে। মা হয়েছে প্রথম ছেলের—ছেলের কোন অসুখই হয়তো দেখাতে এসেছে। কমলেশবাবু এরই মধ্যে দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, 'মানসী রায়, নামকরা গায়িকা। রেডিওতে মাঝে মাঝে প্রোগ্রাম দেন।'

মানসী বলল, 'তা তো হলো, গান গাইবার অনুমতি কবে পাব বলুনতো, এর পর যে সব ভুলে যাব।'

কমলেশবাবু বলেন 'অত অধীর হলে কি চলে মা লক্ষ্মী, রোগ অলস ঘোড়ায় চড়ে আসে, যাবার সময় যায় গরুর গাড়িতে, আর বেশি দেরি হবে না। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই সম্পূর্ণ কিওরও হয়ে যাবেন।

এরমধ্যে এক কাণ্ড ঘটল, কমলেশবাবুর ডিসপেনসারিতেই দেখা হয়ে গেল অবনীর সঙ্গে, একা আসেনি অবনী। ত্রিশ বত্রিশ বছরের আরো একটি যুবক, আর তাঁর সঙ্গে আঠার উনিশ বছরের লম্বা ছিপ-ছিপে একটি মেয়ে, তার গলায় নীল রঙের সত্যিই একটি কম্ফর্টার জড়ানো।

অবনী নিজেই এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার বন্ধু সুকোমল সেন, আর এটি তার বোন অনীতা, বি. এ. পড়ছে। গান-বাজনারও সখ আছে বেশ, কিন্তু সখ থাকলে হবে কি, গলার অবস্থা কি ক'রে রেখেছেন দেখুন।'

মানসী বলল, 'কি হয়েছে, ও'র গলায়?' অবনী বলল 'প্রায় আপনার মতই অবস্থা, ডাক্তারবাবু কি ডায়াগ্‌নোস করেন দেখা যাক্‌।'

ভাই-বোনকে কমলেশবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, ফিরে এসে মানসীর পাশেই বসল অবনী, 'তারপর কেমন আছেন বলুন, গলার খবর কি, একাই যে, সলিল আসেনি?'

মানসী বলল, 'না। মাঝে মাঝে একাই আসি আজকাল।'

'ভারি অন্যায় তো সলিলের।'

মানসী বলল, 'কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তা ছাড়া আপনারই তো বন্ধু, আপনারও তো মাসখানেকের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ নেই।'

অবনী বলল, 'জানেন তো কলকাতার সহর, এখানে ইচ্ছার সঙ্গে সময়ের দিনরাত দাম্পত্য কলহ চলে।'

মানসী মুখ টিপে হাসল, 'বিয়ে তো করেননি। দাম্পত্য কলহের মর্ম কি ক'রে জানলেন, তা'ছাড়া দম্পতীরা বুঝি কেবল কলহ-ই করে!'

অনীতা বার বার এদিকে তাকাচ্ছিল, মানসী গম্ভীর হয়ে থেমে গেল। একটু বিরক্তও যে না হলো তা নয়।

খানিক বাদে অনীতা আর মানসী দু'জনকেই ছেড়ে দিলেন ডাক্তারবাবু।

বাইরে এসে বন্ধু আর তার বোনকে বিদায় দিয়ে অবনী বলল, 'আচ্ছা এসো তোমরা, ডাক্তারবাবু যা যা বললেন তাই মেনে চল অনীতা, সিরিয়াস কিছু নয়, শিগ্‌গিরই সেরে যাবে। আমাকে একটু এন্টালীর দিকে যেতে হবে।'

দশ নম্বর বাস-এ উঠে মানসীর পাশে এসেই বসল অবনী। কণ্ডাকটরের কাছ থেকে টিকেট নিল দু'খানা।

মানসী বল্‌ল, 'ওকি, আপনিই সব দিচ্ছেন যে।'

অবনী একটু হাসল, 'একই কথা, আমি না দিলে আপনি সব দিতেন, দু'জনে একসঙ্গে গেলে একজনকে না একজনকে সব দিতে হয়, সামান্য টিকিটের দাম তো—'

মানসী আর কোন কথা বলল না। একটু কাল চুপ ক'রে থেকে প্রসঙ্গ পালটে বলল, অনীতাদেবীর কি অসুখ?'

অবনী বলল, 'ওর অসুখটা একটু শক্তই, অনেক দিন ধ'রে ভুগছে। সুকোমল বলছিল, সম্বন্ধ এসে ফিরে যাচ্ছে এই অসুখের জন্যে। বেচারা, দিলাম কমলেশবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে, গলার অনেক কঠিন কঠিন রোগ উনি সারিয়েছেন। ওঁর ওপর ভরসা করা যায়। আপনি কেমন বোধ করছেন?'

মানসী বলল, 'অনেকটা ভালো। ডাক্তারবাবু তো বলেছিলেন দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই—।'

অবনী বলল, 'আমাকেও তাই বললেন। এবার খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাচ্ছেন আপনি, গলার স্বর শুনেই বেশ বোঝা যায়। স্বাস্থ্যও বেশ ভালো হয়েছে আপনার।'

মানসী লজ্জিত ভঙ্গিতে চুপ ক'রে রইল।

মৌলালীর মোড়ে এসে অবনী নেমে পড়ল। বলল, 'এই নিন আপনার টিকেট, অবশ্য এ টিকেট আর বেশিক্ষণ চলবে না, শিয়ালদহ পর্যন্ত, তারপর তো আপনাকেও বাস বদলাতে হবে।'

মানসী বলল, 'তা হবে, কিন্তু আমাদের বাসায় যাবেন না?'

অবনী কৈফিয়তের সুরে বলল, 'আজ একটু কাজ আছে, আর একদিন নিশ্চয়ই যাব।'

অবশেষে একদিন কমলেশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ মা, এবার তুমি সুস্থ হয়েছ। এখন আর আপাতত ওষুধ ব্যবহারের দরকার নেই। তবে গলা সম্বন্ধে খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে তোমাকে।'

মানসী বলল, 'তাতো চলবই ডাক্তারবাবু, গলাটা তো আমার।'

কমলেশবাবু বললেন, 'সে কথা যেন মনে থাকে মা, জানোতো নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে নিজের এ কথা যেই লোকে ভুলে যায়, অমনি সেগুলি চলে যায় ডাক্তারের দখলে।'

বাড়ি এসে সেদিনই বিকালে হারমনিয়ম নিয়ে বসল মানসী, অনেকক্ষণ ধ'রে নানারকম সুর ভাঁজল। কোর্ট থেকে ফিরে এসে সলিল বলল, 'খুব স্ফূর্তি যে, গলার বাঁধন খুলে গেছে বুঝি?'

মানসী বলল, 'হ্যাঁ।'

সলিল বলল, 'দেখ এক কাজ করা যাক্। বন্ধুরা অনেক দিন ধ'রে ক্ষেপাচ্ছে, ওদের নাকি আর চায়ে-টায়ে বলিনে, সাম্‌নের রবিবার বলি, সেই দিন একটু গান-টানেরও আয়োজন করা যাবে।'

মানসী খুশি হলো, সেও মনে মনে তাই ভাবছিল, স্বামী হিসাবে সলিল আদর্শ। নিজের মানের কথা বেশীর ভাগ সলিলের মুখেই শুনতে পায় মানসী।

কাকে কাকে বলা হবে, সর্বাগ্রে অবনী সোমের নাম মনে পড়ল মানসীর। কিন্তু সব চেয়ে আগে বলল না, আরো দু'একটা নামের উল্লেখ ক'রে তারপর বলল, 'অবনীবাবুকে বললে হয় না?'

সলিল বলল, 'নিশ্চয়ই, তাতো বলতেই হবে।'

'তা'হলে ব'লে দিয়ো।'

'তা দেব, ঠিকানাটা দাও।'

মানসী বলল, 'বাঃ, ঠিকানা তুমি জানো না?

সলিল বলল, 'আহা, তুমি তো জানো, তাতেই হবে।'

এবার মানসীও জব্দ হলো, সেও পুরোপুরি জানে না। 'বালীগঞ্জে থাকেন এইতো জানি, কিন্তু রাস্তার নাম, নম্বর—। আমি ভেবেছি তুমিই তো জানো—'

সলিল বলল, 'আমিও তো তাই ভেবেছি।'

সলিলের উকিলের কথা, একটু বাদেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

সলিল বলল, 'অত ঘাবড়াবার কি আছে। কমলেশবাবুব ওখানে নিশ্চয়ই যাবে, তাঁকেও ব'লে এসো।'

মানসী বলল, 'তিনি কি আর আসবেন?'

'বলতে ক্ষতি কি?'

সলিল আজও স্ত্রীর সঙ্গে যেতে পারল না। কোর্ট থেকে যেতে হবে এক মাড়োয়ারী মক্কেলের বাড়ি। সলিল তাঁর ফার্মের জুনিয়র উকিল। সলিলের সরু গলি দিয়ে তাঁর গাড়ি ঢোকে না। দরকারমত সলিলকেই বাসে-ট্রামে ছুটতে হয় তাঁর ওখানে।

তাই মানসী বেলা গোটা তিনেকের সময় একাই বেরিয়ে পড়ল। বালীগঞ্জ, টালীগঞ্জের আরো জন দুই বান্ধবীকে বলবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি গরজ অবনীর ঠিকানাটা তাড়াতাড়ি জোগাড় করা। ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। ঠিকানাটাই রাখা হয়নি।

গোটা চারেকের মধ্যেই কমলেশবাবুর চেম্বারের সামনে গিয়ে পৌঁছল মানসী। পৌঁছেই নিজের ভুল বুঝতে পারল। বিকালের দিকে সন্ধ্যা ছ'টার আগে আসেন না কমলেশবাবু। রোগীদের জন্য আধ ঘণ্টা আগে খুলে দেওয়া হয়। মানসী ফিরে আসছিল, উল্টো দিকের চেম্বারের পাঁচিশ

ছাব্বিশ বছর বয়সের আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আসতে যেতে এঁর আগেও আরও দু'একবার চোখাচোখি হয়েছে।

'আপনি বুঝি ডাঃ রায়ের কাছে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ, তিনি তো নেই দেখলাম।'

তরুণ ডাক্তারটি হাসল, 'আছেন, এইমাত্র অবনীবাবুর সঙ্গে ভিতরে ঢুকলেন দেখলাম। একটু কষ্ট করুন। এই করিডোর দিয়ে সোজা পশ্চিমে যান। তারপর ডানদিকে ঘুরলেই আর একটা দরজা দেখতে পাবেন। সে দরজা হয়তো খোলাই দেখবেন। ওঁরা এই মাত্র গেলেন।'

মানসী একবার ইতস্তত করল, যাবে কি যাবে না। কিন্তু অবনী আছে শুনে উৎসাহটা বাড়ছে, আরো কয়েক জায়গায় ঘুরতে হবে। এখানে তাড়াতাড়িই সেরে যাওয়া যাক্।

তরুণ ডাক্তারটির নির্দেশমত কয়েক পা এগোবার পর নির্দিষ্ট দরজা মিলল। কিন্তু সে দোরও বন্ধ। ফিরে আসছিল, হঠাৎ নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে মানসী থেমে দাঁড়াল।

'এক নম্বর মানসী রায়, দু'নম্বর অমিতা সেন, তিন নম্বর কেতকী মৈত্র, চার নম্বর নিবেদিতা দত্তগুপ্ত—দেড়মাস দু'মাসের মধ্যে আপনাকে এগুলি পেশেন্ট এনে দিলাম ডাক্তারবাবু। আর গোটা তিরিশেক টাকা দিতে আপনি এত আপত্তি করছেন। বিশেষ দরকার ব'লেই বলছি।'

কমলেশবাবুর ঈষৎ উত্যক্ত গলা শোনা গেল, 'আহা, মানসী রায়ের এ্যাকাউন্ট তো তুমি ক্লিয়ারই ক'রে গেছ। টাকা পঁচিশেকের মত নিয়েছ না?' না কি আরো বেশি? সুবোধ কম্পাউণ্ডার ঠিক বলতে পারবে।—তারপর—'

তারপর আর মানসী সেখানে দাঁড়াল না। অন্য কোন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করবার উৎসাহও আর রইল না তার। সোজা ফিরে গেল বাড়ি।

স্বামীকে বলল, 'রবিবারের ফাংশনটা এবার থাক।'

সলিল বলল, 'সে কি হয়? আমি এরই মধ্যে কয়েক জনকে ব'লে এসেছি। তা ছাড়া ডাক্তার আর ওষুধের কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। এবার সুর না শুনলে আর চলছে না। ভালো কথা, বলেছ অবনীকে?''

মানসী বলল, 'না কারো সঙ্গে দেখা হয়নি।'

সলিল বলল, 'অবনীকে বলতে পারলে কিন্তু খুবই ভালো হতো। আচ্ছা, আর একদিন বলা যাবে। ঠিকানা খুঁজে বের করা যাবেই কোন রকমে।'

পরদিন সন্ধ্যায় গানের আসরে নতুন-পুরোন চার-পাঁচ জন বন্ধু এসে হাজির হলো সলিলের। নামকরা তবলচী নীরদ গাঙ্গুলী বাঁয়া-তবলা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'আসুন বউদি, অনেকদিন সঙ্গত করিনে আপনার সঙ্গে।'

চমৎকার সুরেলা গলা মানসীর। প্রগল্‌ভ শ্রোতার দল মুগ্ধ হয়ে রইল। অন্তরের কাছটায় এসে শুধু একবার হোঁচট খেল মানসী। নীরদ গাঙ্গুলী একবার শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে সামলে নিল।

মানসী থামতেই দু'তিন জনের সমবেত অনুনয় শোনা গেল, 'আর একখানা হোক্ বউদি।'

নীরদ ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ, থাম না একটু তোমরা। একটু জিরোতে দাও, ভাবতে দাও, গানের কথাগুলি একটু মনে ক'রে নিতে দাও না ওঁকে।'

কিন্তু আর একখানা গান সুরু করবার আগে যে কথাগুলো মানসীর মনে হচ্ছিল, সেগুলো কোন গানের কথা নয়। তাতে সুর-সংযোগ চলে না।

নিমন্ত্রণ পেলেও কি অবনী আসত? তার কি আসবার জো ছিল? অবনী হয়ত এতক্ষণ ফের নতুন কোন মেয়ের খোঁজে বেরিয়েছে। কার গলা দিয়ে গান সরে না, ঠাণ্ডা লেগে কার স্বরভঙ্গ হয়েছে, শ্লেষ্মায় কার জড়িয়ে গেছে স্বর। একটু কেসে গলা পরিষ্কার ক'রে নিল মানসী—কি জানি ঠিক আছে কি না।

চিঠি

দেড়টায় ছুটি হয়ে গেল, শনিবারের অফিস। পূর্ণেন্দু তার সহকর্মী বন্ধুকে বলল, 'সেদিন সিনেমা সিনেমা করছিলে, চল যাই যতীন, আজ ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট কেটে যে কোন একটা ঘরে ঢুকে পড়ি। ছবি ভালো হয় তো দেখব, আর যদি খারাপ হয় তো আরো ভালো, দিব্যি বসে বসে গল্প করব।'

যতীন হেসে বলল, 'খুব লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু আমার যে ভাই একটু মুস্কিল আছে। শ্রীমতীকে নিয়ে এখনই দৌড়তে হবে তার বাপের বাড়ি। গিয়ে দেখব সেজেগুজে বসে আছে। একটু এদিক ওদিক হ'লে আর রক্ষে নেই। মান ভাঙাতে ভাঙাতে রাত ভোর হয়ে যাবে।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'তাই নাকি ?'

যতীন বলল, 'ময়েদের কথা আর বোলো না ভাই। এমন সেন্টিমেণ্টাল জীব নিয়ে ঘর-গেরস্থালী করা যে কি শক্ত তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। বিয়েটিয়ে না ক'রে তুমি বেশ আছ। বিয়ের দিন উপলক্ষ্যে সেদিন একটা ঘড়ি কিনে দিয়েছি। জানো তো, আজকাল আবার ওই এক ফ্যাসান হয়েছে। শাঁখা-চুড়ির মাঝখানে আর একটি হাতঘড়ির গয়না থাকা চাই।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'ভালোই তো।'

যতীন বলল, 'ভালো মানে। সাধ ক'রে নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছি। এখন নাইতে খেতে শুতে সব সময় সেই ঘড়ির কাঁটায় নয়নতারা দুটি নিবদ্ধ। মিনিটে মিনিটে কথায় কথায় কৈফিয়ৎ। অফিস থেকে ফিরতে পঁচিশ মিনিট লাগে। কিন্তু আজ ষোল মিনিট তেত্রিশ সেকেণ্ড কেন বেশি লাগল। আর বোলো না, তোমার বান্ধবী আমাদের ম্যানেজারকেও হার মানিয়েছে। অফিসে পৌছে তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ, আর বাড়িতে ফিরে গিয়ে শ্রীমতীর কাছে। একেবারে হয়রান হয়ে গেলাম পূর্ণেন্দু।'

ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড়ে এসে যতীন গাঙ্গুলী যে ভাবে ভিড় ঠেলে টালীগঞ্জগামী ট্রামটিতে ঢুকে পড়ল তাতে ও যে জীবনে, বিশেষ ক'রে দাম্পত্য জীবনে শ্রান্ত হয়েছে, তা মোটেই মনে করবার কারণ নেই। বিয়ে ক'রে বেশ সুখেই আছে যতীন। চারু এভেনিয়ুতে স্বামী-স্ত্রী মিলে ছোট একটি ফ্লাট নিয়ে থাকে। ওর স্ত্রী সুনন্দাকে দেখেছে পূর্ণেন্দু। দেখতে মোটামুটি সুন্দরীই। বি. এ. পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছিল, গতবার পাশ করেছে। একুশ বাইশ বছর বয়স। মুখখানা আরো কচি কচি মনে হয়। যতীনের বয়স অবশ্য একটু বেশি। হিসেব ক'রে দেখেছে পূর্ণেন্দু, একই বছরে ওরা বি. এ. পাশ করেছে। যতীন তারই সমবয়সী। তেত্রিশ চৌত্রিশের কম হবে না বয়স। অবশ্য যাতে কম দেখায় তার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি নেই। রোজ শেভ করে, টয়লেট ব্যবহার করে। একটু বেশি বয়সে বিয়ে করলে প্রথম মানুষের অমন একটু আদেখলাপনা হয়ই। দোষ নেই যতীনের। পূর্ণেন্দু মনে মনে হাসল। তারপর ভিড় ঠেলে উঠে পড়ল শ্যামবাজারের বাসে। না, একা একা সিনেমা দেখা কোন কাজের কথা নয়। বড় বোরিং। গত দশ বছরের মধ্যে একবারও সে একা সিনেমা দেখেনি। কিন্তু দুবছর আগে সেই দশ বছর ব্যাপী একটি অধ্যায়ের শেষ হয়ে গেছে। সে কথা মনে ক'রে আর লাভ কি।

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের পুরোণ মেসটিতেই ফিরে এল পূর্ণেন্দু। দোতলায় উত্তর-পূর্ব কোণের ঘরটিতে তালা ঝুলছে। পকেট থেকে চাবি বের ক'রে খুলল। ডবল সিটেড ছোট্ট ঘর। পূর্ব-পশ্চিমে পাশাপাশি দু'খানা তক্ত-পোষ পাতা। মাঝখানে আধ হাত খানেক ফাঁক। পূর্ণেন্দু চেয়ে চেয়ে দেখল, পশ্চিমদিকে তক্তপোষে সহকর্মী প্রৌঢ় অক্ষয়বাবুর বিছানাটি সযত্নে মোড়া। তাঁর স্যুটকেশটি অদৃশ্য। বোঝা গেল তিনি এতক্ষণ বর্ধমানগামী লোকাল ট্রেণে গিয়ে উঠেছেন। প্রত্যেক শনিবার বাড়ি যান অক্ষয়বাবু। সোমবার সকালে ফেরেন। তক্তপোষের ওপর ছোট একটু ফর্দ পড়ে রয়েছে। ফর্দের প্রথমেই আছে গন্ধ তেল এক শিশি, তারপর বার্লির কৌটো, তারপর তালমিছরি ; তারপর সংসারের আরো অনেক জিনিসের নাম। কিন্তু গন্ধ তেলের ওপরেই দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল পূর্ণেন্দুর। অক্ষয়বাবুর নিজের হাতে লেখা ফর্দ। প্রত্যেকটি জিনিসের নামের বাঁ দিকে পেনসিলের

দাগ। কোন জিনিসই নিতে ভোলেননি অক্ষয়বাবু। তাড়াতাড়িতে ফদ টিই শুধু ভুলে ফেলে গেছেন। সাতটি না আটটি যেন ছেলেমেয়ে হয়েছে অক্ষয়বাবুর। গন্ধ তেলের নামটি তবু ওপরেই থাকে।

এবার নিজের তক্তপোষখানার দিকে চোখ পড়ল পূর্ণেন্দুর। রাত্রের বিছানাটা এখনো পাতাই আছে। নিজের নিজের বিছানা গুটিয়ে গুছিয়ে রাখতে ভারি আলস্য পূর্ণেন্দুর। সেই আলস্য ইদানীং আরো বেড়েছে। এই নিয়ে অক্ষয়বাবু তাকে মাঝে মাঝে উপদেশ দেন, মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাসা করেন। আজও আধময়লা চাদরটার ওপর খানতিন বই আর মাসিকপত্র ছড়ানো পড়ে রয়েছে। গীতবিতানের পাতাটি খোলা। প্রথম গানের প্রথম কলিটি চোখে পড়ল, 'তোমায় নতুন ক'রে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণ।'

বোতাম খুলে পাঞ্জাবিটা সেই গীতবিতানের ওপর ছুঁড়ে ফেলল পূর্ণেন্দু। গেঞ্জিটাও খুলল। তারপর কাপড ছেড়ে লুঙ্গিটা পরতে পরতে শিয়রের কাছে ছোট টেবিলটির ওপর চোখ পড়ল পূর্ণেন্দুর। দু'দিকের বইয়ের স্তূপ। মাঝখানের খালি জায়গাটুকুতে কালো রঙের তার চশমার খাপটি চাপা দেওয়া ভাঁজ-করা নীল রঙের একখানি চিঠি। বুকের ভিতরের খানিকটা রক্ত যেন ছলাৎ ক'রে উঠল পূর্ণেন্দুর। আশ্চর্য, এ চিঠি এখানে এল কোত্থেকে। অফিসে যাওয়ার আগে তো এ চিঠি দেখে যায়নি পূর্ণেন্দু, রেখে যায়নি। এ খোলা চিঠি এখানে কে রাখল।

চশমার খাপটি সরিয়ে রেখে চিঠিখানা হাতে তুলে নিল পূর্ণেন্দু। ভাজ খুলল। কি ক'রে যেন ভিজে গেছে কাগজখানা। খানিকটা ঝাপসে গেছে লেখা। তবু পড়া যায়, বেশ পড়া যায়। প্যাডের পুরো একটি পাতায় মাত্র দু'টি লাইন, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে। চিঠি পেয়েই চলে এসো। আরতি।'

কাগজের ওপরে-নিচে বাকি অংশ সাদা। সাদা নয় নীল। দু'টি লাইন ছাড়া বাকি সব জায়গা ফাঁকা। কিন্তু ফাঁকাই কি বলা যায়!

তবু দু'বছর আগে যে অধ্যায়ের শেষ হয়ে গেছে, নিজের হাতে যে অধ্যায়ের সে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে গেছে, দু'বছর বাদে সেই আবার এ চিঠি লিখল কোন্ লজ্জায়। লিখতে কি তার হাত কাঁপল না?

কিন্তু ও কখন এসেছিল ? নিশ্চয়ই অক্ষয়বাবুর অফিস থেকে ফেরবার পর আর তাঁর বেরিয়ে যাওয়ার আগে। সে সময়টুকু নিশ্চয়ই দশ পনের মিনিটের বেশি নয়। তাই তাড়াতাড়িতে দু'লাইন লিখে গেছে আরতি। বেশি লেখার সময় পায়নি।

মেসের চাকর গোবিন্দ এসে ঘরে ঢুকল। কালো বেঁটে-খাট চেহারা, ঠোঁটের ওপর আবার গোঁফ রেখেছে। কখনো গোঁফ রাখে, কখনো কামিয়ে ফেলে। কিসে সব চেয়ে ভালো দেখাবে সে সম্বন্ধে এখনো সম্পূর্ণ মন স্থির করিতে পারেনি। বয়স কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে। এ সময় মন একটু চঞ্চলই থাকে।

গোবিন্দ বলল, 'পূর্ণেন্দুবাবু, বিকেলে কি খাবেন ? কি আনব আপনার জন্যে ?'

পূর্ণেন্দু বলল, 'সে কথা পরে হবে। তুই আগে বল্‌ত, তোর সেই দিদিমণি কখন এসেছিলেন। কখন রেখে গেছেন চিঠি ?'

অক্ষয়বাবুর মত মেসের চার বছরের পুরোন চাকর গোবিন্দও সব জানে। ওর কাছেও লজ্জা নেই পূর্ণেন্দুর।

গোবিন্দ একটু হেসে বলল, 'আজ্ঞে, তিনি তো আসেননি পূর্ণেন্দুবাবু। চিঠি ডাকে এসেছে। পিওন জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। অক্ষয়বাবু কুড়িয়ে পেয়েছেন।'

পূর্ণেন্দু ভ্রূ কুঁচকে রুক্ষস্বরে বলল, 'তা খামটা কি হলো ? খামের ভিতর থেকে বেরোল কি ক'রে চিঠিটা ?'

গোবিন্দ বলল, 'আজ্ঞে আমার কোন দোষ নেই বাবু। অক্ষয়বাবু সব জানেন। ভিজে খামের মুখটা নাকি আগেই খুলে গিয়েছিল।'

পূর্ণেন্দু প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'মিথ্যে কথা। এ চিঠি তিনি নিশ্চয়ই নিজে খুলেছেন। খুলতে পারেননি, ছিঁড়ে ফেলেছেন। খামটা তারপর ফেলে দিয়েছেন বাইরে। সত্যি ক'রে বল্‌ তাই কিনা ?'

ধমক খেয়ে গোবিন্দ বলল, 'আমি কিছু জানিনে বাবু। আমার কোন দোষ নেই।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'তোর দোষের কথা কে বলছে ? কিন্তু অক্ষয়বাবুর কি প্রবৃত্তি দেখ তো! বুড়ো হ'তে চললেন, আট-ন'টি ছেলের বাপ,

এখনো তাঁর এসব কৌতুহল গেল না। আগেও তিনি আমার চিঠি মাঝে মাঝে খুলে দেখেছেন। কিন্তু আগে যা করছেন, এখন তার বিয়ে হয়ে গেছে, এখন সে পরস্ত্রী। চিঠিতে কত কি থাকতে পারে। তার চিঠি কি খোলা উচিত হয়েছে অক্ষয়বাবুর ?'

গোবিন্দ সায় দিয়ে বলল, 'না বাবু, মোটেই উচিত হয়নি।'

হঠাৎ পূর্ণেন্দুর খেয়াল হলো, সে কাকে কি বলছে। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, 'তুই যা, একখানা টোষ্ট আর এক কাপ চা নিয়ে আয় নিচের রেষ্টুরেন্ট থেকে।'

গোবিন্দ বলল, 'আর কিছু খাবেন না বাবু?

পুর্ণেন্দু বলল, 'না, আর কিছু না।'

পকেট থেকে একখানা সিকি বের করতে গিয়ে দু'খানা সিকিই বের ক'রে বসল পূর্ণেন্দু। গোবিন্দের হাতে দিয়ে বলল, 'চার আনা বেশি দিলাম। তুইও কিছু খেয়ে নিস্।'

গোবিন্দ লজ্জিতভাবে বলল, 'আমাকে আবার কেন দিলেন পূর্ণেন্দুবাবু।'

পূর্ণেন্দু হেসে বলল, 'থাক্ থাক্, তোর আর ভদ্রতা করতে হবে না। যা তাড়াতাড়ি নিয়ে আয় গিয়ে চা টা।'

গোবিন্দ বেরিয়ে গেল।

পূর্ণেন্দু ভাবতে লাগল, আশ্চর্য! ফের এমন একটি চিঠি কেন লিখতে গেল আরতি। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।' সব কথাই তো শেষ হয়ে গেছে। আর কোন্ কথা বাকি। দু'বছর আগে গত দশ বছর ধ'রে কত কথাই তো বলেছে তারা। মুখে বলেছে, চিঠিতে বলেছে, ভবিষ্যতের কত ছবিই তো এঁকেছে বছরের পর বছর পূর্ণেন্দু আর আরতি। কিন্তু কি মূল্য রইল সে সব কথার, সে সব ছবির, সে সব প্রতিশ্রুতির। ভেঙ্গে তো গেল। এই ভাঙনের জন্যে আর কাউকে দায়ী করা যায় না। দায়ী তারা নিজেরাই।

আরতির কাছে প্রথমে দাদার বন্ধু ব'লেই পরিচিত হয়েছিল পুর্ণেন্দু। তারপর বছর ছয়েকের আলাপে আরতির নিজেরও বন্ধু হলো। পূর্ণেন্দু তখন ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র, আরতি প্রথম কলেজে ঢুকেছে। আরতির বাবা স্মল কজ কোর্টের উকিল। শ্যামবাজারে বাসা ক'রে থাকেন। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। তারমধ্যে অরুণ বড়, তার পরেই আরতি। পূর্ণেন্দুরও

বাবা মা আছেন। গাঁয়ের বাড়িতে থাকেন। ছেলেকে কলকাতার হষ্টেলে রেখে খুব নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। সপ্তাহে দু'খানা ক'রে চিঠি লিখে খোঁজ নেন পূর্ণেন্দুর শরীর কেমন আছে, পড়াশুনো কেমন চলছে তার। জবাব দিতে দেরি হ'লে বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম আসে। বুড়ো বাপ-মার পূর্ণেন্দুই একমাত্র সন্তান।

ও যখন ফোর্থ ইয়ারে উঠল, তখন থেকেই তাঁরা তার বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজতে লাগলেন, কনে দেখাদেখি চলতে লাগল। কিন্তু বি. এ. পাশ ক'রে পূর্ণেন্দু সোজা বাবা-মাকে জানিয়ে দিল—বিয়ে সে করবে না। যখন করবে তখন সে নিজেই জানাবে। তাঁরা যেন অনর্থক পাত্রী খুঁজে না বেড়ান।

পূর্ণেন্দুর বাবা মনোমোহন চক্রবর্ত্তী চলে এলেন কলকাতায়। ক্যানিং হোষ্টেলে ওর রুমমেটের কাছে, বন্ধুদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জানলেন পূর্ণেন্দুর অমতের আসল কারণটা কি। খুঁজে খুঁজে আরতিদের বাসাও বের করলেন। অলক্ষ্যে থেকে দেখলেন মেয়েটিকে। তারপর ছেলেকে এসে বললেন, 'তুই যার পিছনে পিছনে ঘুরছিস্ সে তো কায়েৎ। ওর বাবার নাম শুনলাম অমূল্য চন্দ।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'ঠিকই শুনেছেন।'

মনোমোহনবাবু বললেন, 'তাছাড়া মেয়ে তো দেখলাম কালো. মেয়ে তো সুন্দরী নয়।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'ঠিকই দেখেছেন।'

মনোমোহনবাবু বললেন, 'তবে? তুমি যা ভেবেছ তা কিন্তু হবে না বাপু। ওই মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে পারবে না। তা যদি কর তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'আপনি ভাববেন না। স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত আমি বিয়ে করছি না।'

গাঁয়ে গিয়ে আরো দু'একটি সম্বন্ধের কথা ছেলেকে জানালেন মনোমোহন-বাবু। তারা ভদ্রঘরের বামুনের মেয়ে। দেখতে লক্ষ্মীর মত। কলেজে পড়া সরস্বতীদের মত বিদ্যা না থাকলেও গৃহস্থঘরের উপযোগী ভালো লেখাপড়াই জানে। খামের মধ্যে তাদের ফটোও পাঠালেন মনোমোহনবাবু। কিন্তু পূর্ণেন্দু তার মত বদলাল না। রাগ ক'রে মনোমোহনবাবু পড়ার খরচ বন্ধ

ক'রে দিলেন, পূর্ণেন্দু হোস্টেল ছেড়ে মীর্জাপুরের সস্তা মেসে গিয়ে ঢুকল। দু'তিনটে টুইশন নিয়ে পড়া আর থাকা-খাওয়ার খরচ চালাতে লাগলো।

আরতি বলল, 'তোমারই বা এত একগুঁয়ে স্বভাব কেন? বাপ-মার বাধ্য ছেলে হয়ে বিয়ে ক'রে ফেললেই তো পারো।'

পূর্ণেন্দু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, তা পারি। তুমি মত দিলেই পুরুত ডাকি।'

আরতি বলল, 'আহাহা, কিন্তু পুরুত ডাকলেই তো শুধু হবে না। রেজিষ্ট্রারের কাছেও যেতে হবে। মেলা ঝামেলা! তার আগে কলেজের পাটটা শেষ ক'রে ফেলি।'

ডিষ্টিংসন নিয়ে বি. এ. পাশ করল আরতি। পূর্ণেন্দু শুধু তার প্রেমে পড়েনি, কড়া মাষ্টারের মত তাকে পড়িয়েওছে। নিজেও একটা চাকরি জোগাড় ক'রে নিয়েছে ইন্‌সিওরেন্‌স অফিসে। এবার আর আরতির আপত্তি নেই। ওর মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। বাবা আর দাদা নিমরাজী। কিন্তু পূর্ণেন্দুর বাবা পড়লেন অসুখে। ক্যানসারে ভুগলেন প্রায় বছর দেড়েক। পূর্ণেন্দু বাবার কাছে চলে গেল। তাঁর চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষায় নিজেকে নিযুক্ত রাখল।

মনোমোহনবাবু এক গোপন চিঠিতে লিখলেন, 'তোমার বাবার অসুখ শিগ্‌গির সারবে ব'লে তো মনে হয় না। তুমি কলকাতায় এসে বিয়েটা সেরে যাও। আরতির বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমি অনিমা আর অঞ্জলিকে পাত্রস্থ করতে পারছিনে। অথচ ওদের সম্বন্ধ ঠিক হয়েই আছে।'

পূর্ণেন্দু লিখল, 'বেশ তো, ওদের বিয়ে দিন। বাবা যার রোগশয্যায়, তার কি এই বিয়ে করার সময়? আপনি নিজেও তো ছেলেমেয়ের বাপ।'

আরতি বলল, 'তুমি ওদের বিয়ে দিয়ে দাও বাবা। আমি বিয়ে করব না।'

অনিমা অঞ্জলির বিয়ে হয়ে গেল।

বাবার চিকিৎসার জন্যে তালতায় ডাক্তার লেনে বাসা করল পূর্ণেন্দু। মাও এলেন। বাড়ি রইল এক জ্ঞাতি কাকার তত্ত্বাবধানে। পূর্ণেন্দু বাসা করল। কিন্তু সে বাসায় আরতির ঢোকা নিষেধ। রোগশয্যায় পূর্ণেন্দুর বাবা তাতে দুঃখ পাবেন। আর কদিনই বা আছেন। তাঁকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

আরতি গম্ভীর মুখে বলল, 'বেশ, ওঁর অসুখ যতদিন না সারে ততদিন আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ থাক্‌।'

কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ রইল না। চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও চলল। পূর্ণেন্দুর বাবা সেরে উঠলেন না, মারাই গেলেন। মাও বসন্তরোগে মারা গেলেন অল্পদিন বাদে।

বাসা তুলে দেওয়ার আগে পূর্ণেন্দু বলল, 'আরতি, তুমি এসো এবার। যাঁরা বাধা দিয়েছেন, যাঁরা দুঃখ পেয়েছেন, তাঁরা তো চলেই গেলেন।'

আরতি বলল, 'ছি, এখনো তোমার ন্যাড়া মাথা ভালো ক'রে ঢাকেনি। বিয়ে তো দায়-সারা কাজ নয়। মন যখন তৈরী থাকে তখনই তাকে সায় দেওয়া ভালো, তার আগে নয়।'

পূর্ণেন্দু প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'আমার মন তৈরী আছে।'

আরতি বলল, 'কিন্তু মাথা এখনো তৈরী হয়নি। ন্যাড়া মাথায় সোনার মুকুট কি ক'রে বসবে?'

আরতি একটু হাসল। তারপর ফের গম্ভীর মুখে বলল, 'দেখ, আমিও খুকী নই, তোমারও বয়স হয়েছে। আমরা দু'জনেই দু'জনের মন বুঝি। বাপ-মাকে হারিয়ে তোমার যা মনের অবস্থা তাতে এখনই বাসর ঘরের আয়োজন করলে তোমার ওপর জুলুম করা হবে। কিন্তু শত্রু হলেও বাঙালীর মেয়ে তো। রাঙা চেলী আর চন্দন প'রে আমি প্রথমে বাসর ঘরেই ঢুকতে চাই, শ্মশানে গিয়ে শোক-সঙ্গিনী হ'তে চাইনে। বিয়েটা আনন্দ স্ফূর্তির ব্যাপার। নীরস কর্তব্য পালন ব'লে অন্তত আমি একে মনে করিনে।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'বেশ তো।'

কিন্তু পূর্ণেন্দুর ন্যাড়া মাথা ঢাকতে না ঢাকতে আরতিদের পরিবারেও বিপদ দেখা দিল। 'প্লুরেশীর' দোষ অরুণের আগে থেকেই ছিল, এবার সেটা টি. বি.-তে গিয়ে দাঁড়াল। তারজন্যে হাসপাতালে বেডের ব্যবস্থা করা, চিকিৎসার খরচ জোগানোর কাজে আরতি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাষ্টারি আগেই নিয়েছিল, এবার টুইশনও নিল গোটা দুই।

অরুণ বলল, 'এ কি করছিস্। তুইও অসুখে পড়বি যে।'

আরতি বলল, 'না দাদা, আমার কিছু হবে না।'

অরুণ বলল, 'কিন্তু বিয়েটা এবার সেরে ফেল্। আর দেরি করছিস্ কেন?'

আরতি বলল, 'কি যে বল দাদা। তুমি রইলে হাসপাতালে শুয়ে, আর আমি বিয়ে করব! পারিবারিক কর্তব্য কি শুধু তোমার বন্ধুরই আছে দাদা, আমার নেই! তুমি সেরে ওঠ, তারপর ওসব ভাবা যাবে।'

কিন্তু ভালো ক'রে সেরে উঠতে উঠতে বছর তিনচার লেগে গেল অরুণের। এই ক'বছর পূর্ণেন্দু আর আরতি যে শুধু ঝগড়াই করেছে তা নয়, হৃদয় মনের কথার আদান-প্রদানও করেছে। ছুটি-ছাটায় শুধু কলকাতার ধারে কাছের জায়গাগুলিতে যে ওরা একসঙ্গে বেড়িয়েছে তা নয়, শিলং পাহাড়ে, দার্জিলিং পাহাড়ে চড়াই-উৎরাই করেছে, হাতে হাত দিয়ে বেড়িয়েছে গোপালনগর আর বিশাখাপত্তমের সমুদ্রের ধারে। সারা বছর ধ'রে পূর্ণেন্দু টাকা জমিয়েছে, কিছু কিছু সঞ্চয় করেছে আরতিও। তারপর দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে। কত চটিতে, কত হোটেলে যে ওদের রাত কেটেছে তার আর ঠিক নেই, কিন্তু স্থায়ী ঘর বাঁধবার বেলায় কিছুতেই দু'জনের পঞ্জিকার দিন ক্ষণ মেলেনি। বিয়ের সম্বন্ধে কথা উঠলেই কোন না কোন একটা ব্যাপার নিয়ে দু'জনে ঘোর তর্ক করেছে, ঝগড়া করেছে, তারপর কিছুদিন কথাবার্তা দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ রয়েছে দু'জনের মধ্যে। কিন্তু ফের যখন বাইরে যাবার সময় হয়েছে তখন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরের গরজ দেখা দিয়েছে দু'জনেরই।

আরতির বাবা সন্ন্যাস রোগে মারা গেলেন। সন্ন্যাসিনী মেয়ের বিয়ে আর তিনি দেখে যেতে পারলেন না। অরুণ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোদের যা খুশি তাই কর্।'

সাধারণভাবে ওরা যে কোন দিন বিয়ে করবে বন্ধুবান্ধব সে আশা ছেড়েই দিল। কেউ কেউ বলল, 'আরে আসল বিয়ে তো ওদের অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে। গান্ধর্ব বিয়েতে বাইরে তো কোন ঘটা নেই। যত রঙের ছটা সব ভিতরে। বন্ধুদের ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তা ওরা ভালো ক'রেই দিয়েছে।'

কিন্তু এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। যে পাবলিশিটি কোম্পানীতে কয়েক বছর ধ'রে কাজ করত পূর্ণেন্দু,তার ম্যানেজারের সঙ্গে চটাচটি হওয়ায় সেখানকার কাজ ছেড়ে দিল পূর্ণেন্দু। কিংবা ভাষান্তরে কোম্পানীই ওকে ছাড়িয়ে দিল। আর একটা ছোট কনসার্ণে পার্টটাইমের ঠিকে কাজ নিল পূর্ণেন্দু। আগে যা মাইনে পেত তার চেয়ে অর্ধেকেরও কম পায়। খবরের কাগজটা যখনই হাতে পড়ে, কর্মখালির স্তম্ভে সব চেয়ে আগে চোখ বুলায় পূর্ণেন্দু।

এই নিয়ে সেদিন বিকেলে নিজের ঘরে ব'সে আরতি পূর্ণেন্দুকে ঠাট্টা করছিল। পূর্ণেন্দুর হাতে তখনো একখানা কাগজ। আর আরতির হাতে পাউডারের পাফ। সন্ধ্যার শোতে সিনেমায় যাবে দু'জনে। তাই ড্রেসিং টেবিলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পূর্ণেন্দুর সাক্ষাতেই সান্ধ্য-প্রসাধন শেষ করছিল আরতি। ঘরে আর কেউ নেই। আরতির দাদা ছুটির দিনের বিকেলে বন্ধুমহলে আড্ডা দিতে বেরিয়েছে। রান্নাঘরের সাম্‌নে বিধবা খুড়ীমা প্রতিবেশিনীর সঙ্গে আলাপে মগ্ন।

গালে পাউডারের পাফ বুলাতে বুলাতে আয়নার দিকে তাকিয়ে আরতি বলল, 'বেকার বাবুর মুখখানা যা হয়েছে। এসো তোমার মুখেও একটু পাউডারের ছোপ লাগিয়ে দিই।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'আমার মুখ বিনা পাউডারেই লোকের সাম্‌নে বের করা চলে। এতো আর তোমার মুখ নয়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। যত পাউডারের কৌটাই উজাড় কর, দুই গালের দুই গর্ত কিছুতেই ভরবে না। আলকাৎরার রঙ ও, কিছুমাত্র বদলাবার আশা নেই। যেতে হয় তো সঙ না সেজে এমনিতেই চল।'

হাতের পাফটা হাতেই রইল আরতির, গালে আর উঠল না; স্থির-দৃষ্টিতে তাকাল সে আয়নার দিকে। পাশাপাশি দু'টি মুখ দেখা যাচ্ছে আয়নার মধ্যে। একজন তিরিশোত্তর হ'য়েও স্বাস্থ্যবান, রূপবান; তার গায়ের রং গৌর, নাক-চোখের গড়ন তীক্ষ্ণ। আর তারই পাশে আর একটি মেয়ের মুখ থেকে শ্রী-সৌন্দর্য যেন কেউ ক্রুদ্ধহাতে মুছে নিয়ে গেছে। সত্যিই তার গাল ভেঙেছে, চোখ বসেছে, লাবণ্য-লালিত্য যেন কিছুমাত্র নেই। তার বয়স যেন তিরিশের নীচে নয়, চল্লিশের ঢের উপরে।

হঠাৎ কঠিন মুখে দূরে স'রে দাঁড়াল আরতি, বলল, 'ও এইজন্যেই তুমি এতদিন বিয়ে করনি, এই জন্যেই বিয়ের নামে তুমি নানা অজুহাত দিয়েছ, বছরের পর বছর কেবল দেরি করেছ। কুরূপ-কুচ্ছিৎ মেয়েকে নিয়ে পাহাড়ে-পর্বতে লীলা-খেলা করা যায়, বিয়ে ক'রে লোকালয়ে তাকে নিয়ে তো আর বাস করা যায় না—কি বল, তাই না?'

পূর্ণেন্দু হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু আরতির মুখের দিকে তাকিয়ে ওর হাসি মিলিয়ে গেল। গম্ভীর মুখে বলল, 'ঠিক তাই, এতকাল বাদে আমার মনের কথাটি ঠিক তোমার মুখ থেকে বেরিয়েছে আরতি।'

আরতি বলল, 'ঠিক ছাড়া কি! ভণ্ড, লম্পট, বদমাস কোথাকার! তোমার মতলব আমার অনেক আগেই বুঝতে পারা উচিত ছিল। আমি নেহাৎ বোকা ব'লেই বুঝতে পারিনি। তোমার মত শঠ-প্রবঞ্চককে এতদিন বিশ্বাস্ করেছি ব'লেই দু'চোখ আমার এতদিন অন্ধ ছিল।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'তা তো বটেই। আজ তো চোখ ফুটেছে। আজ আর কথা কি। সাধের প্রসাধনটুকু এবার শেষ কর।'

পাউডারের পাফটা পূর্ণেন্দুর কপাল লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে মারল আরতি। দেখা গেল ওর নিরিখ পাকা নয়। পাফটা পূর্ণেন্দুর কপালে না লেগে, ডান চোখের চশমার কাঁচে গিয়ে লাগল। চশমা থাকা সত্ত্বেও কিছু পাউডার ওর ডান চোখের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। ভাগ্যে চশমাটা ছিল। নইলে চোখটা বোধ হয় সে যাত্রা একেবারেই যেত।

পূর্ণেন্দু উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। চশমার একটা কাঁচ পাউডারে ঢাকা। চোখটা বুজে গেছে। জ্বালা করছে ভিতরে। সেই ভিতরের সব জ্বালা জিবে জড় করে পূর্ণেন্দু বলল, 'প্রেমের দেবতা অন্ধই বটে। নইলে তোমার মত মেয়েকে—'

আরতি বলল, 'প্রেমের নাম ফের মুখে আনছ, লজ্জা করছে না তোমার। আমার মত মেয়ে তো বটেই। আমার মত মেয়ে না হ'লে তোমাকে এতদিন নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছাড়ত। কিন্তু যত বড রূপবান কন্দর্পকান্তি পুরুষই তুমি হও, তুমি কাপুরুষ, তুমি অপদার্থ। তোমার যোগ্যতাও আমার আর জানতে বাকি নেই, অর্ধেক জীবন তো বেকারই রইলে, বাকি অর্ধেকে তো সোয়াশ-দেড়শ টাকার বেশি রোজগারের ক্ষমতা হলো না। তোমার মুরদও আমি জানি।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'ও, পুরুষের আসল মুরদ যে কোথায় তা বুঝি এত দিনে টের পেয়েছ। কিন্তু এত যখন উঁচু নজর বয়স থাকতে-থাকতে, চেহারা থাকতে-থাকতে মুরদওয়ালা, ভুঁড়ীওয়ালা, পকেটভারি কোন লোকের কাছে গেলেই পারতে। এখনো সময় আছে, এখনো চেষ্টা ক'রে দেখ। যদি বল তো আমিও দু'একজনকে যোগাড় ক'রে আনতে পারি। কি বল, দেখব নাকি?'

আরতি বলল, 'আমার দেখা আমি নিজেই দেখে নিতে পারব।

তারজন্যে তোমার দরকার হবে না। তুমি যাও, চলে যাও আমার সুমুখ থেকে।'

পূর্ণেন্দু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আরতির দিকে তাকাল। তারপর ঘর থেকে সত্যিই বেরিয়ে এল।

আরতির কাকিমা এসে বাধা দিলেন, 'কি হ'লো তোমাদের, কি নিয়ে ঝগড়া হলো?'

পূর্ণেন্দু কোন জবাব না দিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামল।

অরুণ ওদের বিবাদটা মিটাবার খুবই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পূর্ণেন্দু আর আরতি কেউ কারো খোঁজ নিল না। কেউ কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করল না। তারপর মাস তিনেক বাদে শোনা গেল, আরতি বিয়ে করেছে। হ্যাঁ, নিজের বর নিজেই খুঁজে নিয়েছে ও। স্বয়ম্বরা হয়েছে। ওর স্বামীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দেখতে আরতির চেয়ে ঢের বেশি কালো। স্বাস্থ্যও ভালো নয়। আর্থিক অবস্থা আরো খারাপ। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি বাংলা খবরের কাগজের সাব-এডিটর। নাম কালীপদ দাস।

অরুণ আপত্তি ক'রে বলেছিল, 'এ কি করছিস আরতি, এ কি বিয়ে, না আত্মহত্যা।'

আরতি জবাব দিয়েছিল, 'আত্মহত্যা নয় দাদা, বিয়ে। রাশি-নক্ষত্র মিলিয়ে ঘটকালি করেছি। আর কোন অঘটন ঘটবে না। ওর সঙ্গে আমার বনবে।'

বিয়ের সময় পূর্ণেন্দুকে জানায়নি আরতি। এত দিনের আলাপ-পরিচয়, কিন্তু ভদ্রতা ক'রে একটা চিঠি দিয়েও খবর দেয়নি। তবু অরুণের আর এক বন্ধু নিরঞ্জন সেনের কাছে সব খবরই শুনেছিল পূর্ণেন্দু। তার মত কালীপদরও মা-বাপ-ভাই-বোন কি নিকট-আত্মীয় কেউ নেই। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের সংসার। ঢাকুরিয়া ষ্টেশন রোডের, একতলা ভাড়াটে বাড়িতে ছোট-ছোট দু'খানি ঘর। মনে হয় বিয়ে করবার পর ওরা যেন আত্মগোপন ক'রে রয়েছে। দিন গুজরান করছে কোন রকমে। গড়পারের পুরোন স্কুলটা ছেড়ে দিয়ে আরতি যাদবপুর উদ্বাস্তু কলোনীর নতুন একটা স্কুলে হেড মিস্ট্রেস্ হয়েছে।

পূর্ণেন্দু জিজ্ঞেস করেছিল, 'বেশ সুখেই আছে তাহলে?'

নিরঞ্জন বলেছিল, 'আছে। সুখে আছে কি না সে কথা জিজ্ঞেস করা

উচিত নয়, জবাব দেওয়াও অসম্ভব, কিন্তু তুমিই সব কিছুর জন্যে দায়ী পূর্ণেন্দু। তোমার ভুলেই এসব হলো।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'তা হবে। কিন্তু আমি ভাবছি কালীপদবাবু ওকে বিয়ে করলেন কোন্ সাহসে। আরতির আগেকার জীবনের কথা কি ওঁর কানে যায়নি ?'

নিরঞ্জন জবাব দিল, 'হয়ত কানে গেছে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেনি। বোধ হয় নিজের জীবনেও ও-ধরণের কিছু অঘটন ঘটে থাকবে।'

পূর্ণেন্দু কৌতূহলী হয়ে বলল, 'কেন, তেমন কিছু শুনেছ নাকি ?'

নিরঞ্জন বলল, 'শুনেছিলাম যেন একটু-একটু। কিন্তু নাম-ধাম-জ্ঞাতি-গোত্রের খবর কিছুই বলতে পারব না পূর্ণেন্দু। আমি জাত সাংবাদিক নই।' ব'লে নিরঞ্জন পূর্ণেন্দুর মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

তারপর এই দু'বছরে পার্ট-টাইমের চাকরিতে হোল-টাইমার হয়েছে পূর্ণেন্দু। এ ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। অফিস থেকে ফিরে এসে একেক দিন মনটা যখন ভারি খারাপ লাগত পার্কে কি ময়দানে গিয়ে বসত পূর্ণেন্দু, আজকাল আর সে-সব জায়গাও ভালো লাগে না। এখন এই বিপুল পৃথিবীতে তার জন্যে মাত্র দু'টি জায়গাই আছে। মেসের ঘর আর অফিস। বেশীর ভাগ সময় বই নিয়েই কাটে। তবু মাঝে মাঝে ভুলে চাবি না দেওয়া ঘড়ির মত জীবনটা যেন নিশ্চল অসাড় হয়ে পড়ে।

গোবিন্দের আনা চা-টোষ্ট খেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সেই আধ-ময়লা বিছানায় কাৎ হয়ে পড়ে রইল পূর্ণেন্দু। তার চোখের সাম্‌নে গত দশ-বার বছরের হঠাৎ এক-একটা দিন, এক-একটা রাত ভেসে-ভেসে আসতে লাগল। সে-দিনরাতগুলি মোটেই কালক্রমিক নয়। নানা সময়ের ছেঁড়া ছেঁড়া টুক্‌রো ঘটনা, কিন্তু পূর্ণেন্দুর মনে হ'তে লাগল, সেগুলির প্রত্যেকটি পরিপূর্ণ, আর এক-জনের হাসি, ছোঁয়া আর কথায় ভরা।

কিন্তু আশ্চর্য, এত কাণ্ডের পর, এত নিষ্ঠুর নির্মম ব্যবহারের পর, এই দু'বছরের মধ্যে কোন রকম খোঁজ-খবর না নিয়ে, কোন রকম অনুতাপ ও অনুশোচনা কি ক্ষমা ভিক্ষা না ক'রে হঠাৎ আজ অমন চিঠি লিখতে গেল কেন আরতি। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে। চিঠি পেয়েই চলে এস।' একথা লিখল কোন্ সাহসে, কোন্ ভরসায়, কিসের দাবীতে ?

না, যাবে না পূর্ণেন্দু, কিছুতেই যাবে না। তার কি কোন আত্মসম্মানবোধ নেই? দু'বছর আগে যে-ভাবে পূর্ণেন্দুকে আরতি বিদায় করেছিল, সেকথা কি পূর্ণেন্দু ভুলে গেছে? জীবনে কি কোনদিন ভুলতে পারবে? না, কোনদিন আর আরতির মুখ দেখবার ইচ্ছা জাগবে না পূর্ণেন্দুর মনে। না, কোন দিন না।

কিন্তু আরতিও তো সব কথাই জানে। তবু কি ক'রে লিখতে পারল, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে। তুমি এসো।'

আশ্চর্য মেয়েদের মন, আশ্চয ওদের মনের বিশ্বাস, পৃথিবীর পরম বিস্ময় এই মেয়েরা।

সন্ধ্যা উৎরে গেল। গোবিন্দ এসে সুইচ টিপে একবার আলো জেলেছিল, পূর্ণেন্দু নিজে উঠে গিয়ে সুইচ অফ্ করে দিয়ে এল। কিন্তু আকাশে ভাদ্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ। জানালার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে পূর্ণেন্দুর ময়লা বিছানায়। তক্তপোষের তলায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পূর্ণেন্দুর বড় চামড়ার স্যুটকেশটা। সেবার দু'জনে মিলে এলাহাবাদ থেকে পছন্দ ক'রে কিনেছিল।

পূর্ণেন্দু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। স্যুটকেশ খুলে বার করল ধোয়া আদ্দির পাঞ্জাবি আর মিহি ধুতিখানা। বেশ-বাসে পূর্ণেন্দু একটু সৌখীন। কিন্তু আজকাল আদ্দি আর বড়-একটা পরে না পূর্ণেন্দু। আজ পরল। ভালো করে পালিশ করল জুতো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিনিট পাঁচেক ধরে মাথা আঁচড়াল। টেবিলের ওপর থেকে ভাঁজ করা চিঠিটা নিয়ে বুকপকেটে রাখল। বুকের তাপ লাগল চিঠিতে; না, চিঠির তাপ লাগল বুকে? দোরটা তালা বন্ধ ক'রে চুপেচুপে বেরিয়ে পড়ল পূর্ণেন্দু, যেন কেউ তাকে দেখতে না পায়।

পূর্ণেন্দু কি ঢাকুরিয়ায় যাচ্ছে? হ্যাঁ যাচ্ছে। ক্ষতি কি। কি কথা আছে আরতির না হয় শুনেই এল একটু। না হয় দেখেই এল তার গৃহস্থালী। আরতির নিজের হাতে লেখা দলিল, নিজের হাতের আমন্ত্রণলিপি তো পূর্ণেন্দুর সঙ্গেই আছে। তার আর ভয় কি? দাসমশাই হয়ত একটু ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকাবেন। তা তাকালেনই বা। পূর্ণেন্দু মোটেই ভ্রূ কোঁচকাবে না। কালীপদর চোখে চোখ রেখে পূর্ণেন্দু দিব্যি সহজভাবে বাজারের মাছ

আর আলু-পটলের দর নিয়ে আলাপ করবে। তারপর এক ফাঁকে পূর্ণেন্দু আরতিকে জিজ্ঞেস করবে, তার কথাটা কি?

শিয়ালদহ পর্যন্ত হেঁটেই এল পূর্ণেন্দু। এসে দাঁড়াল বাস ষ্টপেজে। তিন, তিনের এ, তেত্রিশ, ছত্রিশ—যত বাজে নম্বরের বাস আসছে। অধীর হয়ে উঠল পূর্ণেন্দু। ট্রেনে যাবে কি না ভাবছে—এইট-বি ডবল ডেকার এসে দাঁড়াল। পূর্ণেন্দু আর দাঁড়ালো না। সোজা উঠে গেল ভিতরে। দোতালায় গিয়ে সাম্‌নের বেঞ্চটি দখল ক'রে বসল।

বাস ছেড়ে দিল।

আকাশে চাঁদ, বাতাসে স্নিগ্ধতা। এক গাছের ডাল হেলে পড়েছে আর এক গাছে। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

কি কথা আছে আরতির। অভাব-অনটনের কথা? স্বামীর অনাদর-অবিশ্বাসের কথা, মনের অস্বস্তি-অশান্তির কথা? না আরো কিছু, না কি আরো কিছু। তা নেতিবাচক নয়, তা পরম ইতিবাচক, অস্তিত্বে ভরা। তা আছে, তা এখনো আছে। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

কণ্ডাক্‌টারের চড়াগলার হাঁকে চমক ভাঙ্গল পূর্ণেন্দুর। ঢাকুরিয়ার মোড়। পাছে মোড় ছাড়িয়ে যায় তাই বাস বাঁধা থাকা সত্ত্বেও 'বাঁধকে বাঁধকে' ব'লে হুড়মুড় ক'রে নেমে পড়ল পূর্ণেন্দু।

রাস্তা জানে, বাড়ির মালিকের নাম জানে, কিন্তু নম্বর তো জানে না। নম্বর তো সে শোনেনি নিরঞ্জনের কাছে। ঠিকানা তো তাকে জানায়নি আরতি। সে জানে পূর্ণেন্দু যদি আসেই, ঠিকানা খুঁজেই আসতে পারবে। আর যদি না আসে তাহলে ঠিকানা দিয়েই বা লাভ কি?

হাতঘড়িতে সময় দেখল পূর্ণেন্দু। রাত ন'টা। এরই মধ্যে ঘুমন্ত পাড়া, ঝিমন্ত পাড়া। কিন্তু আকাশে চাঁদ দিব্যি জেগে রয়েছে।

মোড়ের পান-বিড়ির দোকানটির ঝাঁপ এখনো বন্ধ হয়নি। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দোকানীকে জিজ্ঞেস করল পূর্ণেন্দু, এখানে কালীপদ দাসের বাসা কোন্‌টা, খবরের কাগজে কাজ করে যে কালীপদ দাস, যার স্ত্রী যাদবপুর কলোনী স্কুলের হেড মিস্ট্রেস্।

দোকানী এবার চিনতে পারল, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল নতুন লাল বাড়িটা।

পূর্ণেন্দু আস্তে আস্তে এগুতে লাগল। ওর হৃদপিণ্ডের শব্দে পায়ের শব্দ ঢেকে যাচ্ছে।

বাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নাড়ল পূর্ণেন্দু। বার বছর আগে আরতিদের বাড়ির কড়া নাড়তে গিয়ে হাত যেমন কাঁপত, আজও তেমনি কাঁপতে লাগল।

একটু বাদেই দরজা খুলল, আলো জ্বলল বাইরের ঘরে। তারপর, হ্যাঁ— তারপর সে-ই এসে দাঁড়াল সামনে, অস্ফুট স্বরে বলল, 'কে?'

পূর্ণেন্দু কোন জবাব দিল না। আরতির প্রশ্নের উত্তর তো সে নিজেই।

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ কাটল। মনে হোল কয়েক যুগ।

আরতির পরণে চওড়া কালো পেড়ে শাড়ি। মাথায় আঁচল নেই কিন্তু দু' পাশের ঘন মসৃণ কালো চুলের মাঝখানে পুরু সিঁদুরের দাগ আছে। কানে রিং, গলায় সরু হার, হাতে দু'টি বালা, গাল দু'টি ভরাট, ঠোঁটে পানের দাগ।

একটু যেন ক্ষুণ্ণ হোল পূর্ণেন্দু। সারাটা পথ যে যোগিনী সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তির সে ধ্যান করতে করতে আসছিল, আরতির চেহারার সঙ্গে সে মূর্তির মিল নেই, আরতি সুখেই আছে। কিন্তু মানুষের বাইরের সুখ দেখে কি ভিতরের স্বাচ্ছন্দ্য সব সময় আন্দাজ করা যায়?

আরতি বলল, 'এসো, ভেতরে এসো।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'কালীপদ বাবু কোথায়?'

আরতি বলল, 'তুমি তাঁর নাম জানো?'

পূর্ণেন্দু বলল, 'জানি। তিনি কোথায়?'

আরতি বলল, 'তাঁর নাইট ডিউটি। প্রায় ঘণ্টা খানেক হোল বেরিয়ে গেছেন।'

পূর্ণেন্দু ভাবল, তাইতো, সে কি বোকা! কালীপদর নাইট ডিউটি না থাকলে, সে না বেরিয়ে গেলে আরতি পূর্ণেন্দুকে আসতে লিখবে কেন, ভিতরে ঢুকতে বলবে কি করে!

খান দুই-তিন উঁচু-নিচু চেয়ারে সাজানো বসবার ঘর। এক পাশে দেয়াল ঘেঁষে একখানি তক্তপোষও আছে। উত্তর দিকের দেয়ালে একখানি ক্যালেণ্ডার। আর তিন দিকের দেয়াল শাদা। সদ্য চূণকাম করা হয়েছে। ঘরের বাতাসে তার গন্ধ।

নিচু একটা বেতের চেয়ার দেখিয়ে আরতি বলল, 'বোসো, কেমন আছ?'

পূর্ণেন্দু বলল, 'তোমার প্রশ্নটি যত সোজা তার জবাব তত সহজ নয় আরতি। কেমন আছি ব'লে তোমার মনে হয় ?'

আরতি এ-কথার জবাব এড়িয়ে গিয়ে নতুন প্রশ্ন করল, 'এতদিন বাদে বুঝি মনে পড়ল ?'

পূর্ণেন্দু বলল, 'তোমারও তো এতদিন বাদেই মনে পড়েছে আরতি, তুমিও তো দু'বছর বাদেই এই প্রথম খোঁজ নিয়েছ, চিঠি লিখেছ।'

আরতি বিস্মিত হয়ে বলল, 'চিঠি ! চিঠি আবার কিসের ?'

পূর্ণেন্দু একটু থামল, 'দিয়ে যদি অস্বীকার করতে চাও সেকথা আলাদা। কিন্তু চিঠিখানা আমি পকেটে ক'রে নিয়ে এসেছি আরতি। তোমাকে ফেরৎ দিলাম।'

চিঠিটা পকেট থেকে বের ক'রে আরতির হাতে দিল পূর্ণেন্দু।

আরতি একটু কম্পিত হাতেই নিল চিঠিখানা, চোখ বুলিয়ে গেল লাইন দু'টির ওপর। মুহূর্তের জন্যে মুখখানা আরক্ত হ'য়ে উঠল ওর। আস্তে আস্তে বলল, 'এতো পুরোণ চিঠি। আমাদের শ্যামবাজারের বাসা থেকে তোমার মেসের ঠিকানায় লিখেছিলাম। সেবার ছুটিতে আমাদের জব্বলপুর যাওয়ার কথা হচ্ছিল।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'পুরোণ চিঠি ! তুমি ঠিক বলছ ?'

আরতি ম্লান একটু হাসল, 'বেঠিক ব'লে তোমাকে আজ আর লাভ কি ?'

পূর্ণেন্দু বলল. 'তা ঠিক।'

চিঠিতে ঠিকানা. কি তারিখ দেওয়ার বড়-একটা অভ্যাস ছিল না আরতির। এ চিঠিতেও সেই কালের চিহ্ন বাদ পড়েছে। কিন্তু আরতির চিঠি একালের নয় ; বিগত কালের, বিগত জীবনের। এ চিঠির আজ আর কোন অর্থ নেই.।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হ'য়ে বসে রহিল পূর্ণেন্দু। ওর কল্পসৌধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, চাঁদ মুছে গেছে আকাশ থেকে। 'কথা আছে' একথা মিথ্যে। কোন কথা নাই, কোন কথা নেই—এই হোল সব কথার শেষ কথা।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পূর্ণেন্দু, বলল, 'চললাম আরতি। চিঠিটা সত্যি আমার টেবিলে পড়েছিল। তোমাকে আমি ব্লাকমেল করতে আসিনি বিশ্বাস কর।'

আরতি বলল, 'ছিঃ! তা তুমি কোন দিন করতে পার না।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'এখন বুঝতে পারছি, এ সব হয়ত অক্ষয়বাবুরই কীর্তি। তোমার পুরোণ চিঠির বাণ্ডিল আমার খোলা ড্রয়ারে থাকে। তারই হয়ত একখানা অক্ষয়বাবুর হাতে পড়েছে। আর তিনি তাই নিয়ে আমার সঙ্গে নির্মম পরিহাস করেছেন। এখন বুঝতে পারছি; কিন্তু তিনি আর কতটুকু পরিহাস করতে পেরেছেন আরতি। ভাগ্যের বিদ্রূপ তার চেয়ে ঢের বেশি। চলি আরতি, চিঠিটা রইল তোমার কাছে। ছিঁড়ে ফেল, পুড়িয়ে ফেল। আর কোনদিন আমার এমন ভুল হবে না।'

পূর্ণেন্দু বেরিয়ে আসছিল, আরতি বাধা দিয়ে বলল, 'একটু দাড়াও।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'কি বলছ।'

আরতি তক্তাপোষের ওপর থেকে চিঠিখানি তুলে নিয়ে পূর্ণেন্দুর সামনে এসে ওর গা ঘেঁষে দাড়াল। তারপর আস্তে আস্তে চিঠিটা রেখে দিল ওর বুক পকেটে।

পূর্ণেন্দু বিস্মিত হয়ে বলল 'ও কি করছ?'

আরতি বলল, 'চিঠি তুমি নিয়ে যাও, ও তো তোমারই।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'কিন্তু এ পুরোণ চিঠি দিয়ে কি করব?'

আরতি একবার চোখে চোখে তাকাল পূর্ণেন্দুর। ওর চোখের কোণে জল। সেই জল লুকোবার জন্যেই বোধ হয় আরতি চোখ নামাল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'না, ও চিঠি পুরোণ নয়, ও চিঠি পুরোণ হয় না।'

আরতি দাড়াল না। দ্রুত পায়ে পর্দা ঠেলে ভিতরের ঘরে চলে গেল। নীল রঙের পর্দাটা কাঁপতে লাগল আস্তে আস্তে। নীল সমুদ্রে ঢেউ উঠেছে।

পূর্ণেন্দু মুহূর্তকাল সেইদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ ফিরিয়ে নেমে এল রাস্তায়। মোড় থেকে বাস ধরতে হবে। শেষ বাস বোধ হয় এখনো চলে যায়নি।

চাকরি

সদর দরজার কড়া নড়ে উঠতে একটু বিরক্তির স্বরেই সাড়া দিল নীলাম্বর, 'যাই', তারপর করিডোর পেরিয়ে এসে দোর খুলে দিয়ে বলল, 'ও তুমি।'

মাধবী লক্ষ্য করল নীলাম্বরের আহ্বানের মধ্যে তেমন আগ্রহ নেই, অন্যান্য দিনের মত তাকে দেখে নীলাম্বরের চোখ তেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল না। এসো কথাটুকু পর্যন্তও ফুটে বেরুলো না মুখে। আজ যেন নীলাম্বর প্রত্যাশা করেনি ওকে, আজ যেন ওর না আসাই ভালো ছিল। নীলাম্বরের হয়তো মন ভালো নেই। কিন্তু মাধবী কি শুধু ওর সুদিনের সহচরী, ওর মন ভালো-না-থাকা দিনের কেউ নয়?

একটু চুপ ক'রে থেকে মাধবী বলল, 'দু'দিনের মধ্যে তুমি তো আর গেলে না। তাই এলাম।'

নীলাম্বর বলল, 'যাওয়ার মত মনের অবস্থাও ছিল না, সময়ও ছিল না।'

মাধবী একটু হাসল, 'আমার কিন্তু আসবার মত মনের অবস্থাও আছে, সময়ও আছে।'

নীলাম্বর গম্ভীরভাবে বলল, 'বেশ তো এসো।'

নীলাম্বরের পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকল মাধবী।

উঠানের এক দিকে কলের কাছে নীলাম্বরের মা সুরবালা এক পাঁজা এঁটো বাসন নিয়ে বসেছেন। পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে মাধবীর দিকে তিনি একবার তাকালেন। তারপর ফের বাসন মাজতে সুরু করলেন। ভালোমন্দ কোন কথাই বললেন না। এর আগে যতবার মাধবী এসেছে এমন হয়নি। এই দু'দিনের মধ্যে এমন কি ঘটতে পারে ও ভেবে পেল না।

নীলাম্বরের বোন উমা ছাদ থেকে শুকনো কাপড় তুলে নিয়ে নিচে নেমে এল। চৌদ্দ-পনের বছরের সুন্দরী কিশোরী। নীলাম্বরের মতই ফর্সা রঙ, পাতলা ঠোঁট, টানা-টানা নাক-চোখ। অন্যদিন মাধবীকে দেখলে সে ভারী উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, হয় কোমর না হয় হাত জড়িয়ে ধরে। কিন্তু আজ সে কাছে পর্যন্ত এল না, দূরে দাঁড়িয়ে শুকনো গলায় বলল, 'ভালো আছেন মাধবীদি?'

মাধবী বলল, 'আমি তো ভালোই আছি। কিন্তু বাড়িশুদ্ধু তোমাদের হোল কি?'

এ-কথার জবাব না দিয়ে উমা শুকনো কাপড়গুলি নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে একখানা তক্তপোষ পাতা, তার উপর নীলাম্বরের বাতব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ বাবা নীলকণ্ঠ চাটুয্যে কাত হয়ে শুয়ে রয়েছেন। ঘুমিয়েছেন বলেই মনে হোল।

মাধবী সেইদিকে একটু তাকিয়ে বলল, 'উনি কেমন আছেন? ওঁর অসুখ বেড়েছে না কি?'

নীলাম্বর বলল, 'না, ওঁর আর বাড়া-কমা কি। চল ওপরে চল।'

সিঁড়িতে পা রেখে মাধবী তবু আর একবার প্রশ্ন করল, 'মণ্টুকে দেখছিনে যে, সেবার ওরও তো জ্বর দেখে গিয়েছিলাম।'

মণ্টু নীলাম্বরের ছোট ভাই, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে।

নীলাম্বর অধীর হয়ে বলল, 'জ্বরে মারা যায়নি, সেরে উঠেছে। স্কুল থেকে ফিরে এসে খেলতে বেরিয়েছে। শারীরিক আমরা সবাই ভালো আছি, মাধবী। সেজন্য তোমার কোন চিন্তা করতে হবে না, এসো।'

অন্য ভাড়াটেদের ঘরের সুমুখ দিয়ে হেঁটে এসে দক্ষিণ প্রান্তের ছোট ঘরখানায় ঢুকল মাধবী। এ ঘর নীলাম্বরের। তু'দিন বাদে এ ঘর তারও হবে। তু'বছর আগেও হ'তে পারত। কিন্তু নীলাম্বর বলেছে, 'অত তাড়া কিসের?' মাধবী বলেছে, 'বেশ তো, তোমার যদি তাড়া না থাকে আমারও নেই।'

ঘরখানা ছোটই। ঠিক একেবারে তু'জনের যোগ্য ঘর। তু'জনের বেশি এঘরে ধরে না। আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। বরং তার বিরলতাই চোখে পড়ে। দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে একটা মাদুর পাতা। ঢাকনিওয়ালা একটা বালিশও মাঝখানে টেনে আনা হয়েছে। নীল লতার বর্ডার দেওয়া সাদা ঢাকনিটা মাধবীর নিজের হাতের তৈরী। নীলাম্বরের জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল। পূব দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা ট্রাঙ্ক আর তার ওপর মুখ-খোলা একটা সুটকেশ। উত্তর দিকে ছোট একটা বইয়ের র‍্যাক। ওপরের দেয়ালে আলনায় নীলাম্বরের আধময়লা লংক্লথের গোটা-তুই জামা ঝুলছে।

'অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি দেখছ? ঘরের জিনিসপত্র কিছুই খোয়া যায়নি। সব ঠিক আছে। বোসো।'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিজে বসে, মাধবীকে মাদুরের ওপর বসতে বলল নীলাম্বর।

মাধবী একটু হাসল, 'সব যদি ঠিকই থাকে তোমার মেজাজটা এত বেঠিক হয়ে পড়ল কেন ?'

নীলাম্বর বলল, 'ও, তোমার সঙ্গে বুঝি তেমন মিষ্টি ক'রে কথা বলতে পারিনি। মেজাজ বেঠিক হবার সামান্য একটু হেতু আছে মাধবী। চাকরিটি নেই।'

মাধবী একটু চমকে উঠে বলল 'সে কি !'

নীলাম্বর কোন জবাব না দিয়ে প্যাকেট থেকে সর্বশেষ সিগারেটটি ধরিয়ে মৃদু হাসল, তারপর বলল, 'কারণ অবশ্য অনেক। কিন্তু সমূহ কারণ আমাদের প্রমোদভ্রমণ। তাছাড়া অফিসে দিন দশেক পরে জয়েন করায় এ মাসের কাগজ বেরুতে দেরি হয়েছে। বিজ্ঞাপন যোগাড় করা হয়নি তাই নিয়ে শুকদেববাবুর সঙ্গে কথা কাটিকাটি। ঝগড়াটা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে রিজাইন না ক'রে আর জো রইল না। তিনি নিজেই স্পষ্ট রিজাইন করতে বললেন। কারণ তা'তে এক মাসের মাইনে বেশি দিতে হবে না।'

মাধবী এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর বলল, 'কিন্তু তোমার এতদিনের চাকরি, এই সামান্য কারণে—'

নীলাম্বর বলল, 'কারণটা আমাদের কাছে সামান্য হতে পারে। কিন্তু উদয়ন প্রেসের মালিক শুকদেব রায়ের তা মনে হয়নি।'

মাধবী ফের একটুকাল চুপ ক'রে রইল। নীলাম্বরের কথার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে কারণটা ওর কাছেও এখন অসামান্য। এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে কেন নীলাম্বরের মা-বোনের মুখ মাধবীকে দেখে বিরস হয়ে উঠেছে। কেন নীলাম্বরের বাবা তাকে দেখে ঘুমের ভাণ করেছেন।

মাধবী অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'তা'হলে তোমার চাকরি যাওয়ার জন্যে এক হিসাবে আমিই দায়ী। আমিই তোমাকে দেরি করিয়ে দিয়েছি। অফিসে সময়মত জয়েন করতে দিইনি।'

নীলাম্বর বলল, 'কি যে বল।'

কিন্তু গলাটা তেমন জোরাল শোনাল না।

একটু বাদে নীলাম্বর বলল, 'খানিক আগে বাবা বড় অদ্ভুত কথা বলছিলেন।'

মাধবী নীরবে চোখ তুলে তাকাল।

নীলাম্বর বলল, 'তিনি বলছিলেন গরীবের সংসারে বিয়ে কথাটাই ভালো। তা'তে ঘর-গৃহস্থালীও থাকে, চাকরি-বাকরিও থাকে। কিন্তু প্রেমটা বড় সাংঘাতিক। তাতে হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, সব নষ্ট হয়।'

মাধবীর মনে হোল কথাটা শুধু যেন এখন নীলাম্বরের বাবার না, নীলাম্বরেরও।

মাধবী, বলল, 'কিন্তু এই সব সাংঘাতিক জিনিসের মধ্যে তোমাকেই বা কে যেতে বলেছিল। অনেক দিন আগেই তো তুমি শান্তশিষ্ট গৃহস্থ হ'তে পারতে।'

নীলাম্বর বলল, 'তা ঠিক। তোমার দোষ নেই। তুমি অনেকদিন আগে থেকেই বিয়ের কথা বলেছ। অবস্থায় কুলোয়নি ব'লে আমিই রাজী হ'তে পারিনি। আজ আবার তোমার দাদা এসেছিলেন। বললেন, ওঁরা না কি দিন তারিখ সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন। এখন আমার মত হলেই'

মাধবী বলল, 'তুমি কি বললে?'

নীলাম্বর অদ্ভুত একটু হাসল, 'আমার তো মত দেওয়াই উচিত। দিন তারিখ যখন ঠিক হ'য়ে গেছে—'

মাধবী একবার মাথা নিচু করল, তারপর ফের মুখ তুলে বলল, 'দাদা তো আর জানেন না তোমার চাকরি গেছে। কিন্তু গেলেই বা কি। চাকরি গেছে আবার হবে। ওঁরা যখন দিনটিন সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন, আমি বলি কি ওঁদের মতে মত দেওয়াই ভালো। এদিকে মানসীর সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে। বাবার ইচ্ছা আমাদের দু' বোনের—'

নীলাম্বর ফের একটু হাসল, 'হ্যাঁ, দুই বোনের বিয়ে এক সঙ্গেই হয়ে যাক্। তারপর আমি গিয়ে তোমাদের বাড়ীতে ঘরজামাই হয়ে থাকি। তাও না হয় থাকতাম মাধবী কিন্তু আমার যে আরও কয়েকজন পোষ্য রয়েছে। বুড়ো বাবা-মা, ভাই-বোন—'

মাধবী ফের মাথা তুলল, 'তাঁদের খরচ আমি চালাব।'

নীলাম্বর বলল, 'তুমি!'

মাধবী বলল, 'হ্যাঁ। মাষ্টারী ক'রে যদিও আমি বেশি পাইনে। কিন্তু দু'বেলা টিউশানি করব, তুমিও তাই করবে। আর ফাঁকে-ফাঁকে লিখবে; কোন রকমে চলে যাবেই। একটা ব্যবস্থা হবেই শেষ পর্যন্ত।'

নীলাম্বর বলল, 'তবু এই বেকার অবস্থায় আমার বিয়ে করা চাই। পঞ্জিকার দিন পাল্‌টানো যাবে না?'

মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে নীলাম্বর একটু হাসল, 'তোমার মনে জব্বলপুরের মারবেল রকের পূর্ণিমা রাতের সেই ছোঁয়াচ এখনও র'য়ে গেছে, মাধু। কিন্তু কলকাতা সহরটা মারবেল রকে তৈরী নয়। আর, বেকার জীবনের দিনগুলিতে রোদের তাপ থাকে, কিন্তু রাতগুলিতে চাঁদের আলো থাকে না। তুমি অনেকদিনই তো অপেক্ষা করেছ মাধু, আরও ক'টা দিন সবুর কর। তোমার বাবা আর বড়দাকেও বুঝিয়ে বল। কোন রকম একটা চাকরিবাকরি জুটিয়ে নিই, তারপরে পঞ্জিকায় আরও বিয়ের দিন মিলবে।'

মাধবী একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আচ্ছা, আমি তাহ'লে যাই।'

নীলাম্বর বলল, 'চল, এক সঙ্গেই বেরোই। তুমি কি রাগ করলে?'

মাধবীর হাতে নীলাম্বর আস্তে একটু চাপ দিল।

মাধবী বলল, 'না, রাগ করবার কি আছে। আমিই বরং এতক্ষণ অবুঝের মত কথা বলছিলাম, তুমি মাপ কর আমাকে।'

মাধবীর চোখদুটো যেন ছলছল ক'রে উঠল।

এবার নীলাম্বর ওর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলল, 'ছিঃ।'

নরম সুন্দর হাত। রঙটা একটু ময়লা। কিন্তু আঙুলগুলির গড়ন ভারি চমৎকার। শুধু রঙের জন্যই চাঁপার কলি বলা যায় না। না হলে যেত। কিন্তু রঙটাই কি সব। না, রঙ যে রূপের সবখানি নয়, তা মাধবীর দিকে তাকালে বোঝা যায়। বরং নীলাম্বরের মনে হয় এমন সুন্দর নাক-চোখের সঙ্গে ফর্সা রং যেন বেমানানই হোত। রঙ নিয়ে একদিন মাধবী আফশোষ করায় বলেছিল, 'কালো রঙই ভালো। কালো রঙের মধ্যে একটা গভীরতা আছে, ফর্সা রঙে তা নেই।'

মাধবী হেসেছিল, 'একেবারে নেই বলা যায় না। ফর্সা রঙওয়ালাদের মধ্যেও দু'একজন ব্যতিক্রম থাকে। তাদের সঙ্গে গাম্ভীর্যে গভীরতায় কিছুতেই পাল্লা দিয়ে পারা যায় না।'

নীলাম্বর বলেছিল, 'ও, আমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্যই বুঝি তুমি তা হ'লে অমন মুখ ভার ক'রে শান্তশিষ্ট হয়ে থাক।'

'দাদা, তোমাদের চা এনেছি।'

দরজার বাইরে উমার গলা শোনা গেল। উমা ভারি বুদ্ধিমতী নীলাম্বর আর মাধবী এক সঙ্গে থাকলে সাড়া না দিয়ে সে ঘরে ঢোকে না। নীলাম্বর তাড়াতাড়ি মাধবীর হাত ছেড়ে দিয়ে ছোট বোনকে ডাকল, 'আয় ভিতরে।'

উমা চা দিয়ে চলে যাচ্ছিল, মাধবী তাকে হাত ধ'রে টেনে বসা'ল।

উমা বলল, 'আমার কাজ আছে।'

মাধবী একটু হাসল, 'আচ্ছা, এখানে একটু বসলে সে-কাজের কোন ক্ষতি হবে না।'

নীলাম্বর মাধবীর অনেক আগেই চায়ের কাপ শেষ ক'রে ফেলল। তারপর আলনা থেকে পাঞ্জাবিটা পেড়ে নিয়ে বলল, 'তুমি তাহলে ওর সঙ্গে বসে গল্প কর, আমি বেরোই।'

মাধবী বলল, 'এত তাড়া কিসের?'

নীলাম্বর বলল, 'তাড়া আছে। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পাঁচটার মধ্যেই দেখা করতে হবে। এর পরে গেলে দেখা হবে না।'

নীলাম্বরের বেকারত্বের কথা ফের মনে পড়ে গেল মাধবীর। এখন আর র'য়ে ব'সে গল্প করার সময় নেই, চাকরির খোঁজে তাকে এখনি বেরুতে হবে।

গরম চা মাধবী খেতে পারে না, ভালোবাসে না। কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি চা শেষ ক'রে সে-ও উঠে পড়ল, 'চল, আমিও আসছি।'

উমা মাধবীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'আমি এখন যাচ্ছি মাধবীদি। আমার সত্যি কাজ আছে।'

মাধবীও মনে মনে হাসল। সাবাস মেয়ে। কিন্তু আজ উমার অনুমান ভুল। আজ নীলাম্বর আর মাধবীর কাজের অছিলা নেই। কাজ খোঁজার প্রয়োজন আছে।

দু'জনে বেরিয়ে এসে লোয়ার সার্কুলার রোডে পড়ল।

মাধবী বলল, 'তুমি কোন্ দিকে যাবে?'

নীলাম্বর বলল, 'শ্যামবাজার। তুমি তো ভবানীপুরে।'

মাধবী বলল, 'হ্যাঁ, তবে ভাবছিলাম, আর. জি. কর রোডে আমার এক পিসতুতো ভাই থাকেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসব কিনা।'

নীলাম্বর ভ্রূ কুঁচকে বলল 'কেন ?'

মাধবী বলল, 'তিনি সিভিল সাপ্লাইতে কাজ করেন। তাঁর কাছে শুনতাম কোথাও কিছু খালি আছে কি না—

নীলাম্বর বলল, 'থাক থাক। তুমি বরং বাসায় যাও তার চেয়ে। অনর্থক ঘোরাঘুরির দরকার নেই।'

হাতঘড়ির দিকে একটু তাকিয়ে একটা চলন্ত ট্রামে নীলাম্বর তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। মাধবীকে কিছু বলবার সময় পর্যন্ত দিল না। নীলাম্বর কি তার কথা বিশ্বাস করল না ? সে কি ভেবেছে মাধবীর আর. জি. কর রোডের পিসতুতো ভাই ভুয়ো ! শুধু নীলাম্বরের সঙ্গে যাওয়ার জন্যই মাধবী একটা অজুহাত দিয়েছে। সেইজন্যই 'অনর্থক ঘোরাঘুরির' কথা তুলে অমন ক'রে বিরক্তি জানিয়ে গেল। কিন্তু নীলাম্বর ভেবেছে কি মাধবীকে ? এতদিনের পরিচয়েও সে কি তাকে চিনতে পারেনি। না কি নিজের মুখে বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেছে ব'লেই নীলাম্বর তাকে এমন মনে করল।

কিন্তু দু'জনের পরিচয় তো দু'এক বছরের নয়, পুরো ছ'বছর ধরে পরস্পরকে তারা জানে। যখন বয়স অল্প ছিল, তখনই কোন অশোভন অধীরতা প্রকাশ করেনি মাধবী, আর এখন করবে ?

মাধবী তখন বি.এ. পড়ে। দাদার সঙ্গে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এক সাহিত্যসভায় যোগ দিতে গিয়েছিল। সভা ভাঙ্গলে গৌরবর্ণ ছিপছিপে লম্বা তেইশ-চব্বিশ বছরের সুদর্শন এক যুবকের সঙ্গে সুপ্রকাশ তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার বন্ধু নীলাম্বর চাটুয্যে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলায় সেকেণ্ড ক্লাস ফাষ্ট হয়েছে। কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাস ফাষ্ট আর ফাষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড তো বছর-বছরই বেরোয়—তাদের ভিতর থেকে কবি আর প্রাবন্ধিক বেরোয় ক'জন ? নীলাম্বর সব্যসাচী। ও ডান হাতে পদ্য লেখে, বাঁ হাতে গদ্য। না কি উল্টো বললাম নীলাম্বর। আর ইনি আমার সহোদরা শ্রীমতী মাধবী সেন। স্পেশাল বেঙ্গলি নিয়ে স্কটিশে পড়ছেন। এঁরও সাহিত্য বাতিক পুরো মাত্রায়।'

নীলাম্বর একটু হেসেছিল, 'বাতিক !'

মাধবী প্রতিনমস্কার ক'রে জবাব দিয়েছিল 'আপনি কিছু মনে করবেন না। দাদা নিজে লিখতে পারে না ব'লে সব লেখককেই ঠাট্টা করে।'

নীলাম্বর বলেছিল, 'তা করুক। অলেখকদের ঠাট্টায় আমাদের কিছু এসে যায় না।'

সুপ্রকাশ জবাব দিয়েছিল, 'দুনিয়ায় দলে কিন্তু আমরা অলেখকেরাই ভারি। সে-কথা মনে রেখ। তারপর আছো কোথায় আজকাল ? না কি কেবল কবিতা লিখেই দিন কাটাচ্ছ ?'

নীলাম্বর বলেছিল, 'তাতে কি আর দিন কাটে ? একটা মাসিক কাগজের অফিসে চাকরি নিয়েছি। তাদের প্রেস পাবলিকেশনও আছে।'

'তা তো আছে বুঝলুম। কিন্তু প্রসপেক্ট্ আছে তো ?'

নীলাম্বর একটু মুচকে হেসেছিল, 'দেখা যাক্। মনের মত কাজ আর মনের মত মাইনে দুই-ই কি একসঙ্গে মেলে ভাই ? একটিকে ছাড়তে হয়।'

এই স্থূল প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গিয়ে মাধবী বলেছিল 'আপনার কবিতা আমি অনেক পড়েছি। খুব ভাল লাগে।'

নীলাম্বর একটু হেসে বলেছিল, 'তাই নাকি ? কিন্তু আপনি কি লেখেন তা তো বললেন না।'

মাধবী লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি লিখি কে বলল আপনাকে ?'

তারপর মাধবী নিজেই একদিন বলল। সুপ্রকাশের আমন্ত্রণে নীলাম্বর তখন ওর শিক্ষকতার ভার নিয়েছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে পাঠ্যের বহির্ভূত কাব্যসাহিত্যের আলোচনাই চলেছে বেশী। তারও পরে আলাপটা শুধু সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গিয়ে পৌঁছল। এম.এ. পাশ ক'রে হাই স্কুলে মাষ্টারী নিল মাধবী।

বাবা বললেন, 'মাষ্টারী ক'রে কি করবি।' মাধবী একটু হাসল, 'ক'রে দেখি দিনকয়েক।'

সুরেনবাবু বললেন, 'তার চেয়ে নীলাম্বরকে এবারে বলি।'

মাধবী মুখ নিচু ক'রে বলল, 'না না, তোমায় কিছু বলতে হবে না বাবা।'

সুরেনবাবু বললেন, 'বেশ তাহলে তোরাই বলিস। কিন্তু অসবর্ণ বিয়েতে নীলাম্বরের বাবা-মা রাজী হবেন তো? ওঁদের কোন অমত নেই তো?'

মাধবী ঘাড় নাড়ল, 'না। তুমি যা ভাবছ তা নয়। তেমন গোঁড়ামী নেই ওঁদের।'

গোঁড়ামী গোড়ার দিকে অবশ্য খুবই ছিল। কিন্তু নীলাম্বরের বাবা-মা যখন বুঝতে পারলেন ছেলে নিজের পছন্দ করা এই মেয়েটিকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবে না, তখন শেষ পর্যন্ত তাঁরা সম্মতি জানিয়ে বললেন, বেশ, তাহলে কর তোমার যা খুসি। কিন্তু যা করবার তাড়াতাড়ি ক'রে ফেল বাপু। যাকে বউ ক'রে আনতেই হবে, সে যত শিগ্‌গির অন্তঃপুরে ঢোকে ততই ভাল। বিয়ের আগে এখন ঘনঘন যাতায়াত, মেলামেশা দেখলে লোকে হয়ত এক সময় এককথা ব'লে বসতে পারে। তাছাড়া পরিচয় পুরোন হবার পর, দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর মাধবীর ওপর থেকে তাঁদের বিদ্বেষ ভাবটাও ক্রমে প্রশমিত হয়ে এসেছে। নীলাম্বরের মা'র মুখে একথাও বলতে শোনা গেছে—বামুনের মেয়ে না হলে কি হবে, মেয়েটি ভারি শান্তশিষ্ট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; স্বভাবে নম্রতা আছে, অত লেখা পড়া জেনেও তেমন অহংকার নেই।

মাধবীর নিজের পরিবারের সমর্থন পেতেও কম সময় যায়নি। তাঁদের আপত্তি ব্রাহ্মণ-বৈদ্যে নয়, নীলাম্বরের ভাল চাকরীবাকরী নেই, আর্থিক উন্নতির দিকে ওর মন নেই ব'লে। দিন তো ঠিক এভাবে যায় না। যখন বয়স বাড়ে, সংসার বাড়ে তখন এসব লোকের কষ্টের অবধি থাকে না। কিন্তু মাধবী নিজের সঙ্কল্পে অটুট রয়েছে। সংসারযাত্রায় নীলাম্বর ছাড়া আর কেউ সঙ্গী হবে, এ কি কল্পনাও করা যায়। ওর স্থান আর কেউ গ্রহণ করেছে ভাবতেই বিসদৃশ লাগে, অস্বস্তি বোধ হয়। মাধবীর দৃঢ়তায় ওর বাবাও শেষ পর্যন্ত হার মেনেছেন। দাদা খুব ভাল ছেলে। সে মাধবীর সাহিত্যপ্রীতি নিয়ে ব্যঙ্গ করলেও এই বিশেষ সাহিত্যিক প্রীতির ব্যাপারে কোনদিন মাথা গলাতে আসেনি। ক্রমে দুই পক্ষেরই সম্মতি মিলেছে। অন্তত তীব্র কোন বিরোধিতা কি মনঃক্ষোভের সামনে দাঁড়াতে হবে না, সে আশ্বাস পেয়েছে দু'জনে। কিন্তু নীলাম্বর তবু নির্বিকার। ওর হাতে যেন অফুরন্ত কাল, অনন্ত যৌবন মজুত রয়েছে। কোন ভাবনা নেই।

তারপর একদিন মাধবী বলল, 'মাষ্টারী আমার আর ভালো লাগে না।'

নীলাম্বর ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে হাসল, 'কিন্তু আর্থিক দিক থেকে আমি যে রকম বিত্তবান তাতে বিয়ের পরও তুমি মাষ্টারি থেকে রেহাই পাবে আমার মনে হয় না।'

মাধবী বলল, 'না-ই বা পেলাম। এখনকার চাকরির সঙ্গে তখনকার অনেক তফাৎ থাকবে।'

নীলাম্বর বলল, 'তাতো থাকবেই। এখন তোমার বাপের বাড়িতে রাঁধুনি আছে, ঝি-চাকর আছে। কিন্তু আমাদের বাসায় তুমি আসবার সঙ্গে সঙ্গে যে ওদের শুভাগমন ঘটবে তা মনে হয় না। তখন হাত পুড়িয়ে রেঁধে ঘর-গৃহস্থালীর সব কাজ সেরে তোমাকে বেরুতে হবে চাকরিতে। ক'দিন শরীর টিকবে ?'

মাধবী অভিমান ক'রে বলেছিল 'থাক থাক।' আমার শরীরের জন্য তো ভারি ভাবনা তোমার ?'

নীলাম্বর বলেছিল, 'শুধু শরীরের জন্য নয়, আমি তোমার মনের কথাও ভাবছি। এখন পর্যন্ত সংসার তো তেমন ক'রে দেখনি, জান না সংসারটি কি বস্তু। অভাব-অনটন দিয়ে তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সে আটক রাখবে। এক মুহূর্তও দম ফেলবার ফুরসৎ দেবে না। কোথায় থাকবে সাহিত্য, পড়া-শুনো, কোথায় থাকবে কি। দৈহিক অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য দিনরাত যুঝতে হবে, মন ব'লে যে কোন-কিছু আছে সেকথা মনেও পড়বে না।'

মাধবী বলেছিল, 'যদি মনেই না পড়ল, তা হ'লে তো সব গোলমালই চুকে গেল। তা হ'লে আর দুঃখ কিসের ?'

নীলাম্বর বলেছিল, 'না, ঠিক ওই ধরণের দুঃখ-মুক্তি আমি চাইনে।'

'তা হলে কি চাও তুমি ?'

আরও একটু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। মোটামুটি ভালোভাবে বাঁচতে হ'লে যেটুকু দরকার শুধু সেইটুকু। যেন অন্নবস্ত্রের চিন্তায় সমস্ত সময় আর সামর্থ ব্যয় না হয়, যেন আরো কিছু অবশিষ্ট থাকে। যেন রেশন আর বাজারেই সব না ফুরোয়, মাসে একবার বইয়ের দোকানে যেতে পারি, দিনে একবার বই নিয়ে বসতে পারি, মুখোমুখি দুটো অসাংসারিক কথা বলবার অবকাশ যেন পাই। ঠিক এখন যেমন পাচ্ছি।'

মাধবী বলেছিল, 'কেবল এখন কেন, ইচ্ছা থাকলে তখনো তাই পাবে। বিয়ের পর সহরের পার্কগুলি তো আর হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে না।'

নীলাম্বর জবাব দিয়েছিল, 'কিন্তু আর্থিক অবস্থাটা না বদলালে পার্কে আসবার ইচ্ছাটা উধাও হবে।'

মাধবী আর কোন কথা বলেনি। যখন বিয়ের প্রসঙ্গ ওঠে তখনই নীলাম্বর আর্থিক অবস্থার দোহাই পাড়ে। কিন্তু আর্থিক অবস্থা যাতে ভালো হয়, ভাল চাকরীবাকরী মেলে সে দিকে ওর কোন উৎসাহ দেখা যায় না। অর্থ নিয়ে ওর চিন্তা আছে, কিন্তু চেষ্টা নেই। এদিকে মাসের পর মাস কাটছে, বছরের পর বছর। নীলাম্বরদের উদয়ন প্রেস আর পাবলিকেসন সেই যে যুদ্ধের সময় একবার একটু ভালো হয়েছিল, আর মাথা তুলতে পারেনি। বছরের পর বছর নীলাম্বর স্থানুর মত পড়ে আছে ওখানে। মাইনের অঙ্ক অপরিবর্তনীয়।

মাধবী একদিন বলল, 'তোমাদের উদয়নের অস্তগমনের দিন এসেছে। আগে আগে সরে পড়াই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

নীলাম্বর বলল, 'এটা প্রখর বুদ্ধিমতীরই পরামর্শ। কিন্তু আমি ভেবে-ছিলাম তুমি আরও একটু বেশী হৃদয়বতী। মনে আছে, এই উদয়নকে মধ্যবর্তী রেখেই একদিন আমাদের আলাপ জমে উঠেছিল। তোমার কত গল্প-কবিতা আলোচনা-সমালোচনা এই উদয়নের পাতায় ছাপা হয়েছে। নিজেদের গোপন মনের কথা আমরা এই কাগজে ছেপে বার করেছি। হাজার লোকের চোখের সাম্‌নে তাকে মেলে ধরেছি। তবু তার গোপনত্ব ঘোচেনি। উদয়ন তো আমাদের কাছে শুধু সাধারণ একখানা মাসিকপত্র নয়, তার চেয়ে বেশি।'

'বেশ সেকথা ঠিক। কিন্তু ক'বছর আগে যা ছিল দু'জনের মিলনের সেতু, তাই যেন আজ ব্যবধান হয়ে উঠেছে।'

নীলাম্বরের এই উল্টোপাল্টা কথায় একেক সময় ভারি রাগ হয়, ভারি দুঃখ হয় মাধবীর। ওর সমস্ত কবিত্ব কি শুধু উদয়নকে ঘিরে আর মাধবীর বেলাতেই নীলাম্বর হয়ে পড়ে অর্থনীতির ছাত্র, ওর কবিতার খাতা জমাখরচের খাতার রূপ নেয়? তবে কি নীলাম্বরের মনে কোন সংশয় আছে? কিন্তু মাধবীর মনে তো কোন দ্বিধার স্থান নেই।

জব্বলপুরে মিলিটারী এ্যাকাউন্‌টসে চাকরি করে মাধবীর মাসতুতো ভাই

নির্মল গুপ্ত। তার স্ত্রী উর্মিলা মাধবীর সহপাঠিনী, পড়া কবে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু চিঠি লেখার আজও বিরাম নেই। একখানা চিঠির জবাব দিতে-না-দিতে উর্মিলা দু'খানা চিঠি ছাড়ে। আর এমন মাস যায় না যে-মাসে মাধবীকে নিমন্ত্রণ না করে, 'এসো, শুধু একা নয়, একেবারে সঙ্গী সমভিব্যাহারে। কলকাতা সহরে পুরুতের যদি অভাব থাকে, এখানে খাঁটি মারাঠি ব্রাহ্মণকে মন্ত্র পড়াবার জন্য ডেকে আনব।'

মাধবী জবাবে লিখল, 'কাকে মন্ত্র পড়াবে ভাই, তার মন এখনও বুঝতে পারছিনে।'

উর্মিলা লিখল, ''বল কি! ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ মরে বেঁচেছেন। নইলে এই জব্বলপুরে টেনে এনে তাঁকে দিয়ে গানের কলিটা নতুন ক'রে লিখিয়ে নিতাম, 'হে মাধবী দ্বিধা কেন নয়, হে মাধব দ্বিধা কেন।' আসলে যত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মাধবদের মনেই, মাধবীরা চিরকালই একরোখা। রবীন্দ্রনাথ তো নারী কবি নন, দাড়িওয়ালা কবি। তাই সমস্ত দোষ মাধবীদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। যাহোক তোমার কোন ভাবনা নেই। যেমন ক'রে পার, ভদ্রলোককে এখানে টেনে নিয়ে এসো। তারপর আছি আমি, আছে মারাঠি ব্রাহ্মণ, আর আছে মারবেল রক। সেই রকে ধাক্কা লেগে লেগে ওঁর দ্বিধা যদি শতধা না হয়, আমি কি বলেছি।''

পুজোর ছুটি হয়-হয়, মাধবী বলল, 'চল বেড়িয়ে আসি।'

নীলাম্বর বলল, 'কোথায় ভবানীপুরে?'

'না, জব্বলপুরে।'

নীলাম্বর বলল, 'ওরে বাপরে, অত টাকা কোথায় পাব? বাবার অসুখে অনেক খরচ হ'য়ে গেছে।'

মাধবী বলল, 'সেজন্য ভেবোনা, স্কুলের মাইনে থেকে আমি সামান্য কিছু জমিয়েছি তা অসুখে খরচ হয়নি।'

নীলাম্বর তবু দু'তিন দিন ইতস্তত করল, সময় নিল, তারপর বলল, 'আচ্ছা চল।'

দেখা গেল উর্মিলার কথাই সত্য। কলকাতার চৌহদ্দী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে অম্বরে মেঘের ছিঁটে-ফোঁটাও রইল না। আকাশ হোল স্বচ্ছ নীল, ফেনিল হোল হৃদয়সমুদ্র। দু'জনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরল, কখনো বা শ্রান্ত হয়ে শুধু

পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বসে রইল, রাণী দুর্গাবতীর দুর্গের ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে নতুন ক'রে হৃদয়দুর্গের দ্বারোদ্ঘাটন হোল দু'জনের। তারপর দল বেঁধে একদিন গেল মারবেল রক দেখতে। নির্মল আর উর্মিলা সুযোগ দিতে কোন কার্পণ্য করল না। মাধবীরা দু'জনে মিলে ধারাস্নান করল, কবিতা আবৃত্তি করল, কিন্তু নর্মদা প্রপাতের গর্জনে কোন কথা শোনা যায় না, ওর জলধারার তোলপাড়ে সব ঢেকে যায়। না কি, এ তোলপাড় শুধু প্রপাতের নয়?

এদিকে ছুটি ফুরিয়ে গেছে। কলকাতা থেকে কাজের তাগিদ নিয়ে চিঠি যাচ্ছে। সব চিঠি খোলবার সময় হয়নি। তবু নীলাম্বর একদিন বলল, 'এবার যেতে হয়।'

উর্মিলা বলল, 'সে কি, এখানে এসে পূর্ণিমা রাত্রে মারবেল রক যদি না দেখলেন, দেখলেন কি?'

মাধবীও জোর দিয়ে বলল, 'পূর্ণিমার আগে যাব না।'

নীলাম্বর বলল, 'কিন্তু পূর্ণিমার তো এখনো বেশ দেরি আছে।'

মাধবী বলল, 'কি আর এমন দেরি? ক'টা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

তারপর এল সেই প্রার্থিত পূর্ণিমা। একেক যুগলের জন্য একেকখানা ডিঙি। রাত দুটো পর্যন্ত চলল জল-বিহার। দু'ধারে জ্যোৎস্না-ধোয়া মর্মর প্রস্তর নীলাম্বরের উজ্জ্বল চাপল্যের নীরব সাক্ষী হয়ে রইল।

পরদিন ভোরে উর্মিলা বলল, 'কবি মানুষ, ভালো ক'রে একখানা বর্ণনা করুন তো দেখি, কেমন দেখলেন।'

নীলাম্বর বলল, 'তবেই হয়েছে। আমাকে কিছু দেখতে দিলে তো দেখব।'

উর্মিলা মুখ টিপে হাসল, 'কেন, দেখায় বাধা হলো কিসের?'

নীলাম্বর বলল, 'সেই যে চক্রান্ত ক'রে একখানা কালো পাথরের মূর্তি নৌকায় তুলে দিলেন সেই হোল কাল। আকাশ-নদী-পর্বত সব আড়াল ক'রে রইল।'

উর্মিলা বলল, 'কী সর্বনাশ! তাহ'লে এক কাজ করুন। মূর্তিটিকে অমন সঙ্গে নিয়ে ঘুরে না বেড়িয়ে একেবারে গৃহমন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে রাখুন। চার দেয়ালের আড়ালে ফুল বেলপাতা দিয়ে ওকে যদি একবার ঢেকে রাখতে পারেন বাইরের পৃথিবীটা তা হলে আর আড়ালে পড়বে না। এবার মূর্তি-

প্রতিষ্ঠার দিনক্ষণ দেখা যাক, কি বলুন? আমি মামাকে আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

কিন্তু বিয়ের তারিখের আগেই যে নীলাম্বরের চাকরি যাওয়ার তারিখ এসে পড়বে তা কে ভেবেছিল। কিন্তু তার চেয়েও অভাবিত নীলাম্বরের এই অসহায় বিমূঢ়তা, চাকরি তো অনেকেরই যায়। কিন্তু ওর যেন সব গেছে।

সপ্তাহখানেক বাদে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এক পরিচিত রেষ্টুরেন্টের নীল-পর্দা-ঢাকা ছোট্ট কেবিনে ফের এসে বসল দু'জনে।

চায়ে চুমুক দিয়ে মাধবী বলল, 'কি, কোন কিছুর খোঁজ খবর পেলে?'

নীলাম্বর মাথা নাড়ল, 'অত সহজেই কি পাওয়া যায়!'

মাধবী বলল, 'না হয় একটু কঠিনই হবে, অত ভাববার কি আছে?'

নীলাম্বর মৃদু হাসল, 'তা তো ঠিকই।'

মানে, ভরসা দেওয়াটা যত সহজ, ভরসা পাওয়াটা তত সহজ নয়।

মাধবী আরও একটু বস্তুবাদিনী হোল, 'আমি বাবা-দাদা, অন্য আত্মীয়-স্বজনকেও বলে রেখেছি।'

নীলাম্বর মাধবীর দিকে তাকাল, 'কি বলেছ?'

'বলেছি আমার একটি চাকরির অত্যন্ত দরকার।'

নীলাম্বর বলল, 'ও, দেখ, কথাটা কিন্তু এই ক'দিনেই বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। শৈলেন, সোমনাথ ওরা সব ঠাট্টা করছিল?'

মাধবী বলল, 'কিসের ঠাট্টা?'

'ওরা বলছিল, আজকাল তো প্রেমের জন্য ত্যাগস্বীকারের কোন সুযোগ নেই! নীলাম্বরের ভাগ্য ভালো, সেই সুযোগ পেয়েছে। প্রিয়ার পায়ে চাকরিটিকে উৎসর্গ করেছে।'

মাধবীর মুখ গম্ভীর হোল, 'কথাটা তোমার মুখে কিন্তু তেমন ঠাট্টার মত শোনাচ্ছে না।'

নীলাম্বর স্থির দৃষ্টিতে মাধবীর দিকে তাকাল, 'ঘরে যদি রুগ্ন বাপ-মা, ভাই-বোন তোমার সেই চাকরির ওপর নির্ভর ক'রে থাকত তাহলে ঠাট্টাটাকে তুমিও কতখানি হজম করতে পারতে আমার সন্দেহ আছে। তাছাড়া এখানে চাকরিটা তুচ্ছ। নিজের কর্তব্যে যে খানিকটা ত্রুটি হয়েছে একথা তো মিথ্যা নয়, শুকদেববাবু যে আমার বিরুদ্ধে এমন একটা অজুহাত খুঁজে পেলেন, সেখানেই আমার লেগেছে।'

নীলাম্বর একটু থেমে ফের বলতে লাগল, 'দেখ মাধবী, আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাজের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। একটি পরিবার একটি অফিস নিয়েই হয়ত গোটা দুনিয়া। কিন্তু এর মধ্যেও ন্যায়, অন্যায়, মহত্ব, ক্ষুদ্রত্ব, পৌরুষ, অপৌরুষ সব আছে। সেগুলি পরিমাপে ছোট, আকারে ছোট, কিন্তু প্রকারে এক। এখানেও দোষটা দোষই, তাকে কিছুতেই গুণ বলতে পারিনে। এমন কি নিজের দোষ হওয়া সত্ত্বেও না।'

মাধবী একটু হাসল, 'আত্মপীড়নে তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। দোষটা কি কেবল তোমার? শুকদেববাবুর কোন ত্রুটি হয়নি?'

নীলাম্বর বলল, 'কে বলল হয়নি। তাঁকেও এবার ভালো ক'রে চিনলুম। তোমাকে এতদিন বলিনি—'

কিন্তু মাধবীকে আজ সবই খুলে বলল নীলাম্বর। ওই কাগজ আর পাবলিকেশনের জন্য এই ছ'বছর ধ'রে সে কি না করেছে। অন্য জায়গায় ভালো সুযোগ-সুবিধা পেয়েও যায়নি। দিন নেই, রাত নেই সমানে খেটেছে। যা তার করবার কথা ছিল না, তাও স্বেচ্ছায় করেছে। ওর ডবল মাইনে দিয়েও কেউ তাকে অমন ক'রে খাটাতে পারত না। কাজ করত, কারণ কাজ ক'রে আনন্দ পেত নীলাম্বর। সে জানত খুব বড় লেখক হওয়া হয়ত তার সাধ্যে নেই, তেমন আশাও সে করে না। কিন্তু ওই ছোট পত্রিকাখানির মাধ্যমে অনেক বড়বড় লেখকের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হবে, অনেক নতুন লেখককে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেবে। তৈরী লেখকের চেয়ে লেখক তৈরীর দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল নীলাম্বরের। এই উপলক্ষে কত তরুণ সাহিত্য-যশঃপ্রার্থীদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে। যাদের লেখা নিতে পারেনি তাদেরও সস্নেহে আশ্বাস দিয়েছে। তাদের ওপরও যাতে অবিচার না হয়—

মাধবী একটু হাসল, 'বরং যাদের লেখা নিয়েছ তাদের ওপরই অবিচার বেশী করেছ তুমি।'

নীলাম্বরও হাসল, 'ও, সে কথা বুঝি তোমার এখনও মনে আছে। তোমার একটা প্রবন্ধকে অনেক এডিট ক'রে সেবার ছেপেছিলাম—তাই নিয়ে এক সপ্তাহ তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা বলনি, ছ'মাসের মধ্যে আর কোন লেখা দাওনি। কিন্তু এডিট করার পরে প্রবন্ধটি ভালোই হয়েছিল একথাও তুমি পরে স্বীকার করেছ। দেখ, কোন কোন লেখকের মন

এক একটা খনির মত। কলমের মুখে সেখান থেকে সবশুদ্ধ বেরিয়ে আসে। খাঁটি ধাতুর উজ্জ্বলতা বাড়াবার জন্য সেখানে সম্পাদকের কলমের দরকার হয়। অবশ্য কোন কোন লেখিকা বড় বেশী sensitive, তাঁদের লেখার ওপর কলম ছোঁয়াবার জো নেই।'

মাধবী, বলল, 'আহাহা, কলম ছোঁয়াতে যেন বাকি রেখেছ!'

নীলাম্বর বলল, 'কিন্তু প্রত্যেকবার তোমার মুখ দেখে মায়া হয়েছে। যেন কোন নিরীহ সম্পাদকের কলমের আঁচড় নয়, বুকে কোন হিংস্র জন্তুর নখের আঁচড় লেগেছে, মুখের ভাব দেখে তেমনি মনে হয়েছে আমার।'

চা খাবার ছলে মুখ নিচু করল মাধবী, একটু ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'কি যা তা বলছ। শুকদেববাবুর সঙ্গে তোমার অমন ঘনিষ্ঠতা কিসে নষ্ট হোল তাই শুনি। সে কি শুধু জব্বলপুরে কয়েকদিন বেশী কাটিয়ে এসেছিলে ব'লে?— এক সংখ্যা কাগজ বেরুতে দিন কয়েক দেরি হয়েছিল বলে—'

নীলাম্বর স্বীকার করল ঘনিষ্ঠতা শুধু সেই দিনই যায়নি, একদিনেই যায়নি। শুকদেব রায় শুধু একটা প্রেস আর কাগজের স্বত্বাধিকারী নয়, উচ্চশিক্ষিত, সুপণ্ডিত, সাহিত্যরসিক। গোড়ার দিকে নীলাম্বর তার সৌজন্যে, শিষ্টাচারে, সৌহৃদ্যে, রসবোধে মুগ্ধ হয়েছে। আর সেই মুগ্ধতার গল্প করেছে বন্ধুজনের কাছে। মাধবী মাঝেমাঝে ঠাট্টা করেছে, 'কি ব্যাপার, অফিসে তোমার হঠাৎ মাইনে বেড়ে গেল নাকি, সহর ভ'রে মনিবের এমন সুখ্যাতি ক'রে বেড়াচ্ছ।'

কিন্তু শুকদেববাবুর সঙ্গে প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক ছিল না নীলাম্বরের। মাইনের হ্রাসবৃদ্ধির প্রশ্ন ছিল একান্ত গৌণ। কাজের আগে-পরে, কাজের ফাঁকে-ফাঁকে দেশবিদেশের সাহিত্য-দর্শন-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে দু'জনের মধ্যে দিনের পর দিন কত আলোচনা চলেছে। রাত হয়েছে, রাত গভীর হয়েছে তবু সেই আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়নি। কোন কোন দিন শুকদেববাবু নীলাম্বরকে আর যেতে দেননি। নিজের ঘরে আটকে রেখে বলেছেন 'ভেব না, আমি তোমার বাসায় খবর পাঠাচ্ছি। আজ একসঙ্গে বসে এখানেই দু'টি ডালভাত খাওয়া যাক।'

অবশ্য আহার্যটা শুধু ডালভাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, মৎস্য মাংসেও পৌঁছেচে।

এমন চাকরিকে শুধু চাকরি বলা যায় না, এমন মনিব শুধু মনিব নয়, তিনি মনের মানুষও।

কিন্তু মন নিয়ে খুব বেশি দিন চলল না। কাগজের অবস্থা ক্রমেই অচল হ'তে লাগল। দেশে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধাবলীর পাঠক মিলল না। ব্যবসায় বাণিজ্যের বাজার মন্দা। পূর্ববঙ্গ এখন পূর্ব পাকিস্তান। শুকদেববাবুর কাগজের নিয়মিত গ্রাহকদের অনেকেরই ঠিকানা নেই। কাগজ গেল তো, টাকা এল না। বিজ্ঞাপনদাতারা বিমুখ হলেন। তাগিদ দিয়ে দিয়েও বাকী টাকা আদায় হোল না। ব্যাঙ্কের তহবিল ক্রমেই তলায় এসে ঠেকল। শুকদেববাবু পরমার্থ থেকে হঠাৎ অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। কিন্তু ততদিনে অনর্থ যা ঘটবার ঘটেছে।

নীলাম্বরকে ডেকে কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'এতদিন কি করেছ?'

নীলাম্বর জবাব দিল, 'আপনি যা করতে বলেছেন।'

শুকদেববাবু বললেন, 'মিথ্যা কথা। কাগজটা যাতে উঠে যায় তার ব্যবস্থা করতে তোমাকে নিশ্চয়ই বলিনি।'

'কাগজ কি আমার জন্যই উঠে যাচ্ছে?'

শুকদেববাবু বললেন, 'তোমার জন্যই নয়, কিন্তু তোমার জন্যও। সব দায়িত্ব তো আমি তোমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। এই ছ'মাসে ক'পাতা বিজ্ঞাপন এনেছ হিসাব দাও।'

নীলাম্বর জবাবে বলল, তার ওপর বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার যেমন ছিল, বিজ্ঞাপন আনার ভার তেমন ছিল না।

কথা কাটাকাটি চলতে লাগল, চলতে লাগল মন কষাকষির পালা। এই সময় এল মাধবীর জব্বলপুর যাত্রার প্রস্তাব। নীলাম্বর ভাবল দুটো দিন পালিয়ে বাঁচা যাক্।

কিন্তু বাঁচা গেল না। ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শুকদেববাবু বিষাক্ত ব্যঙ্গে হাসলেন, 'কি, প্রমোদভ্রমণ শেষ হোল? কিন্তু জব্বলপুরই তো একমাত্র জায়গা নয়। ভারতবর্ষে পুর আর পুরী অনেক রয়েছে। সবগুলি সেরে এলেই পারতে। তুমি তো বান্ধবী নিয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছ, এদিকে আমার যে সব লোকসান হয়ে গেল—'

নীলাম্বর বলল, 'কিন্তু আপনার তো আরো লোকজন ছিল, আপনি নিজে ছিলেন—'

শুকদেববাবু গর্জন ক'রে উঠলেন, 'আমি ছিলাম কি ছিলাম না, তা তোমার বলবার কথা নয়। কিন্তু তুমি এতদিন কি করছিলে? মাসে মাসে মাইনে গোণার বদলে বন্ধুবান্ধবের লেখা ছেপে তাদের সঙ্গে খাতির রাখা ছাড়া, আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর কোন্ কাজটা তুমি করেছ তার জবাব দাও।'

নীলাম্বর বলল, 'আমি আপনার এসব অন্যায় কথার, অভদ্র ব্যবহারের কোন জবাব দেব না।'

শুকদেববাবু বললেন, 'অন্যায় কথা! অভদ্র ব্যবহার! তোমার মত একজন সাধারণ কর্মচারীর মুখে একথাও শুনতে হবে আমাকে! বেশ জবাব না দিতে পার, রেজিগনেশন দাও।'

নীলাম্বর বলল, 'তাই দিচ্ছি।'

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ শেষ ক'রে নীলাম্বর মাধবীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, এবার তোমার মন একটু হাল্কা হবে বোধ হয়।'

মাধবী বলল, 'আমার মন হাল্কাই আছে। এখন তোমার মন হাল্কা হলেই বাঁচি। ভালো কথা, কাল একবার যেয়ো আমাদের ওখানে।'

'কেন?'

'দাদা একটা চাকরীর কথা বলছিলেন। সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে। রাইটার্স বিল্ডিংএ দাদার একজন বন্ধু আছেন। তাঁর সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দেবেন।'

নীলাম্বর বলল, 'তুমি বুঝি ওঁদের সব বলেছ। শেষ পর্যন্ত ভাবী শ্বশুর-কুলের সাহায্যে চাকরি জোগাড় করতে হবে—'

মাধবী বলল, 'তাতে ক্ষতি কি? কাল সকালেই এসো একবার।'

নীলাম্বর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল, 'সকালে। সকালে আমার অন্য এনগেজমেণ্ট আছে। দেখা যাক্ যদি সময় পাই তো—'

কিন্তু পরদিন দেখা গেল নীলাম্বর সময় পেয়েছে। শাঁখারীপাড়া লেনের হলদে রঙের বাড়িটার সাম্‌নে ঠিক গিয়ে হাজির হয়েছে নীলাম্বর।

মাধবী দোরের কাছেই ছিল। তাকে দেখে মৃদু হেসে বললে, 'এসো। ভাবলাম, তুমি বুঝি এলেই না।'

'না এসে কি করি! তুমি অত ক'রে ব'লে এলে—'

'হুঁ, সেইজন্যই বুঝি।'

নীলাম্বর বলল, 'সেই জন্য নয়। তুমি বলবে চাকরীর জন্য। কিন্তু চাকরিটা কার শুনি?'

মাধবী বলল, 'ওঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ শেষ ক'রে আমার ঘরে যেয়ো। তখন বলব।'

মাধবীর বাবা সুরেন সেন মশাইও চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তিনিও ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দা। তবে বছর পনের আগে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন ব'লে এখনো পঞ্চান্ন টাকায় সাতখানা ঘরশুদ্ধ পুরো একটা দোতলা বাড়ী ভোগ করতে পারছেন। আর ছেলে-মেয়ে-পুত্রবধূরা তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বেশ একটা আভিজাত্যের চেহারা দিতে পেরেছে। কিন্তু নীলাম্বর জানে এ বাড়ির ওপরের চাকচিক্য যত বেশি, ভিতরটা তত ভরাট নয়। কাষ্টমসএ শ'চারেক টাকার মাইনের চাকরি করেন সুরেন বাবু। কিন্তু পোষ্যের সংখ্যাও জন চৌদ্দ। মাধবীর আগে গুটিদুই মেয়ের বিয়ে দিতে হয়েছে। তার দেনা এখনো সব শোধ হয়নি।

নিরীহ, শান্ত, টাক মাথা, বেঁটেখাট, অমায়িক ভদ্রলোক, কারো অনিষ্ট করেন না। কিন্তু কারো ইষ্টসাধনের সাধ্যও তেমন নেই। বাজার সেরে এসে ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন সুরেনবাবু, নীলাম্বরকে দেখে বললেন 'এসো।' পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললেন তাকে। দু'একটা কুশল প্রশ্নের পরে বললেন, 'আমি মাধুর কাছে সব শুনেছি। ওসব প্রেস-ট্রেসে এত-দিন পড়ে থাকাই উচিত হয়নি, কিন্তু অন্য কোন চাকরী না পেয়ে হাতের চাকরী ছেড়ে দেওয়াটাও আজকালকার দিনে ঠিক বলা যায় না। কারণ চাকরিটা তো নিজের হাতে নয়, সম্পূর্ণ অন্যের হাতে। অন্যে দেবে তবে হবে। অবশ্য ভাববার কিছু নেই। লেখাপড়া শিখেছ, কিছু না কিছু একটা জুটে যাবেই। বন্ধুবান্ধব সবাইকে বলেও রেখেছি—'

সুরেনবাবু আবার কাগজে চোখ রাখলেন।

মাধবীর ওপর রাগ হতে লাগল নীলাম্বরের। হোক্ না বাবা, তবু এই নির্বিরোধ প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কাছে কেন সব বলতে গেছে মাধবী। ওঁকে ব'লে কি কিছু লাভ আছে। হিতোপদেশ ছাড়া আর তাকে তিনি কি দিতে পারেন।

একটু বাদে নীলাম্বর উঠে পড়ল, 'সুপ্রকাশ আসতে বলেছিল। ওর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাই।'

সুরেনবাবু যেন পরিত্রাণ পেলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর সঙ্গে দেখা কর। আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কি একটা চাকরির কথা ও সেদিন বলছিল বটে। নিজে চাকরি বাকরির দিকে যায়নি কিন্তু সব রকম খোঁজ ও রাখে।'

আত্মজের জন্য আত্মপ্রসাদে এতক্ষণে মুখ উজ্জ্বল দেখাল সুরেনবাবুর।

দোতলার সব চেয়ে বড় ঘরখানা বাড়ির বড় ছেলের। এরই মধ্যে গুটিদুই ছেলেমেয়ে হয়েছে সুপ্রকাশের। তারা মেঝেয় বসে খেলা করছে। স্ত্রীর ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছিল সুপ্রকাশ। আয়নায় নীলাম্বরের ছায়া পড়তেই ঘাড় ফিরয়ে তাকিয়ে স্মিতমুখে বলল, 'এসো, এসো। দেখা-সাক্ষাৎই নেই একেবারে, ব্যাপার কি?'

দু'চার মিনিট বাদে চাকরির কথা উঠল।

সুপ্রকাশ বন্ধুকে মৃদু গঞ্জনার সুরে বলল, 'তোমাকে তখনই বলেছিলাম ওসব পত্রিকা-টত্রিকায় সুবিধে হবে না হে। একটি ভাল কাজকর্ম দেখ। তা তুমি মনের মত কাজ, মনের মত মাইনে কত কথাই না বললে। যাক্, এতদিনে সুবুদ্ধি হয়েছে তবু ভাল। ভাগ্যে হাতের পাঁচ ল-টা পড়ে রেখে-ছিলাম। তোমাকে তখন অত ক'রে বললাম,, এসো একসঙ্গে পড়া যাক্। সবদিন তো আর যেতে হবে না। তোমার প্রকৃসি আমি দিয়ে দেব। তা তুমি কানেই তুললে না কথাটা।'

নীলাম্বর বলল, 'আজকাল নাকি হাইকোর্টেও বেরুচ্ছ। কি রকম হচ্ছে-টচ্ছে?'

সুপ্রকাশ বলল, 'বলতে গেলে হচ্ছে না কিছুই। কিন্তু চাকরি খুঁজতে হচ্ছে না—এই ঢের। হ্যাঁ, তোমার কথা আমি প্রশান্তকে সেদিন বললাম। সেই যে তোৎলা প্রশান্ত সিকদার, মনে নেই? সেক্রেটারিয়েটে বেশ চাকরি বাগিয়ে বসেছে। চালচলনে পুরোদস্তুর সাহেব। তাহ'লেও খুব সিম্প্যা-থেটিক, কথাবার্তায় তাইতো মনে হোল। তুমি ভাই ওর সঙ্গে একবার দেখা কর। কোথায় কি খালি টালি আছে ও হদিশ দিতে পারবে। ওরা ভিতরের লোক। আটঘাটের খবরও সব জানে। কোথায় কি আছে একটু জানতে পারলে সোর্স টোর্স বের করবার চেষ্টা করা যাবে।'

একটু বাদে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে সুপ্রকাশের স্ত্রী করবী এল ঘরে। খুব সুন্দরী নয়, কিন্তু স্মিতমুখী। নীলাম্বর অনুযোগ ক'রে বলল, 'আপনি তো আর আসেনই না এদিকে। আসবেন কি, যার জন্য এদিকে আসা, সেই যখন ওদিকে যায়—'

সুপ্রকাশ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'না হে সেদিন আর নেই।'

করবী বলল, 'উঁহু নেই। তুমি যেন কত খবর রাখো! নীলাম্বরবাবু বেকার হওয়ার পর মাধু ঠাকুরঝির যাতায়াত ছুটোছুটি আরো বেড়েছে। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না নীলাম্বরবাবু, গরজ যার বেশি সেই আপনাকে চাকরি জুটিয়ে দেবে।'

প্রশান্ত শিকদারের সঙ্গে দেখা ক'রেও বিশেষ কোন ফল হোল না। চাকরি খালি আছে বটে। কিন্তু সব পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাতে। ফরম ফিল আপ ক'রে দিয়ে যাক্ নীলাম্বর। কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ব্যাপার, তাতে যা হয় হবে। অবশ্য সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করবে না প্রশান্ত।

বিশ্বাস করা যায় প্রশান্ত তার কথা রেখেছে। চেষ্টার ত্রুটি করেনি। দু'-দুটো প্রতিযোগিতায় গিয়ে পরীক্ষা দিল নীলাম্বর। কিন্তু কোন সাড়া এল না। সরকারী-বেসরকারী সব রকম অফিসেই ঢুঁ মেরে দেখল, যে কোন রকমের শ' দেড়েক টাকার একটি চাকরী জুটলেই হয়। তার চেয়ে বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আপাতত নেই নীলাম্বরের। কিন্তু দু'মাস, তিন মাস গেল, সেই অনুচ্চ আকাঙ্ক্ষাটুকু পূরণেরও কোন রকম লক্ষণ দেখা গেল না। সব জায়গায় আশ্বাস আছে, প্রতিশ্রুতি আছে, কিন্তু তারপর আর কিছু নেই। এদিকে বাবার অসুখ বেড়ে যাচ্ছে। মার মেজাজ সব সময়েই বিগড়ে রয়েছে। পরিধেয় সকলেরই জীর্ণ হয়েছে কিন্তু নববস্ত্র গ্রহণ করা যাচ্ছে না। বেকারের পক্ষে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করা যত সহজ, জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করা তেমন নয়। গীতাকার আজকাল জন্মালে আত্মার অবিনশ্বরতা বুঝাবার জন্য তাঁকে অন্য উপমার আশ্রয় খুঁজতে হোত।

স্কুলের ছুটির পর মাধবী ফের এল একদিন খোঁজ নিতে। নীলাম্বর অনেকদিন ধরে একটা প্রবন্ধে হাত দিয়েছে। কিন্তু মুখবন্ধের পর লেখাটা আর এগুচ্ছে না। মাধবী এসে পাশে বসল। নীলাম্বর লেখাটা সরিয়ে রাখল।

মাধবী বলল, 'তবু ভালো, আজ তোমাকে লিখতে দেখছি। ইদানীং তো কাগজকলমের সঙ্গে সম্পর্ক একবারে তুলেই দিয়েছ। অত ক'রে বললাম লেখার অভ্যাসটা নিয়মিত রাখ। কিন্তু কিছুতেই শুনলে না। আমার কোন্ কথাটাই বা তুমি আজকাল শুনছ!'

নীলাম্বর মৃদু হাসল, 'তাই নাকি?'

মাধবী বলল, 'তা ছাড়া কি? কিন্তু আমার একটা কথা আজ তোমাকে রাখতেই হবে।'

'কি কথা।'

মাধবী কোন কথা না ব'লে ব্যাগ খুলে আটখানা দশ টাকার নোট নীলাম্বরের হাতে দিয়ে বলল, 'আজকেই মাইনেটা পেলাম।'

তার মাইনের টাকা নেওয়ার জন্য এর আগেও মাধবী বার কয়েক অনুরোধ করেছে, নীলাম্বর কান পাতেনি, প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ মাধবী একবারে টাকা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।

নীলাম্বর মাধবীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমাকে ত আগেই বলেছি। ও টাকা আমি নিতে পারব না মাধবী।'

'কেন, না নিতে পারবার কি হয়েছে? আমার টাকা কি তোমার টাকা নয়? যার কাছ থেকে সব নেওয়া যায় তার কাছ থেকে শুধু গোটা কয়েক টাকা নিতেই দোষ? বেশ তুমি না নাও, আমি মাসীমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি।'

নীলাম্বর বলল, 'তুমি দিতে পারবে?'

মাধবী বলল, 'নিশ্চয়ই পারব, তিনিও নিতে পারবেন। তিনি তোমার মত নয়। শুধু অনুষ্ঠানটুকু বাকি আছে ব'লে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পর বলে মনে করবেন না।'

নীলাম্বর একটু কাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আচ্ছা দাও।'

সুরবালা আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। এবার ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখে প্রসন্নতা ফুটে উঠেছে। কণ্ঠে মমতা। মাধবীকে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়ির সব ভালো আছে তো মাধবী, তোমার বাবা দাদা বউদি—'

মাধবী ঘাড় কাৎ ক'রে বলল, 'হ্যাঁ।'

নোটগুলি মেঝের ওপর পড়েছিল। হাওয়ায় একটু এলোমেলো হয়ে

ছড়িয়ে পড়ল। সুরবালা নিজেই নিচু হয়ে সেগুলি কুড়িয়ে আনলেন, 'তোমরা বড় অসাবধান বাপু। টাকা এমন ক'রে ফেলে রাখতে আছে? এ টাকা কার?'

নীলাম্বর কোন জবাব না দিয়ে মাধবীর দিকে তাকাল। মাধবী তাকাল সুরবালার দিকে, একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'ও টাকা আপনার। আপনি তুলে রাখুন।'

সুরবালা একটু বিস্ময়ের ভঙ্গি ক'রে বললেন, 'আমি তুলে রাখব!'

মাধবী বলল, 'হ্যাঁ আপনিই রাখবেন। আমার মাইনের টাকা আপনার ছেলে না নিতে পারেন, কিন্তু আপনার নেওয়ার তো কোন বাধা নেই।'

ব'লে মাধবী মুখ নিচু করল। আবেগার্দ্র শোনাল ওর গলা।

সুরবালা একটু কাল চুপ ক'রে থেকে সস্নেহে বললেন, 'তাতো নেইই মা। কোন বাধা নেই। বাইরের যেটুকু আচার-অনুষ্ঠান আছে সেটুকু সেরে ঘরের লক্ষ্মী তুমি এবার ঘরে চলে এলেই হয়। তাহ'লে কারোরই আর কোন সংকোচ থাকে না। হ্যাঁরে নীলু, এসব বিয়েতে পুরুত ডাকার আগে কোর্টে টোর্টে নাকি যেতে হয় শুনেছি, একদিন গিয়ে সব ঝামেলা মিটিয়ে আয়।'

নীলাম্বর হাসল, 'তুমি ওই আশিটাকা পেয়েই একেবারে জল হয়ে গেলে মা। কিন্তু ওই টাকাতেই কি সংসার চলবে? একটা চাকরি বাকরি জোটার আগে ওসব ঝামেলা মেটাতে গেলে সে ঝামেলা মিটবে না বরং বাড়বে।'

সুরবালা বললেন, 'কেবল চাকরি আর চাকরি; সংসারে চাকরি ছাড়া কি রোজগারের আর কোন পথ নেই? মাধবীর দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসলেন, 'দাও তো বাপু ওকে একটা চাকরি জুটিয়ে, দিনরাত এত হা-হুতাশ আমার আর সহ্য হয় না।'

সুরবালা চলে গেলে নীলাম্বর বলল, 'নাও, এবার আমার আর ভাবনা রইল না। চাকরির জন্য নিজের আর কোন চেষ্টাচরিত্র আমার না করলেও চলবে। চাকরি জোটাবার ভার তো তুমিই নিলে।'

মাধবী বলল, 'হ্যাঁ আমিই নিলাম, তোমার আর কিছু করতে হবে না। তুমি এই ফাঁকে সাহিত্য আর সমাজ সম্বন্ধে যে বইখানা লিখবে বলেছিলে সেখানা লিখে ফেল দেখি, ছুট্‌কো কাজে অনেক সময় গেছে, এবার বেশ একটা বড় জিনিষে হাত দাও।'

নীলাম্বর একটু হেসে বলল, 'হুঁ, তাই দেব।'

হাসির মানেটা মাধবী বুঝতে পেরে চুপ ক'রে রইল। গোটা পরিবার যখন প্রায় অনাহারের মুখে, নিশ্চিন্তে বসে বসে বই লিখবার মত মনের অবস্থাই তখন বটে!

মাধবী মনে মনে স্থির করল যেমন ক'রেই হোক্ নীলাম্বরের চাকরি সে জোগাড় ক'রে দেবেই। একটা চাকরির আশ্রয় না পেলে নীলাম্বর স্বস্তি পাবে না। কোন কিছু লেখানোও যাবে না ওকে দিয়ে। নীলাম্বর এতদিন তেমন ক'রে চেষ্টা করতে পারেনি ব'লেই কিছু জোটেনি। নইলে এত লোকের কাজ জুটছে, নীলাম্বরের জুটত না!

তারপর থেকে শুধু নিজের স্কুলের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় সময় নীলাম্বরের চাকরির চেষ্টায় মাধবী আত্মনিয়োগ করল। আপাতত দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নেই তার, দ্বিতীয় কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। নিজের পড়াশুনো, সাহিত্যচর্চা সব বন্ধ রইল। ছুটির দিনগুলি খোঁজখবর নিতে কাটে। কোথায় কোথায় কোন্ আত্মীয়কুটুম্ব বড় চাকুরে আছে, কোন্ বন্ধুর বন্ধু কোন্ অফিসের হর্তাকর্তা, কোন্ বান্ধবীর স্বামী কোন্ সরকারী বিভাগের ঘাটি আগলে রয়েছেন ভিতরে ভিতরে তার খোঁজখবর নিতে লাগল মাধবী। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সুরু করল। দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে যে দু'একজন অর্ধপরিচিত রয়েছেন, পূর্ণপরিচিত, পুরোন পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে পত্রালাপের সুযোগ খুঁজল। প্রথম আলাপেই তো আর চাকরির কথা পাড়া যায় না। স্থূল কাজের কথাকে নানা আলাপ-আলোচনায় ঢেকে রাখতে হয়। তারপর একটু ইঙ্গিত, একটু ইসারা। যদি সাড়া মেলে তা'হলে আর একপা এগিয়ে যাও, যদি না মিলল তো দু' এক পা ক'রে পিছিয়ে এসো, আর এসো না। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাধবীকে পিছিয়ে আসতে হোল। শুধু মাথা নাড়া, শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি। দেখলেই চেনা যায়। যখন চিনতে দেরি লাগে তখন অন্তরে ঘা লাগে আরও বেশি।

নীলাম্বর একদিন বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হোল? এ কি সুরু করেছ?

মাধবী মুখ তুলে তাকাল। কোন কথা বলল না। কিন্তু ওর চোখের বেদনার আভাস গোপন রইল না। এই তিরস্কার ওর প্রাপ্য নয়।

নীলাম্বর একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'মানে, আমার জন্যে কেন এত কষ্ট করছ, এত ছুটোছুটি করছ—'

মাধবী বলল, 'কেবল কি তোমার জন্যেই করছি ?'

নীলাম্বর মনে মনে হাসল। তা ঠিক। ঘর বাঁধবার গরজেই মাধবী আজ ঘরে থাকতে পারছে না, বার বার বেরুতে হচ্ছে। ওর জন্য ভারি সহানুভূতি বোধ করল নীলাম্বর। এবার আর দেরি করবে না। যত কম মাইনেরই হোক্ একটা মাষ্টারী কি কেরানীগিরি কিছু জুটলেই বিয়েটা এবার ক'রে ফেলবে নীলাম্বর। যেমন ক'রে হোক্ চলে যাবেই। মাধবীকে আর অপেক্ষায় রাখা চলে না।

কিন্তু আশ্চর্য তাও জুটল না। অনেকগুলি চাকরি হাতের কাছে এসে ফসকে গেল। কলকাতার বাইরের ডু'একটা কলেজ থেকে পরবর্তী সেসনের জন্য ভরসা মিলল, সমূহ আর কিছু মিলল না।

কাটল আরও মাস ছয়েক। ডুটো টিউশনির মধ্যে যেটা বেশি টাকার সেটা গেল। একটা সাপ্তাহিক কাগজে ফিচার লিখতে স্বরু করেছিল তার মেয়াদ ফুরোল। নতুন চুক্তিতে সম্পাদক আর রাজী হলেন না। বললেন, 'আরও একটু হাল্কা সরস লেখা চাই আমাদের, নইলে পাঠকরা নিচ্ছে না।'

সরস লেখা ! জীবনে রস কই যে কলমে রস আসবে।

মাধবীর অভিজ্ঞতাও একই রকম। অনেক মোহ ভেঙেছে, অনেক স্বপ্ন চুরমার হয়েছে। ব্যর্থতার বোঝা ভারি হচ্ছে দিনের পর দিন। অনেক স্বজন-বন্ধুর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে চোখের সাম্নে। আশা-ভরসা যখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, দেখা হোল নীলিমা দাশগুপ্তর সঙ্গে। স্কুলের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন উপলক্ষে পাড়ার বিশিষ্ট নাগরিক-নাগরিকাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। তার সভাপতি সুবিনয় দাশগুপ্ত, ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর কলকাতার অফিস ম্যানেজার। সম্প্রতি দিল্লী থেকে বদলী হয়ে এসেছেন। আর তাঁরই স্ত্রী নীলিমা। সম্পর্কে মাধবীর মামাত বোন। আত্মীয়তার দিক থেকে একটু দূরত্ব থাকলেও বন্ধুত্ব পরস্পরকে দূরে থাকতে দেয়নি।

অনুষ্ঠানের শেষে নীলিমা মাধবীকে তার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'ঈস্, কতকাল পরে দেখা ! আয় একদিন আমাদের বাড়িতে।

তারপর বিয়ে থা করিসনি যে! কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আমরা বুড়ো হয়ে গেলাম, আর তুই এখনো আইবুড়ো! ব্যাপারটা কি?'

মাধবী একটু হাসল, 'এসব কথা এক নিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করা যায়, কিন্তু এক নিঃশ্বাসে জবাব দেওয়া যায় না।'

'বেশ, এক নিঃশ্বাসে না দিস্ ধীরেসুস্থে রয়েসয়েই দিবি। পরশুই তাহ'লে আয়। একসঙ্গে চা খাব আর জবাব শুনব।'

বলি বলি করেও প্রথম দিনই কথাটা ঠিক বলতে পারল না মাধবী। দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতেও আসল বক্তব্যটা অনুক্ত রইল। তৃতীয় দিনে মাধবী আর দেরী করল না।

'আছে না কি কোন খোঁজখবর?'

নীলিমা বলল, 'তোর নিজের জন্য? নিজে করবি চাকরি?'

মাধবী একটু হাসল, 'নিজের জন্যই, তবে নিজে করব না।'

নীলিমা হেসে বলল, 'বুঝেছি. তা এতক্ষণ চেপে রাখছিলি কেন? আচ্ছা, আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করছি। ওঁদের অফিসে একজন পাবলিসিটি অফিসার নেবে ব'লে শুনেছিলাম। এ্যালাউনস ট্যালাউনস শুদ্ধু বোধ হয় শ' সাড়ে তিনেক এখন দেবে! ওঁর হাতেই সব ভার। ওঁকে তাহ'লে বলি, কি বলিস্?'

মাধবী বলল, 'যদি ক'রে দিতে পারিস্ খুবই উপকার হয়।'

'থাক্ থাক্, তোকে আর অত ফর্মাল হতে হবে না।'

কিন্তু পরদিন নীলিমা উল্টো সুর ধরল। 'তুই এতদিন চেপে রেখেছিলি কেন। প্রথম দিনই যদি বলতিস্! ওঁর কোন এক মাষ্টার মশাই-এর ছেলেকে নাকি উনি প্রায় কথা দিয়ে ফেলেছেন। সেও ভারি গরীব। বহুদিন বেকার আছে। একটা চাকরি বাকরির তারও নাকি খুব দরকার।'

দরকার! মাধবীর চেয়ে কারও দরকার বেশি নয়। ওর চোখের সামনে নীলাম্বরের দুঃস্থ অবস্থার ছবি ভেসে উঠল। এতদিন তবু টিউশানি ছিল, ফিচার লেখা ছিল, এখন আর কিছু নেই। মাধবীর মাইনের সামান্য কটা টাকায় সংসারের আর ক'দিন চলবে। ঘর-ভাড়াই তো মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে গুনতে হচ্ছে। বুড়ো বাপ-মা, ভাই-বোন নিয়ে এবার হয়ত সত্যই উপোস করতে হবে নীলাম্বরকে। সেই নিষ্ঠুর সম্ভাবনার কাছে মাধবীর নিজের মান-সম্মান তুচ্ছ।

নীলিমার হাতখানা চেপে ধরল মাধবী, 'কিছুই কি করা যায় না ভাই? সুবিনয়বাবু কি তাঁকে একেবারে পাকা কথা দিয়েছেন?'

মাধবীর মুখের দিকে নীলিমা একটুকাল তাকিয়ে কি দেখল, তারপর বলল, 'চাকরি বাকরির ব্যাপারে কোন কথাই পাকা কথা নয়। আমি তোর জন্য চেষ্টার ত্রুটি করব না মাধু। কাল একবার আয়। দেখি কত দূর কি করতে পারি।'

পরদিন ফের গেল মাধবী, গিয়েই জিজ্ঞেস করল 'কি খবর?'

নীলিমা হেসে বলল, 'আসবার সঙ্গে সঙ্গেই খবরটি চাই। সবুর সইছে না বুঝি। খবর ভালো। তবে রাজী করাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। উনি নানারকম অসুবিধের কথা তুলেছিলেন। আমি জবাব দিয়েছি, আমার বন্ধুর বিয়ে আটকে রয়েছে—এর চেয়ে কোন অসুবিধেই তোমার কাছে বড় হতে পারে না। একটা এ্যাপলিকেশন কালই ছেড়ে দিন। বাকী যা করবার উনি করবেন। কিন্তু যার জন্য এত খেটে মরলাম, তাকে একবার দেখতেও দিলিনে! কবে নিয়ে আসবি বল?'

মাধবী বলল, 'আচ্ছা, আনব একদিন।'

মাধবীকে সদর পর্য্যন্ত নীলিমা এগিয়ে দিতে এসেছে এমন সময় রোগা-মত চব্বিশ-পঁচিশ বছরের শ্যামবর্ণ সাধারণ দর্শন একটি যুবক সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, 'মিঃ দাশগুপ্ত আছেন?'

নীলিমা বলল, 'না, তিনি এখনো ফেরেনি।'

'ও, আচ্ছা। আমি কি তার জন্য অপেক্ষা করব?'

নীলিমা মাথা নাড়ল, 'না, তাঁর ফিরতে অনেক দেরি হবে।'

'তাহলে কি অফিসে—। কিন্তু সেখানেও তো তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয় না।'

নীলিমা বলল, 'তিনি বলেছেন, দেখা করবার আর দরকার নেই। আপনি ঠিক সময়মত খবর পাবেন।'

'ও, আপনাকে বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না।'

নীলিমা সৌজন্য দেখিয়ে হাসল, 'না না, মনে করবার কি আছে! আচ্ছা, নমস্কার।'

প্রতিনমস্কার ক'রে সে চলে আসতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মাধবীর দিকে চোখ পড়ায় থম্‌কে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি!'

মাধবী তার অনেক আগেই লক্ষ্য করেছে, চিনেছে, বিস্ময়কে প্রশমিত করেছে। এবার নিস্পৃহ নিরুত্তেজ স্বরে বলল. 'তুমিও যে এখানে!'

নীলিমা বলল, 'অসিতবাবুকে তুই চিনিস্ নাকি? ওর কথাই তো তোকে বলছিলাম সেদিন।'

মাধবী বলল, 'চিনব না কেন। বছর চারেক আমরা একসঙ্গে পড়েছি।'

নীলিমা এবার মৃদু একটু হাসল, 'তাই বল।'

অসিত বলল, 'তুমিও তো বেরুচ্ছিলে। চল একসঙ্গেই যাই, কতদিন বাদে দেখা হোল।'

মাধবী একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল, 'চল।'

দিন তিনেক বাদে নীলাম্বর অফিস ফেরৎ মাধবীদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করল। মাধবী চুপচাপ নিজের ঘরে বসেছিল।

নীলাম্বর বলল, 'ব্যাপার কি, তুমি আর গেলে না যে?'

মাধবী একটু ম্লান হাসল, 'গেলাম না ব'লেই তো তুমি এলে। জয়েন করেছ?'

নীলাম্বর বলল, 'হ্যাঁ, আজই করলাম। মিঃ দাশগুপ্তের সঙ্গে আজ আরো আলাপ হোল। চমৎকার অমায়িক ভদ্রলোক। তোমার পছন্দ করা মনিব কি আর খারাপ হতে পারে? তাতো হোল। কিন্তু এদিকে মার জন্য যে বাড়িতে টিকবার জো নেই।'

মাধবী বলল, 'কি রকম?'

'তিনি বলেছেন শুভ কাজটি এমাসেই সেরে ফেলতে।' এরপর ভাদ্র মাস আমার জন্মমাস আর আশ্বিন-কার্তিক দু'মাস পুরুতরা বিয়ের মন্ত্র পড়বে না। আমি অবশ্য বলেছি ম্যারেজ রেজিস্ট্রার সব মাসেই মন্ত্র পড়তে রাজী। কিন্তু মা তাতে রাজী নন। তাঁর ইচ্ছা এমাসেই—'

নীলাম্বর মাধবীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

কিন্তু আশ্চর্য, অতি প্রত্যাশিত হাসি ফুটল না মাধবীর মুখে।

নীলাম্বর আহত হয়ে বলল, 'কি হয়েছে মাধু, তোমার কি শরীর খারাপ করেছে?'

'না, শরীর ভালই আছে।'

'কিন্তু মন ভালো না থাকার কারণটা কি?'

গলার স্বরে নীলাম্বরের অসহিষ্ণুতা ধরা পড়ল।

মাধবী নীলাম্বরের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'এই খানিকক্ষণ আগে অসিত এসেছিল।'

'অসিত কে?'

'অসিত দত্ত। আমাদের সঙ্গে পড়ত।'

নীলাম্বর বলল, 'তাই নাকি? তা হঠাৎ পুরোন সহপাঠিনীকে তার মনে পড়ে গেল যে?'

মাধবী বলল, 'সহজে মনে পড়েনি। প্রাণের দায়ে মনে পড়েছে।'

নীলাম্বর চেয়ারটি মাধবীর আরও একটু কাছে টেনে নিয়ে এসে বলল, 'প্রাণ, মন—খুব সাংঘাতিক সাংঘাতিক কথা বলছ যে! এতদিন তোমার মুখে ওসব কথা ছিল না, ব্যাপারটা দয়া ক'রে খুলে বলতো বড় ভালো হয়।'

খুলেই বলল মাধবী, পোষ্টগ্র্যাজুয়েটে অনেক সহপাঠির মধ্যে অসিত দত্তও একজন ছিল। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল বিশেষ একজন হবে। সেই আশা নিয়েই সে মাধবীর সঙ্গে মিশত। কিন্তু মাধবী তাকে কোনদিনই আমল দেয়নি। চিরদিন ঠাট্টা-তামাসাই করেছে। সেই অসিতের সঙ্গে বহুকাল বাদে দেখা হোল মিঃ দাশগুপ্তের বাড়িতে। অসিতও চাকুরিপ্রার্থী। সেও তদ্বিরের জন্য এসেছে। দু'একটা কথায় মাধবী তা বুঝতে পারল। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্যটা সে অসিতকে ধরতে দিল না। বলল, নীলিমা তার ছেলেবেলার বন্ধু। তার সঙ্গে এমনিই দেখা-সাক্ষাৎ করতে এসেছে।

অসিত উল্লসিত হ'য়ে বলল, 'ভালোই তো, তাহ'লে আমি সব চেয়ে ভালো সোর্স পেলাম। মিসেস দাশগুপ্ত নিশ্চয়ই তোমার কথা ফেলতে পারবেন না, আর মিঃ দাশগুপ্তও নিশ্চয়ই স্ত্রীর অনুরোধ রাখবেন। এর চেয়ে ভালো সোর্স আর হয় না। তুমি আমার এই উপকারটুকু কর মাধবী। একটা চাকরির বড়ই দরকার। দাদা টি. বি. হাসপাতালে। একপাল ছেলে মেয়ে নিয়ে বউদি আমার ঘাড়ে পড়েছেন। কিছুতেই আর কুলিয়ে উঠতে পারছি না। মাস ছয়েক ধরে ঠায় বেকার। তুমি যদি একটু ভালো ক'রে চেষ্টা করে—'

মাধবী না ব'লে পারল না, 'চেষ্টা করব।'

অসিত ব'লে চলল, 'আগে তো বেশ খানিকটা ভরসা পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন যেন আবার কেমন কেমন মনে হচ্ছে। তুমি যদি একটু ভেতর থেকে—'

মাধবী ঘাড় নাড়ল।

খুবই আশা-ভরসা নিয়ে বাড়ি ফিরল অসিত। মনের ভাবটা—এই মাধবী হৃদয় দিতে না পেরেছ না পারুক কিন্তু একজন দুঃস্থ প্রাক্তন সহপাঠিকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে নিশ্চয়ই পারবে।

'কিন্তু তাও কি পারলাম?'

মাধবী চুপ ক'রে রইল।

একটু বাদে নীলাম্বর বলল, 'তাহলে মাকে কি বলব?'

মাধবী মৃদুস্বরে বলল, 'থাকুন আরো ক'টা দিন।'

নীলাম্বর বলল, 'তোমাকে বললাম না, এ মাসে বিয়ে না করলে আরো দু-তিন মাস অপেক্ষা করবো।

মাধবী বলল, 'ততদিনে অসিতের একটা চাকরি বাকরি ঠিক হয়ে যাবে, কি বল?'

'তা হয়ত হবে।' কিন্তু নীলাম্বরের এই প্রথম মনে হ'ল চাকরিটা তার না হওয়াই ভালো ছিল।

সহযাত্রিণী

বাসটায় দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। অফিসের সময়। যতগুলি লোক ধরে, তার চেয়ে তিনগুণ লোক তুলেছে কণ্ডাক্টর। অবশ্য তারই যে কেবল দোষ তা নয়; যাত্রীদেরও গরজ ভারী। তারাও কেউ দেরী করতে চায় না, পরের বাসে আসতে চায় না। বাসটি একটু থামলেই পড়ি কি মরি ক'রে লাফিয়ে উঠে। ফুটবোর্ড থেকে কনুই দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে কোন রকমে ভিতরে গিয়ে দাঁড়ায়। কারো পা জুতোর তলায় পড়ে, কারো মাথার গুতো লাগে। সহযাত্রীদের কণ্ঠ থেকে নানারকম আপত্তিকর প্রতিবাদ কানে আসে কিন্তু সেগুলি কানে তুললে চলে না। দু'কান বুজে দু'চোখ বুজে লোককে এগিয়ে চলতে হয়। মনে রাখতে হয় আমিই একমেবাদ্বিতীয়ম্, আমিই শুধু একমাত্র পারমার্থিক সত্য, অন্য যাত্রীদের কোন অস্তিত্ব বা মূল্য নেই।

গাড়ীতে ওঠবার সময় যারা ঠেলাঠেলি ক'রে ওঠে, ভিতরের যাত্রীদের আপত্তি কানে তোলে না, তারাই আবার ভিতরে গিয়ে দল বদল করে। নতুন যাত্রীদের প্রাণপণে বাধা দেয়। জোড়ামন্দির থেকে স্থরু ক'রে প্রত্যেক ষ্টপেজেই এই কাণ্ড হচ্ছিল। বেলেঘাটা ব্রীজের আগের ষ্টপেজে সজ্ঘর্ষটা আরো তীব্র হয়ে উঠল।

ফুটবোর্ড থেকে বাসের ভিতরটা সব মাথায় ভর্তি। তবু অপূর্ব কৌশলে সতীশ সামন্ত তার ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল। তার সঙ্গে আরো যারা উঠতে চেয়েছিল তারা বাধা পেল, যারা আগের ষ্টপেজগুলিতে উঠে রয়েছে তারা বাধা দিতে লাগল, তবু সতীশের ভ্রূক্ষেপ নেই। সে কোন রকমে হ্যাণ্ডেল ধরে বাসের ফুটবোর্ডে ঝুলে রইল। তারপর মাথা নীচু ক'রে দু'তিনজন সহযাত্রীর বগলের তলা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

চশমাপরা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'আপনি যাচ্ছেন কোথায় মশাই! দাঁড়াবার কি আর জায়গা আছে যে অমন ঠেলাঠেলি করছেন?''

সতীশ বলল, 'এক জায়গায় দাঁড়াতে তো হবে।' পথ কেটে সতীশ আরো ভিতরে যেতে লাগল। মোটা ফস মতো আর একটি সহযাত্রীও তাকে ধমকে উঠলেন, 'ঈস্, দিলেন তো মশাই পা-টা মাড়িয়ে; অত ঠেলছেন কেন? কেন এত অস্থির হচ্ছেন; যেখানে আছেন সেইখানেই থাকুন না! সতীশ বলল, সেখানে থাকতে পারলে কি আর এগুতে চাইছি। দেখছেন না চারদিক থেকে কিভাবে ঠেলছে লোকে?'

তৃতীয় অল্পবয়সী ছোক্‌রা যাত্রীটি বলল, 'আপনাকে কেউ ঠেলছে না মশাই, আপনি নিজেই শুধু ঠেলাঠেলি করছেন। এদিকে আর যাবেন কোথায় বলুন না। বসবার কোথাও আর জায়গা নেই। দেখছেন না মেয়েরা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন!'

সতীশ বলল, 'আমিও একটু দাঁড়িয়ে যেতেই চাই।' এক পা দু'পা ক'রে সে আরো সাম্‌নের দিকে এগিয়ে চলল, তারপর হঠাৎ সরে গেল বাঁ দিকে।

লম্বা বেঞ্চটায় জনপাঁচেক মেয়ে ঠাসাঠাসি ক'রে বসে আছে। তাদের সাম্‌নে আর একটি মেয়ে অতি কষ্টে মাথার ওপরকার রডটা কোন রকমে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাসের ঝাঁকুনিতে অতিকষ্টে তার মাথা রক্ষা করছে। আর মাঝে মাঝে লুব্ধ চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে, কোন মহিলাযাত্রী আসন থেকে কখন নেমে যাবে কি কোন পুরুষ যাত্রী সৌজন্য দেখিয়ে উঠে দাঁড়াবে এই বোধ হয় তার আশা। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বাসের সবগুলি লেডীজ সীটই ভর্তি। জনকয়েক অফিস-যাত্রিনী ছাড়াও ছেলেপুলে নিয়ে ঘোমটা টানা আরও একদল বউ মেয়েদের বেঞ্চগুলি দখল ক'রে বসে আছে। ভাব দেখে মনে হয় দল বেঁধে কালীঘাটে যাচ্ছে, অন্য কোন ঘাটেও হতে পারে। আর পুরুষ যাত্রীদেরও সৌজন্য দেখাবার কোন গরজ নেই, তারাও কেউ সীট ছেড়ে দিচ্ছে না; বরং চারপাশ থেকে একেবারে যেন গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। এ সব ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় হারবার পাত্র নয় সতীশ সামন্ত। সে আস্তে আস্তে এগুতেই লাগল। কৌশলে সকলকে ঠেলে, সবাইকে পিছনে রেখে, দু'পাশে রেখে সাম্‌নে রাখল শুধু মেয়েটিকে। তিল তিল ক'রে পা টিপে টিপে আরও এগিয়ে গেল। এবার ওর পিঠের ঘামে ভেজা ব্লাউজ সতীশের বুকে এসে লাগছে, সুন্দর ক'রে বাঁধা খোঁপাটা লাগছে কখনো গালে, কখনো ঠোঁটে; একটি সুগন্ধি তেলের সৌরভ

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে তুলছে। সতীশ আরও এক পা এগোল। এবার আর দু'জনের মধ্যে কোন ফাঁক নেই। লক্ষ যোজন ব্যবধান, লক্ষ যুগের ব্যবধান পার হয়ে এসেছে সতীশ। এখন আর শুধু ব্লাউজের স্পর্শ নয়, মেয়েটির পিঠ এবার তার বুকের সঙ্গে লেগে গেছে। এতক্ষণে সত্যিই সতীশ তার নাম-না-জানা, মুখ-না-দেখা প্রিয়তমাকে বুকের ওপর রেখেছে—বুকে ক'রে দাঁড়িয়েছে।

দু'এক মিনিট বাদে মেয়েটি একটু যেন উসখুস করতে লাগল। প্রথম প্রথম কেউ কেউ অমন ছটফট করে। তারপর স্থির হয়ে বুকের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ গোড়া থেকেই সতীশের বুকটিকে আরাম কেদারার পিঠ হিসেবে ব্যবহার করে। কেউ কেউ মুখেতে, একটু লজ্জায় একটু বিরক্তির ভাব দেখায় তারপর দিব্যি গা ছেড়ে দেয়। সতীশ বুঝতে পারল এই মেয়েটি দ্বিতীয় শ্রেণীর, তাই যতবার সে ডাইনে-বাঁয়ে একটু সরে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, ততবারই সতীশ ঠিক তার পিছনে সরে এল। বোকা মেয়ে বুঝুক সতীশের বুক ছাড়া বাসের মধ্যে তার আর কোন স্থান নেই। ওই সুগন্ধি বড় খোঁপা, চাঁপাফুল রঙের সাড়ী, সরুহার-শোভিত সুন্দর গ্রীবা, সুগঠিত কাঁধ আব বাহু-মূলে যে তার হৃদয় কেড়ে নিয়েছে, সে কি এই মিনিট কয়েকের জন্যে নিরুদ্বেগে অসঙ্কোচে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারে না? এত কৃপণতা কেন সুন্দরীর? কতটুকুই বা পথ। শিয়ালদায় এসেই তো ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। না—মেয়েটি যদি না নামে শিয়ালদায় আজ সতীশও নামবে না। এই বক্ষলগ্না যতদূর যায় সেও ততদূরই যাবে। পৃথিবীর সীমান্ত পর্যন্ত এই সীমন্তিনীর সহযাত্রী হবে সে। এর মধ্যে যদি মেয়েটি বসবার সীট পেয়ে যায় সতীশ তার সীটের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে, পিছন থেকে ছোঁবে সেই আসন। তারপর মেয়েটি যেখানে গিয়ে নামে সতীশও সেখানেই নামবে। নামবে কিন্তু থামবে না। অফিসে গেলে পিছন পিছন গিয়ে সেই পুণ্যময় অফিসটি চিনে আসবে, কোন্ বাড়িতে গেল দেখে আসবে, ছুঁয়ে আসবে সেই স্বর্গধাম। এই বক্ষলগ্নাকে সতীশ বিচ্ছিন্ন হতে দেবে না। যতক্ষণ পারে—যতবার পারে বুকের ওপরই রেখে দেবে।

মেয়েটি একবার মুখ ফিরাল। মুখখানাও সুন্দর। রঙটি গৌর। ডৌলটি কোমল। নাকটি টানা। কালো ভ্রূর নীচে বড় বড় দুটি চোখ। মণি দুটি

গভীর কালো। কোথাও কোন খুঁত নেই। শুধু চিবুকের ওপর বড় কালো একটি জটুল। কিন্তু ওটুকু কলঙ্ক চাঁদের সৌন্দর্যই বাড়িয়েছে। মনে মনে তারিফ করল সতীশ। আজ তার ভাগ্য ভালো। যার মুখ আর চোখ, বুক আর পিঠ দুইই সুন্দর তেমন রূপবতীর দেখা, তেমন রূপবতীর ছোঁয়া ট্রামে-বাসে কদাচিৎ মেলে। তা ছাড়া মেয়েটি কুমারী। ওর সিঁথি সাদা। তাও নিমেষের মধ্যেই দেখে নিয়েছে সতীশ। যদিও তার স্পর্শলোভ কোন বাছবিচার কিছু করে না তবু কুমারী মেয়েদেরই সে বেশী পছন্দ করে। কারণ এই তিরিশ বছর বয়সেও সতীশ অবিবাহিত।

সেকেণ্ডখানেক কেটেছে কি কাটেনি, হঠাৎ মেয়েটি দ্বিতীয়বার মুখ ফিরাল, তারপর লাল টকটকে মুখে বলল, 'বর্বর, ব্রুট, অভদ্র!'

সঙ্গে সঙ্গে বাসভরা যাত্রীর দল হৈ হৈ ক'রে উঠল, 'কি ব্যাপার হয়েছে, কি, করেছে কি?' মেয়েটি তেমনি আরক্তমুখে বলল, 'করেছে কি, ওই ইতরটাকে জিজ্ঞেস করুন। ছি ছি ছি, এদের জ্বালায় ট্রামে-বাসে চলাই মুসকিল হয়ে উঠেছে আজকাল।'

মেয়েটি তার সব বক্তব্য শেষ করতে পারল না—সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন লোক সতীশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'ব্রুট, বদমায়েস কোথাকার। এইজন্যেই তোমার এত ভিতরে আসার গরজ।'

'এইজন্যেই তুমি দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছিলে না! ছটফট ক'রে মরছিলে। জায়গা তোমাকে এক্ষুনি পাওয়াচ্ছি রাস্কেল।'

সঙ্গে সঙ্গে দমাদ্দম কিল চড় ঘুষি। ড্রাইভার বাস থামিয়ে দিল। কণ্ডাক্টর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। মিনিট তিন-চার খুব সোরগোল চলল। সতীশের আপত্তি, তার মিথ্যে অজুহাত ডুবে গেল সেই গোলমালে। গায়ের লংক্লথের পাঞ্জাবিটা শতছিন্ন হোল, কপালের বাঁ পাশে যে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন আছে তার পাশটা একটা সুপুরির মত ফুলে উঠল। দাঁতের গোড়া আর নাকের গোড়া দিয়ে রক্ত ছুটল দর দর ক'রে।

সতীশ শেষবারের মত কি যেন বলতে গেল, বলতে পারল না। তখনো বাস ভরে সোরগোল চলছে। বাসটা শিয়ালদায় এসে পৌঁছবার অনেক আগেই সহযাত্রীরা সতীশকে ঘাড় ধরে ঠেলে নামিয়ে দিলে।

এ ঘটনা কিন্তু আজকের নয়। আজ থেকে পাঁচ বছর আগের ঘটনা। এই পাঁচ বছরের মধ্যে এমন ছোটখাট অনেক কীর্ত্তি-কাহিনীর নায়ক হয়েছে সতীশ সামন্ত। বাস-ট্রামে, মেলা কি মিছিলের ভিড়ে বহু-বার বহু মেয়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, মার না খেলেও ধমক খেয়েছে, তবু সাম্‌নে গিয়ে তাকিয়ে দেখেছে বাসের সেই মেয়েটি কিনা, যার ঠোঁটের ওপর তিল আর থুতনীতে জটুল, যার মুখখানা কোমল কিন্তু হৃদয়খানা কঠিন। তাকে জীবনে আর একটি দিনের জন্য—আর একটি বারের জন্যে চাই সতীশ সামন্তের। সাধ মিটিয়ে শোধ নিতে হবে। সে যত বড় লোকই হোক, যত উঁচু ডালের আঙুর-আপেলই হোক, একবার চোখে পড়লে সতীশ তার গায়ে অন্ততঃ একটি ঢিল ছুঁড়বেও ছুঁড়বে; একবার চোখে পড়লে কিছুতেই সে আর সতীশের দৃষ্টিপথ থেকে এড়িয়ে যেতে পারবে না, তার চলার পথে সতীশ চির-জীবনের জন্যে কাঁটা দিয়ে রাখবে—কাঁটা হয়ে থাকবে। আজ পর্যন্ত বিনা প্রতিশোধে বিনা প্রতিহিংসায় কেউ সতীশের হাত থেকে ছাড়া পায়নি। সেই জটুলবতীও পাবে না। শুধু একবার দেখা পেলে সতীশ দূর থেকে তার পিছনে পিছনে গিয়ে বাড়িঘর চিনে আসবে, আত্মীয়স্বজন চিনে আসবে—তারপর কি ক'রে প্রতিশোধ নিতে হবে সেকথা সতীশকে কারো আর ব'লে দিতে হবে না। মানুষের—বিশেষ করে মেয়েদের অনিষ্ট করবার অদ্ভুত উদ্ভাবনী প্রতিভা আছে সতীশের। অনেক বন্ধু, অনেক সাকরেদ তার কাছ থেকে বুদ্ধি নেয়।

কিন্তু বড়ই আফসোসের কথা সেই মেয়েটিকে এই পাঁচ বছর ধরে সতীশ আর কোথাও দেখতে পেল না। সহরের বাসে, ট্রামে, মেলায়, মিছিলে, পথে-ঘাটে, স্কুল-কলেজে, অফিসের সাম্‌নে, সিনেমা-থিয়েটারের সম্মুখে কতদিন, কত রাত্রে কত মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সতীশ, কিন্তু সেই মেয়েটির মুখ আর দেখতে পায়নি। দেখতে পায়নি ব'লে যে সতীশ হাল ছেড়ে দিয়েছে তা নয়। যত মেয়ে তার হাতের মুঠোয় এসেছে, যত কিশোরী-তরুণীকে সে নির্যাতন করার সুযোগ পেয়েছে তার জায়গায় সেই জটুলমুখী মেয়েটিকে কল্পনা করেছে মনে মনে। তার মুখে আলগোছে আদরের চুম্বন দিয়েছে, আবার নিষ্ঠুর হিংস্রতায় দাঁতে-নখে তাকে ক্ষতবিক্ষতও করেছে। প্রত্যেক মেয়ের ভিতর দিয়ে সব ক্ষতি সব ক্ষত সেই একটি মেয়েতে গিয়ে পৌছাক। তার হাতে যত মেয়ে যত শাস্তি ভোগ করেছে সব চৌগুণ হয়ে সেই মেয়েটির মধ্যে যাক্। সেই

মেয়েটি যেন জীবনে কখনো সুখ-শান্তির মুখ না দেখে। যদি তার বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে সে যেন অল্পদিনের মধ্যে বিধবা হয়। যদি ছেলে-মেয়ে হয়ে থাকে তার সামনে যেন সবগুলি একসঙ্গে দাপিয়ে মরে যায়। সতীশ যাকে ভোগ করতে পারল না সহরের জঘন্য অলি-গলিতে রাস্তার অগণ্য কামুক পুরুষ তাকে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়—যেন দুই হাতে এবং দুই পায়ে দলে যায়।

কিন্তু কাল্পনিক শাস্তি এক কথা, আর নিজের হাতে অন্যের শরীরকে নিপীড়ন আর এক কথা। জটুলমুখী মেয়েটির বেলায় সেই সুখানুভূতির স্বাদ সতীশ এই পাঁচ বছরের মধ্যে আর পায়নি। অবশ্য পুরো পাঁচ বছরই যে সতীশ তাকে খুজে বেড়াতে পেরেছে তা নয়। এর মধ্যে তাকে বছর আড়াই জেল খাটতে হয়েছে। একবার পূজোর ভিড়ে সিমলায় প্রায় সেই জটুলমুখীর মতই দেখতে, প্রায় তারই সমবয়সী একটি তরুণী মেয়ের গলা থেকে হার কেটে নিতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, তাতে হয় ছ'মাস; আর একবার এক ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসে যোগসাজসের অভিযোগে ধরা পড়ে, তাতে হয় বছর দুয়েক। এই আড়াই বছর সে জটুলমুখীকে খুঁজতে পায়নি। কিন্তু জেলের দেয়ালে কখনো কয়লা, কখনো চকখড়ি দিয়ে তার ছবি এঁকে তার ওপর অত্যাচার করেছে।

সতীশের সহযোগী নিবারণ তার কাণ্ড দেখে হেসেছে, 'হ্যাঁরে তুই কি পাগল হয়ে গেলি?'

সতীশ জবাব দিয়েছে, 'হলামই তো। পীরিতে মানুষ পাগল হয় জানিসনে?'

নিবারণ বলেছে, 'তোর পীরিতেরও বলিহারি। এত মেয়েকে এত রকম ক'রে নাড়াচাড়া করলি, উপভোগ করলি, তাতেও তোর শান্তি হ'ল না, তবু তুই তাকে ভুলতে পারলিনে?'

সতীশ পরম আফসোসের ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছে, 'কি ক'রে ভুলব? তাকে যে আজও হাতের মুঠোয় পেলাম না!'

হাড়কাটা গলির সুখদাও মাঝে মাঝে সেই কথা বলল, 'তুই যে অমন ক'রে সব বউঝি'র মুখে মুখে তার মুখ খুঁজে বেড়াস ব্যাপারখানা কি? ঘরের মাগ হারালেও তো লোক এমন ক'রে তার জন্যে হন্যে হয় না।'

সতীশ বলে, 'সুখী, সে আমার ঘরের মাগের চেয়েও বড়ো। সে আমার মনের মাগ। অমন সুন্দর একখানা মুখ জীবনে আর দেখলাম নারে।'

সুখী সতীশকে সাধারণত বেশি পাত্তা দেয় না। তার চেয়ে অনেক ক্ষমতাবান পুরুষের সঙ্গে সুখদার জানাশোনা ঘনিষ্ঠতা। তারা খালিহাতে আদর-সোহাগ করে না, টাকা-কড়ি শাড়ী-গয়নাও আনে। তবু সতীশ যখন বাসের সেই সুন্দরী মেয়েটির কথা থেকে থেকে বলে, হিংসায় যেন সুখদার বুক জ্বলে যায়। দু'হাতে সতীশকে দূরে ঠেলে দিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সুখদা, 'যা সেই বাসের সুন্দরীর খোঁজে সহর ভরে ঘুরে বেড়া গিয়ে। আবার কিল-চড়-ঘুষি খা গিয়ে প্রাণভরে। নইলে তোর সাধ মিটবে কেন?'

যখন মনটা ভালো থাকে সুখদার, আগের রাত্রে দু'একজন ভালো বাবু জোটে, দু'চার টাকা বেশি রোজগার হয়, তখন সুখদা মাঝে মাঝে বলে, 'সতে আমার কথা শোন, এর চেয়ে একজন অল্পবয়সী মেয়েটেয়ে দেখে তুই বিয়ে কর। সে তোকে সেবা-যত্ন করবে, আর তুই তাকে সাধ মিটিয়ে খাওয়াবি, পরাবি, ভালোবাসবি—তা' হলেই তুই সব জ্বালা ভুলবি সতে, তাকে ভুলে যেতে পারবি।'

সতীশ বলে, 'দূর দূর, তোরাই তো রয়েছিস্ আমার ঘরে ঘরে। আবার একজনকে নিয়ে ঘর পেতে কি হবে!'

তবু মাঝে মাঝে ঘর বাঁধবার ইচ্ছা সতীশেরও মনে হয়। অল্পবয়সী একটি বউ, হাতে শাঁখা, মাথায় সিন্দুর নিয়ে ঘরের ভিতর দিয়ে অকারণে ঘোরাফেরা করে ভাবতে মন্দ লাগে না। তার মুখখানা ঠিক সেই বাসের মেয়েটির মত। চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া। আর চাঁদেরই কলঙ্কের মত কালো একটি জড়ুল তার থুতনির ওপর। কিন্তু সেই চাঁদের দেশের মেয়েকে কোথায় পাবে সতীশ? সে কি আর এই চাঁদের তলায় আছে? সে চাঁদের মধ্যে চাঁদ হয়ে আছে, তারার মধ্যে তারা। তাকে আর পাওয়া যাবে না, তার বদলে সাধারণ একটি কিশোরী কুমারী পেলেও মন্দ হোত না। কিন্তু কোথায় পাবে তাকে! পথে-ঘাটে কত মেয়ের পিছু নেয় কতজনকে দেখে কিন্তু তাদের কেউ সতীশের জন্য নয়। কে তাকে বিয়ে দেবে। অল্প বয়সে বাপ-মা মারা গেছে। আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই। বন্ধু-বান্ধব যারা আছে তারা সবাই সতীশের মতই হাড়-হাভাতে—চোর আর বদমায়েস। দু'একজন গৃহস্থ বয়স্ক বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করলেও তাদের বয়স্থা মেয়েকে সতীশ ছুঁতে পারে না। অন্য ঘরে, অন্য বরে তাদের বিয়ে হয়ে যায়। পরিচিত

মহলে সতীশকে সবাই জানে দাগী চোর আর দাগী বদমায়েস ব'লে। তার হাতে মেয়ে দেয় কোন্ আহাম্মক। তা ছাড়া সতীশ নিজেও অমন আহাম্মকী করলে তো ? চাল নেই, চুলো নেই, রোজগারের ঠিক নেই, একটা মেয়েকে বিয়ে ক'রে জীবনভোর পস্তে মরুক আর কি ! তার ভালোবাসার মেয়ের অভাব কি ? বাসে-ট্রামে, পথে-পার্কে তার ভালোবাসার মেয়ে ছড়ানো রয়েছে। তাদের খেতে-পরতে দিতে হয় না, তবু চোখ ভরে দেখা যায়। একটু সাবধানে থেকে যত খুসি ছোঁয়া যায়, নিত্য নতুন মেয়েকে প্রাণ ভরে ভালোবাসা যায়। একজনকে বিয়ে করতে যাবে সে কোন দুঃখে ?

এবার জেল থেকে বেরিয়ে ভারী সাবধান হয়ে গেল সতীশ। পুরোন বন্ধুর কাছ থেকে গোটা পাঁচেক টাকা ধার নিল। সেলুনে ঢুকে আনা আষ্টেক পয়সা খরচ ক'রে চুল-দাড়ি কামাল। জানা-শোনা একটি লণ্ড্রিতে দুটি টাকা জমা রেখে একদিনের জন্যে একজোড়া ফর্সা জামা কাপড় চেয়ে নিল। পাইস হোটেলে খেল গণ্ডা বার পয়সা। তারপর পকেটকাটা ছোট কাঁচিখানা ট্যাকে গুঁজে বেলা তিনটে নাগাদ সহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। এ পথ ও পথ ঘুরে মোটা মত পকেট ভারী এক ভদ্রলোকের পিছনে পিছনে ধর্মতলার মোড়ে গিয়ে যখন পৌছল সতীশ, তখন বেলা সাড়ে চারটা বাজে। কার্তিক মাসের বিকাল। পশ্চিমে গঙ্গার ওপারে সূর্য এরই মধ্যে ডুবুডুবু করছে। কিন্তু একেবারে ডুবে যায়নি ; রঙের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে।

হঠাৎ আকাশ থেকে রাস্তার ওপারে মাটির ওপরে চোখ পড়ল সতীশের। অভিজাত নামকরা একটি মিষ্টির দোকান থেকে নীল রঙের ইজের পরা বাচ্চা ছেলের হাত ধরে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে ফুটপাতে দাঁড়িয়েছে। ঠিক তার মত মুখ। থুতনীতে তারই মত একটি জটুল। তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে এল সতীশ। একজন পাঞ্জাবী ড্রাইভার ট্যাকসীর ব্রেক কষে তাকে ধমক দিল। কিন্তু সতীশ ততক্ষণে রাস্তা পার হয়ে এসেছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সতীশ তাকে দেখতে লাগল। ঠিক সেই। আর কোন সন্দেহ নেই সতীশের। ঠিক সেই জটুলবতী কলঙ্কময়ী চাঁদমুখী। এই পাঁচ বছরে চেহারার বদল হয়নি। সেই ছিপছিপে দেহ পুষ্ট হয়েছে একটু কিন্তু মুখের আদল বদলায়নি। অবশ্য সিঁথির সেই সাদা রঙ বদলে গেছে।

তার জায়গায় লাল রঙের একটু আঁচড়। সে আঁচড় যেন সতীশের হৃদয়ে লেগে রক্তমুখ হোল। ওর বিয়ে হয়ে গেছে। পরণে সিল্কের শাড়ী। আশ্চর্য, তার রঙটি সেদিনের সেই চাঁপা ফুলের মত। গাঁয়ে সেদিনের চেয়ে অনেক বেশি গয়না। কানে সোনার ফুলের মধ্যে লাল পাথরের মীনা। হাতে চার গাছা ক'রে চুড়ি, গলায় মোটা হার। আর ওই ফুটফুটে ইজের প্যাণ্টপরা কে ওই বছর চারেকের ফুটফুটে বাচ্চাটি? ছেলে? বুকে যেন আর একটি ঘা লাগল সতীশের। ছেলেও হয়েছে।

মেয়েটি বলল, 'কেবল মিষ্টি খাব খাব কর বাবুল। কই, খেতে তো পারলে না কিছু। একটা সন্দেশও তো মুখে তুললে না।'

বাবুল বলল, 'আর একদিন খাব মা। আবার কবে আমার জন্মদিন আসবে। বল না!''

মেয়েটি হেসে বলল, 'আবার এক বছর পরে। তার আগে আর মিষ্টি খেতে পাবে না। কত মিষ্টি তুমি নষ্ট করলে বল তো!'

বাবুল বলল, 'ঈস্ পরশুদিন আমার জন্মদিন হবে। বাবা দিল্লী থেকে কবে আসবে, মা!'

'শিগ্‌গিরই আসবে। এবার বাড়ি চল।'

'বাঃ রে, বাড়ি কেন যাব?'

'তবে কোথায় যাবে?'

'যাব গঙ্গার ঘাটে। জাহাজ দেখতে। কত বড় বড় জাহাজ। বাবা সেদিন দেখিয়েছিল। আজ আবার দেখব।'

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বলল, 'না, তোমার আব্‌দারের চোটে আর পারলাম না। চল হেঁটে চল। জাহাজ যদি দেখতে হয় হেঁটে যেতে হবে। পারবে হাঁটতে? শেষে কিন্তু বলতে পারবে না কোলে নাও।'

'বাঃ রে, হাঁটব কেন? গাড়িতে যাব, মোটরগাড়িতে।'

মেয়েটি তার সাদা মুক্তোর মত দাঁত বের ক'রে হাসল, 'ঈস্. কি সখ দেখ। কী নবাব। তবু যদি তোমার বাবা পাঁচ-সাতশ টাকা মাইনের চাকরে হোত, মোটে পায় সাড়ে তিনশ। তাতে যখন-তখন মোটরগাড়ি চড়া যায় না, বুঝেছ? তোমার বাবা আসুক সে চড়াবে গাড়িতে। আমি গরীব মানুষ অত টাকা কোথায় পাব?'

কি ভেবে একটা রিকসাওয়ালাকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকল মেয়েটি, বলল, 'আউটরাম ঘাটে যাবে। আবার ফিরে আসতে হবে এখানে। যাতায়াতে কত নেবে বল ?'

রিকসাওয়ালা বলল, 'দেড় টাকা মাঈজী।'

'দেড় টাকা! তোমরা কি গলায় ছুরি দিতে চাও নাকি? আমি এক টাকা দেব। যাবে তো চল।'

রিকসাওয়ালা তাতেই রাজী।

বাবুলও রিকসায় চড়ে খুব খুসি হোল। 'মোটর গাড়ির চেয়ে এ গাড়ি অনেক ভালো মা। ঠুন্ ঠুন্ ক'রে বাজে। আর মানুষে টানে।'

মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ মানুষেই টানে। কিন্তু ওদের কি আমরা আর মানুষ মনে করি?' একটু যেন করুণ শোনাল মেয়েটির গলা। কিসের একটা অপরাধবোধ যেন লেগেছে মনে। রিকসাওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আস্তে চল। অত দৌড়তে হবে না। তোমার সুবিধেমত চল। ওদিকটা ঘুরিয়ে সন্ধ্যার আগে তাড়াতাড়ি এনে দাও। দু' আনা বকশিস দেব।'

রিকসা ছুটে চলল।

সতীশ এতক্ষণ খানিকটা দূরে দাড়িয়ে দাড়িয়ে সব দেখছিল শুনছিল। শিকার হাতছাড়া হয় দেখে এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। হেঁটে পারা যাবে না। তাড়াতাড়ি সেও একটা রিকসাওয়ালাকে ডেকে নিয়ে বলল, 'চল, ওই রিকসার পিছনে পিছনে। ওই যে জেনানা যাচ্ছে একটি বাচ্চাকে নিয়ে, ওই রিকসা।'

বুড়ো রিকসাওয়ালা ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আপকা মতলব কেয়া বাপুজী!'

সতীশ একটু হাসল, 'মতলব আবার কি। আমার পরিবার যাচ্ছে আগের রিকসায়, আমার বউ আর ছেলে। বাড়ি থেকে ঝগড়া করে বেরিয়েছে কিনা। তাই এক রিকসায় উঠতে চাইছে না।' শেষে বলল 'এবার মান ভাঙাতে হবে। কেন বুড়ো, এ ব্যাপার তুমি জানো না? তোমার ঝগড়া-বিবাদ হয় না পরিবারের সঙ্গে?'

বুড়ো এবার হাসল। হয় বই কি। এখনো তাদের ঝগড়া হয়। এই বুড়ো বয়সেও হয়। বুড়ো বলল, 'চলিয়ে বাবুজী চলিয়ে।'

মেয়েটির পিছনে পিছনে চলল সতীশের রিকসা। সঙ্গে ছেলেই থাকুক আর মেয়েই থাকুক আজ আর সতীশের হাতে জটুলওয়ালীর উদ্ধার নেই

আউটরাম ঘাটের অনেক আগেই রিকসা থেকে নামল সতীশ। রিকসা-ওয়ালাকে হাতছাড়া করল না। বলল, 'ওই আগের রিকসাওয়ালার পাশে তুমিও রাখ রিকসা, বসে দেশওয়ালী ভাইয়ের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথাবার্তা বল। আমরা এই এলাম ব'লে।'

জেটির ওপর দিয়ে জটুলবতী খানিকক্ষণ পায়চারি করল ছেলেকে নিয়ে। তাকে গঙ্গা দেখাল, নৌকা আর জাহাজ দেখাল। ছোট বড় দু' তিন খানা লঞ্চ আর ফেরী। একখানি চলন্ত লঞ্চকে দেখে বাবুল হাততালি দিয়ে উঠল। জাহাজের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করতে লাগল। তার সব প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া জটুলবতীর সাধ্যে কুলাল না। সে ফাঁকে ফাঁকে বার বার বলতে লাগল, 'চল, এবার বাড়ি চল। সন্ধ্যা হ'তে না হতেই তো তোমার চোখ বুজে আসবে, তখন তোমাকে টেনে নেবে কে।'

বহুবার সতীশের ইচ্ছা হতে লাগল ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আর চোখ টিপে বলে, 'কি সোনামণি, চিনতে পার?' কিন্তু চিনতে পারলে ও নিশ্চয়ই চীৎকার ক'রে উঠবে। এত লোকের মধ্যে সতীশ ওর কিছু করতে পারবে না, ছুঁতে পর্যন্ত পারবে না একটু। না, অত ব্যস্ত হলে চলবে না। ধৈর্য ধরতে হবে সতীশকে। আড়ালে আড়ালে থাকতে হবে। যতক্ষণ না ছেলে নিয়ে ও ওদের বাড়িতে গিয়ে পৌছোয় ততক্ষণ আত্মপ্রকাশ করবে না সতীশ। বেশি লোভ ভাল নয়, অতি গরজে সব নষ্ট করবার বয়স গেছে। আজ শুধু নিঃশব্দে গিয়ে ওর বাড়ি চিনে আসতে হবে। তার-পর একটু একটু ক'রে নিজেকে চেনাবে।

অস্তগামী সূর্যের রঙের খেলা চলতে লাগল জলে স্থলে আকাশে, রঙের ছিটে লাগতে লাগল চোখে-মুখে মনের মধ্যে। কিন্তু জটুলবতী আর দেরি করল না, পাছে ছেলে ঘুমিয়ে পড়ে, পাছে ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়; তাই ছেলেকে একরকম টানতে টানতেই রিকসায় নিয়ে তুলল সে। বলল, 'দেখ, এর পরে আরো কত লোক বাড়িতে আসবে। তোমার জন্যে পুতুল আনবে, জামা আনবে। তোমার জন্মদিন না আজ?' বাবুলদের রিকসা ফিরে চলল। পিছনে পিছনে চলল সতীশের রিকসা।

সতীশ হুকুম করল, 'জলদি চল, জলদি চল বুড়া।'

বুড়ো রসিকতা করতে ছাড়ল না। কেন হাওয়া খেতে এসেও মাঈজীর সঙ্গে বাবুজীর মোলাকাত আর বাতচিত হয়নি; এত ব্যস্ত কেন বাবুজী? ছেলে নিয়ে বউ আর কতদূর যাবে? বাড়ি ছেড়ে তো পালাতে পারবে না?

ওদের রিকসার পিছনে পিছনে সতীশের রিকসাও এসপ্ল্যানেড এসে পৌঁছল। উত্তরে, দক্ষিণে ট্রামগুলি আসছে যাচ্ছে। আসার ট্রামগুলি সব খালি, যাওয়ার ট্রামগুলির ভিতর থেকে কেরাণীবাবুরা উপচে পড়ছে। ছুটি হয়ে গেছে অফিস আদালত।

রিকসা থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ভিড় দেখে খান দুই ট্রাম ছেড়ে দিল মেয়েটি। কিন্তু বালীগঞ্জগামী তৃতীয় ট্রামখানি আর ছাড়ল না। ভিড় ঠেলে ছেলেকে নিয়ে উঠে পড়ল তার মধ্যে। অন্য যাত্রীরা তাকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। সামনের দিকে এগোতেই একটি দুই সীটওয়ালা লেডীজ বেঞ্চ ছেড়ে দুজন ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বসবার আর জায়গা নেই ট্রামটায়। সতীশ কোন জায়গায় বসতে চায়ও না। সেই পাঁচ বৎসরের আগেকার দিনটির মতই সে বহু যাত্রীকে বিরক্ত ক'রে বহু সহযাত্রীর ধমক খেয়ে আস্তে আস্তে জটুলওয়ালীর বেঞ্চটির পিছনে হাত রাখল। এতক্ষণ মনে মনে সংকল্প করেছিল সতীশ, সে বেশি কাছে যাবে না, অসময়ে ধরা-ছোঁয়া দেবে না। কিন্তু ট্রামে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে তার সেই প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল—ঠিক যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে মেয়েটির শাড়ির পাড় ছোঁয়া যায়, চুল ছোঁয়া যায় আলগোছে। কিন্তু কাছে এসেই নিজেকে আজ সামলে রাখল সতীশ। বেশি বাড়াবাড়ি করা এখন ঠিক হবে না। কেঁচে যাবে সব। অবাধ্য হাত দুটোকে নিজের দুই পকেটে সতীশ জোর ক'রে গুঁজে রাখল। তারপর চলন্ত গাড়িতেও অদ্ভুত কৌশলে ভারসাম্য রেখে দাঁড়াল শক্ত হয়ে।

বাবুলকে প্রথমে সামনের দিকে বসাতে চেয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু সে জানলার কাছে ছাড়া বসবে না, অগত্যা বিরক্ত হয়ে তাকে সেদিকেই বসাল মেয়েটি। বাবুল খানিকক্ষণ জানলা দিয়ে পথের শোভা দেখতে দেখতে গাড়ির ভিতরের দিকে মুখ ফেরাল। তারপর বলল, 'মা, তোমার পিছনে কে দাঁড়িয়ে আছে দেখ।' সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল।

সতীশ মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেল না। একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল। মুহূর্তকাল দুজনেই রইল স্তব্ধ হয়ে। তারপর মেয়েটি বলল, 'আপনি'। সতীশকে তাহলে চিনেছে মেয়েটি। এতদিন বাদেও চিনতে পেরেছে। কপালের নীচে তার একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন আছে। জন্মের পর থেকেই সে এই চিহ্নে চিহ্নিত। যে একবার তাকে দেখে পরের বার চিনতে ভুল করে না। মেয়েটিও ভুল করেনি, তাকে চিনেছে। ভয়ও হল, আবার ভালোও লাগল সতীশের। চিনুক, যা হবার হোক্! সতীশ জবাব দিল, 'হ্যাঁ। আমিই। আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন দেখছি।'

একটু হাসতে চেষ্টা করল সতীশ।

মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ, চিনেছি বই কি।'

একটুকাল চুপ ক'রে রইল দুজনেই।

তারপর মেয়েই ফের কথা বলল, ট্রামে-বাসে আপনাকে অনেক খুঁজেছি সেই থেকে। কিন্তু কোথাও দেখিনি।'

এত স্বর্গ-সুখও কপালে ছিল সতীশের। শুধু সে-ই একজনকে খুঁজে বেড়ায় নি। আর একজনও তাকে খুঁজেছে।

মেয়েটি বলল, 'সেদিনের আগে ওরকম আমার আর হয়নি, পরেও আর না। আমারই ভুল হয়েছিল। কতদিন ভেবেছি দেখা হলে আপনার কাছে আমি মাপ চেয়ে নেব। আজ চাইছি।'

এসব কি বলছে মেয়েটি? এসব কি শুনছে সতীশ? দুই কানে অমৃতের ধারা গলে পড়ছে যে। একি স্বপ্ন না বাস্তব? সতীশ কি বাইরে আছে, না আজও জেলের ছেঁড়া কম্বলের তলায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে—জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে!

মেয়েটি বলল, 'আপনি সেদিনের কথা ভুলতে পারছেন না। অবশ্য ভোলা আপনার পক্ষে শক্ত। আমারই অন্যায় হয়েছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ যাবেন? বসুন এখানে। বসুন তাতে কি হয়েছে। বাবুল, তুমি আমার কোলে উঠে বস। এ ভদ্রলোককে বসতে দাও।' বাবুলকে কোলে তুলে নিল মেয়েটি। সতীশ একটু আপত্তি করল। কিন্তু মেয়েটির অনুরোধ না রেখেও পারল না।

এমন সুখাসনও তার কপালে ছিল, এত সুখস্পর্শও ছিল তার ভাগ্যে!

এই অভাবিত অপ্রত্যাশিত সমৃদ্ধিতে সে খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে রইল। বার বার দেহের ছোঁয়া লাগছে এসে দেহে। শির শির ক'রে উঠছে সর্বাঙ্গ। অনেক মেয়ের স্পর্শতো সে এর আগে চুরি করেছে। কই এমন তো কোন দিন হয়নি। আজ তো শুধু একতরফা দেহের ছোঁয়াই নয়, আজ সে আর একজনের সঙ্গের ছোঁয়াও পেয়েছে। আর পেয়েছে হৃদয়ের স্পর্শ। এই প্রথম, জীবনে অমৃতের স্বাদ এই প্রথম।

ট্রাম এগিয়ে চলেছে। দুজনেই চুপ ক'রে বসে।

কিন্তু বাবুল চুপ ক'রে থাকবার ছেলে নয়। মিনিটখানেক যেতে না যেতেই সে অস্থির হয়ে উঠল। 'আমি তোমার কোলে বসব না মা!'

'তবে কোথায় বসবে। তুমি বড় জ্বালাচ্ছ, বাপু।'

বাবুল সতীশের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি ওই ওর কোলে বসব।'

বাবুলের মা মৃদু ধমক দিল, 'তুমি বড় দুষ্ট হয়েছ।' কিন্তু বাবুল নাছোড়-বান্দা, সে ঠোঁট ফুলিয়ে ক্রমাগত আবদার করছে, 'আমি তোমার কোলে বসব না, ওই কোলে বসব।'

সতীশ বলল, 'বসুক না এসে। তাতে কি হয়েছে! এসো খোকন এসো, আমার কাছে এসো।'

'আমি খোকন না, আমি বাবুল।'

সতীশ হেসে বলল, 'আচ্ছা তাই হোক। বাবুল তুমি এসো আমার কাছে।'

মার কোল থেকে ঝাঁপিয়ে সতীশের কোলে চলে এল বাবুল, সতীশ ওকে বুকে চেপে ধরল। একেবারে অমৃত। এত সুখও ছিল কপালে।

'ছাড় ছাড় লাগে।'

সতীশ একটু শিথিল করল আলিঙ্গন।

বাবুলের মা ধমক দিল, 'ছাড় বলে নাকি—তুমি বলে নাকি।'

বাবুল বলল, 'বাবাকে তুমি বলিনে বুঝি?'

বাবুলের মা এরপর আর কোন কথা বলতে পারল না। আরক্ত মুখে চুপ ক'রে রইল। সতীশও রইল নির্বাক হয়ে। সহযাত্রিনীর মুখের রঙ তার সমস্ত মন, সমস্ত জীবনকে রাঙিয়ে দিয়েছে। সে রঙ রাঙা আগুনের!

হঠাৎ বাবুল দুটি ছোট ছোট হাতে সতীশের গলা জড়িয়ে ধরল, 'তুমি আমার কে হও, বল না।'

শিশুমুখে বড় কঠিন প্রশ্ন। সতীশ চারদিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারল ট্রামের সমস্ত লোক তাদের দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে রয়েছে, উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে উত্তর শোনবার জন্যে।

পাশে বসে বাবুলের মা। তার মুখ ফ্যাকাসে সাদা, কিন্তু দুই চোখে আষাঢ়ের আশঙ্কা।

বাবুল ফের জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার কে হও?'

সতীশ একটু ইতঃস্তত করল, তারপর বাবুলের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হেসে বলল, 'তুমি আমাকে চিনতে পারছ না বাবুল, আমি তোমার মামাবাবু হই, মামাবাবু।'

বাবুল হেসে উঠল, 'বাঃ বাঃ কি মজা! আমার মামাবাবু ছিলনা। আজ একটা মামাবাবু হল। জানো মামাবাবু আজ আমার জন্মদিন? আমাকে কি দেবে বল না।'

হাত পাতল বাবুল।

তার মা মৃদুস্বরে ধমক দিল, 'এই দুষ্টু, ও কি হচ্ছে?'

বাবুল আবার বলল, 'মামাবাবু আমাকে কি দেবে? আমার জন্মদিনে আমাকে তুমি কি দেবে মামাবাবু?'

সতীশ কোন জবাব দিল না; নিঃশব্দে ওর সাদা সুন্দর ছোট্ট কপালে নিজের মোটা মোটা বিড়ি খাওয়া কালো দুটি ঠোঁট ছোঁয়াল।